ভারতীয় দর্শন

॥ ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী ॥

ভারতীয় দর্শন

[স্নাতক শ্রেণী—পাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, এম. এ. ডি. ফিল
দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, মৌলানা আজাদ কলেজ
ও
অধ্যাপক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।

পরিবেশক
বিহার সাহিত্য ভবন
৩৭এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
বি. ভাদুড়ী
সংস্কৃতি ভবন
৩৭, কলেজ রো,
কলিকাতা-৭০০০০৯

মূল্য—বারো টাকা মাত্র।

প্রথম সংস্করণ
১. ১২. '৭৮

মুদ্রক :
শ্রীপ্রবীরকুমার পান
লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রেস
২০৯ বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

আমার শিক্ষাগুরুদের উদ্দেশে
শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায়

লেখক

ভূমিকা

১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবর্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পাশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ভারতীয় দর্শনের পাঠ্যাংশের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তিত পাঠ্যসূচী অনুসারে এই গ্রন্থ লিখিত। যাদের জন্য এ বই লেখা তারা যদি উপকৃত হয় তবে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

২০ নভেম্বর, ১৯৭৮ **নীরদবরণ চক্রবর্তী**

'মালঞ্চ'

সল্ট লেইক, বিসি—২০২

কলিকাতা-৭০০০৬৪

9858

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

১। ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার করে অনেক সময়েই তার তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়। আমরা 'ভারতীয় দর্শন'-এর প্রকৃতি-নির্ণয়-প্রসঙ্গে এই পথ অনুসরণ করতে পারি।

শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচারে 'ভারতীয় দর্শন' কথার প্রথম অর্থ।

'দর্শন' কথাটি এসেছে দৃশ্ ধাতু থেকে। দৃশ্ ধাতুর বিশেষ অর্থ দেখা, সাধারণ অর্থ জানা। 'দৃশ্' ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করে 'দর্শন' শব্দটি সিদ্ধ হয়েছে। 'অনট্' প্রত্যয় করণেও হয় আবার ভাব বোঝাতেও হয়। যে কারণ উপস্থিত হওয়া মাত্র কার্য ঘটে তারই নাম করণ (সাধকতম কারণং ইতি করণম্)। এই অর্থে যে কারণ উপস্থিত হলেই জ্ঞান হতে বাধ্য তারই নাম দর্শন। এখানে প্রশ্ন উঠবে—এমন কি কারণ আছে যা উপস্থিত হলেই জ্ঞান হবে? উত্তরে বলা যায়—প্রমাণ থাকলেই জ্ঞান হয়। অর্থাৎ প্রমাণ উপস্থিত হলে জ্ঞান না হয়ে পারে না। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি জ্ঞানলাভের বিভিন্ন উপায়গুলোকেই প্রমাণ বলে। প্রত্যক্ষ হয়েছে অথচ জ্ঞান হয়নি, এমন কি হতে পারে? সুতরাং এই দিক থেকে দর্শন বলতে প্রমাণশাস্ত্র বোঝায়। অর্থাৎ প্রমাণ নিয়ে আলোচনাই এই অর্থে দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য কাজ। অবশ্য প্রমাণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হলেই প্রমা, প্রমেয় প্রভৃতির আলোচনা করতে হয়। শুদ্ধজ্ঞানকে প্রমা এবং জ্ঞানের বিষয়কে প্রমেয় বলে। সোজা কথায়, প্রমাণালোচনায় জ্ঞান-সম্পর্কিত সমস্ত আলোচনাই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তা হলে দর্শন প্রমাণশাস্ত্র বলতে আসলে জ্ঞান-বিশ্লেষণ-শাস্ত্রই দর্শন, একথা বুঝতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট "ফিলসফি" কথাটি এই অর্থেই ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে 'Philosophy is the criticism of cognition,' জ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণই দর্শনের উপজীব্য।

ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'দর্শন' কথাটির অন্য আর একটি অর্থও হতে পারে। অনট্ প্রত্যয় করণে না করে যদি ভাবে করা হয়, তবে দৃশ্ ধাতুর উত্তর অনট্ করে যে

'দর্শন' কথার দ্বিতীয় অর্থ।

'দর্শন' শব্দটি সিদ্ধ হবে তার অর্থ "দর্শনের ভাব"। সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধিই এই দিক থেকে 'দর্শন' কথার অর্থ। এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—কিসের সাক্ষাৎকার? কিসেরই বা উপলব্ধি? উত্তরে বলা যায়—সত্যের সাক্ষাৎকার, সত্যের উপলব্ধি। আবার প্রশ্ন উঠবে—সত্য কি? যাকে জানলে সব কিছু জানা হয়ে যায় তাই সত্য। যে তত্ত্ব দিয়ে জগৎ ও জীবনের সব কিছু রহস্যভেদ করা যায়, সমস্ত মূল্যের নিহিতার্থ উপলব্ধি হয় তাই সত্য। এই সত্য-সাক্ষাৎকারই দার্শনিকের কাজ। সত্যের শুধু পুঁথিগত জ্ঞান নয়, জীবনে উপলব্ধি

দার্শনিকের আদর্শ। সেজন্যই ভারতীয় দর্শনে চর্চা ও চর্যা ভিন্ন নয়। সত্যচর্চা বলতে সত্যচর্যাও বোঝায়। তাইত ভারতীয় দার্শনিকের নাম আচার্য। শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, বল্লভাচার্য ভারতীয় দর্শনের দিকপালদের ত এরকমই নাম। যাঁরা তাত্ত্বিক জ্ঞানানুসারে জীবন যাপন করেন তাঁরাই আচার্য। ভারতীয় দার্শনিকেরা তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে জীবন-চর্যা নিয়ন্ত্রিত করেন। সেইজন্যই তাঁদের আচার্য বলা হয়। অর্থাৎ ভারতীয় দার্শনিকদের কাছে তত্ত্ব ও জীবন ভিন্ন নয়। ধর্ম মানেই যেমন ধর্মজীবন, তেমনই ভারতীয় দর্শন মানেই দার্শনিক জীবন। এই দিক থেকে ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে ধর্মের মিল আছে। ধর্মের সঙ্গে জীবন সংশ্লিষ্ট বলেই ধর্মে নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করা যায়। যার সঙ্গে জীবনের কোন যোগ নেই তাতে নিষ্ঠাও নেই। ভারতীয় দর্শন জীবন-নিষ্ঠ বলেই ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা যুক্ত।

সত্যসাক্ষাৎকার ও উপলব্ধিই দর্শন।

এই প্রসঙ্গে যে তত্ত্ব দিয়ে জগৎ ও জীবনের সব কিছু রহস্য ভেদ করা যায়, সমস্ত মূল্যের নিহিতার্থ উপলব্ধি হয়, তা-ই সত্য এবং এই সত্যসাক্ষাৎকার ও উপলব্ধিই দর্শন, আমাদের এই ব্যক্তব্যটির আরও একটু বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। ব্যাখ্যার কাজই হল একত্র করা। আমরা সবাই জানি ও মানি যে জগতের ব্যাখ্যা দেওয়াই বিজ্ঞানের কাজ। আচ্ছা, বিজ্ঞান ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে করে কি? আমাদের মনে হয়, খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ঘটনা বা বস্তুগুলোকে একটি নিয়মের অধীনে আনাই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আদর্শ। কথাটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। পদার্থবিদ্যা 'মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব' নামে একটি নিয়ম মেনে নিয়েছে। আমরা বিভিন্ন জিনিস মাটিতে পড়তে দেখি। এই সমস্ত বিভিন্ন জিনিসের মাটিতে পড়ার রহস্যভেদই এই নিয়মের কাজ। অন্যান্য বিজ্ঞানে অন্যান্য যে সমস্ত নিয়ম আছে তাদেরও এই একই উদ্দেশ্য। বিভিন্ন ঘটনাকে একত্র করে ব্যাখ্যা দেওয়াই বিভিন্ন নিয়মের কাজ। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন, কোন একটি ঘটনাকে যদি কোন নিয়মের অধীনে আনা যায়, তবেই যেন তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়। ব্যাখ্যা করার সুবিধার জন্য বিজ্ঞান সমস্ত জগৎকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছে এবং প্রত্যেকটি ভাগে বিভিন্ন নিয়ম আবিষ্কার করে খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছে।

একটি তত্ত্ব দিয়ে জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যাই চরম ব্যাখ্যা।

ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য যদি হয় একত্র করা বা নিয়মের অধীনে আনা, তবে জগৎ ও জীবনের চরম ব্যাখ্যা তখনই হবে যখন একটি নিয়ম বা তত্ত্ব দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করা যাবে। বিজ্ঞান এই চরম ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা কখনই করে না। এই চেষ্টা করে দর্শন। সেইজন্যই দার্শনিকের প্রশ্ন—এমন কি তত্ত্ব আছে যা জানলে সব জানা হয়ে যায়? (কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতম্ ভবতীতি?) এই তত্ত্বই দার্শনিকের মতে চরম সত্য এবং এই সত্য-সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধিই তাঁর কাজ।

এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিকদের কিছু প্রভেদ আলোচনা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তত্ত্ব বা সত্যের জ্ঞান-লাভই দার্শনিকদের

কাম্য, সত্য-সাক্ষাৎকার সাধারণতঃ তাঁদের আদর্শ নয়। সত্য বা তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণমূলক ঔপপত্তিক আলোচনাই পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের কাজ। অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য দর্শন মুখ্যতঃ আলোচনাশাস্ত্র, জীবনতন্ত্র নয়। ভারতীয় দর্শন কিন্তু এর বিপরীত। আমরা আগেই বলেছি, আলোচনা ও অনুসরণ উভয়ই ভারতীয় দার্শনিকদের কাজ। শুধু সত্যের জ্ঞান নয়, সত্য-সাক্ষাৎকার ভারতীয় দর্শনের আদর্শ। ভারতীয় দর্শন আলোচনাশাস্ত্র ও জীবনতন্ত্র দুইই। সত্যকে শুধু পুঁথির পাতায় বা বুদ্ধির দর্পণে জানলে চলবে না। জীবনের সহস্র কর্মে তাকে রূপায়িত করে উপলব্ধি করতে হবে—ভারতীয় দার্শনিকদের এই ধারণা। সেইজন্যই ভারতীয় দর্শন মানে তত্ত্ব-দর্শন বা সত্য-সাক্ষাৎকার এবং এই সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জীবন-নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং ভারতীয় দর্শন সত্যচর্চা ও সত্য-চর্যা দুই-ই। এইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই যে, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে মধ্যযুগীয় দার্শনিক নামে যাঁরা পরিচিত তাঁরা সত্যচর্চা ও সত্যচর্যাকে অভিন্ন বলেই গ্রহণ করেছিলেন।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিকদের প্রভেদ।

তত্ত্ববিজ্ঞান, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, সৌন্দর্যবিজ্ঞান, মান-বিজ্ঞান, সমাজ-দর্শন, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন শাখাপথে, পাশ্চাত্ত্য দর্শন অগ্রসর হয়। তত্ত্ববিজ্ঞানে জীব, প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই সব তত্ত্বের স্বরূপ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক-নির্ণয়ই মুখ্যকাজ। জ্ঞান-বিজ্ঞান জ্ঞানের প্রাগুপকরণ, তত্ত্বজ্ঞানের সম্ভাবনা প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। তর্কবিজ্ঞান শুদ্ধ তর্ক বা অনুমানের নিয়মাবলী এবং আনুষঙ্গিক কতগুলো সমস্যার সমাধান দেয়। নীতিবিজ্ঞান মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মের আদর্শ নির্ণয় করে। সৌন্দর্যের প্রকৃতি-নির্ণয় সৌন্দর্য বিজ্ঞানের কাজ। মানবিজ্ঞান মান বা মূল্যের প্রকৃতি এবং প্রাসঙ্গিক সমস্যাবলী আলোচনা করে। সমাজ-দর্শন বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করে সামাজিক জীবনের আদর্শ নির্ণয় করে। বিভিন্ন মানসিক বৃত্তির বর্ণনা, তাদের বিভাগনির্ণয় এবং পারস্পরিক সম্পর্কালোচনা মনোবিজ্ঞানের কাজ। এককালে মনোবিজ্ঞান দর্শনের শাখা বলেই স্বীকৃত ছিল। কিন্তু হাল আমলে মনোবিজ্ঞান দর্শনের এলাকা ছেড়ে স্বনির্ভর পরীক্ষামূলক একটি বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শন ওপরে আলোচিত বিচিত্র পথে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য লাভ করেছে। ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানী। ভারতীয় দৃষ্টিতে এক ভিন্ন বিচিত্র অর্থহীন। সেইজন্যই ভারতীয় দর্শন তত্ত্ববিজ্ঞান, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, প্রভৃতির বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করে বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করে না। যে কোন সমস্যাই ভারতীয় দর্শনে সম্ভাব্য সমস্ত দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ তাত্ত্বিক, তার্কিক, নৈতিক প্রভৃতি দিক থেকে আলোচিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে এক-কে বিচিত্রের পটভূমিকায় বিচার করা হয়, কিন্তু সর্বক্ষণই একের অভিন্নতায় বিশ্বাস অটুট থাকে। অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ভারতের এই দৃষ্টিকে সামগ্রিক দৃষ্টি (synthetic outlook) নামে অভিহিত করেছেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ঝোঁক বিশেষের দিকে, আর ভারতীয় দর্শনের গুরুত্ব সমগ্রের দিকে।

ভারতীয় দর্শনের সামগ্রিক দৃষ্টি।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, ভারতীয় দর্শন বলতে প্রাচীন-নবীন, হিন্দু-অহিন্দু, আস্তিক-নাস্তিক সমস্ত ভারতীয় চিন্তানায়কদের চিন্তাধারাকেই বোঝায়। অনেকে ভারতীয় দর্শন এবং হিন্দু-দর্শন সমার্থক বলে মনে করেন। 'হিন্দু' অর্থ যদি ভারতীয় হয় তবে একথা মানা যেতে পারে। কিন্তু, হিন্দু বলতে যদি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বোঝায় তবে এমন কথা বলা শুধু অযৌক্তিক নয়, ভ্রান্তি উৎপাদনকারীও বটে। মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন সংগ্রহ'-এর মত হিন্দু দার্শনিকের গ্রন্থেও ভারতবর্ষের দার্শনিক সম্প্রদায়ের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে—নাস্তিক জড়বাদী চার্বাক, নাস্তিক বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়েরও স্থান আছে।

ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু দর্শন কি অর্থে ভিন্ন ও কি অর্থে অভিন্ন।

ভারত চিরকালই তার উদারতার জন্য বিখ্যাত। নাস্তিক, অহিন্দু প্রভৃতি দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ভারতবর্ষ উদারতারই পরিচয় দিয়েছে। ভারতবর্ষে দর্শনালোচনার পদ্ধতির মধ্যেও মানসিক উদারতা এবং দৃষ্টির স্বচ্ছতা সুস্পষ্টভাবে বর্তমান। যে কোন ভারতীয় দার্শনিকই দর্শন আলোচনার সময় প্রতিপক্ষের বক্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনে থাকেন, পরে তা খণ্ডন করেন এবং সর্বশেষে নিজের মতবাদ প্রচার করেন। ভারতবর্ষে দর্শনালোচনার এই পদ্ধতিই প্রচলিত। দর্শন-গ্রন্থের যে অংশ প্রতিপক্ষের মতবাদ প্রকাশ করে তার নাম পূর্বপক্ষ, যে অংশ বিরুদ্ধবাদীর বক্তব্য খণ্ডন করে তাকে বলে খণ্ডন এবং যে অংশে আলোচনাকারীর বক্তব্য প্রকাশিত হয় তার নাম সিদ্ধান্ত। বিরুদ্ধবাদীর মত শ্রবণ এবং খণ্ডন না করে সিদ্ধান্ত করার অধিকার না থাকায় ভারতীয় দর্শনে বিচার এবং বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

ভারতীয় দর্শনের উদারতা।

বেদান্ত দর্শনের যে কোন গ্রন্থ যদি আমরা পাঠ করি তবে তাতে চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্তগুলোর বিচার লক্ষ্য করবো, তেমনি করে যদি বৌদ্ধ বা জৈন সম্প্রদায়ের কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করি তবে অন্যান্য মতবাদের যৌক্তিক আলোচনা পাওয়া যাবে। এর ফলে ভারতীয় দর্শনের যে কোন গ্রন্থই অত্যন্ত বিপুলাকার বহুতত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমরা আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করি যে, আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনের অনেক সমস্যাই ভারতীয় দর্শনে আলোচিত হয়েছে। আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ভারতীয় দর্শনের বিচার পদ্ধতি মানুষের বিচার শক্তি এমনই তীব্র ও তীক্ষ্ণ করে যে, ভারতীয় দর্শনের অভিজ্ঞ পণ্ডিত য়ুরোপীয় দর্শনের যে কোন সমস্যার ওপরই অত্যন্ত নিপুণভাবে আলোকপাত করতে পারেন। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, ভারতীয় দর্শনের দিকপাল পণ্ডিত ৺মহামহোপাধ্যায় ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়কে য়ুরোপীয় দর্শনের কোন সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তার এমন চমৎকার সমাধান দিতে পারতেন যা আমাদের সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করতো।

ভারতীয় দর্শনের ব্যাপকতা।

২। ভারতীয় দর্শন-চিন্তার ক্রমবিকাশ

খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে আর্যেরা ভারতে আগমন করেন। তার পর কিছুদিনের মধ্যেই ঋক-সংহিতার বিভিন্ন স্তোত্র রচিত হয়। ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত এই ঋক-সংহিতাতেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়। এই সুদূর অতীতে যে দার্শনিক চিন্তার প্রথম আবির্ভাব হয় তা আজ থেকে এক বা দুই শতাব্দী পূর্বেও অব্যাহত গতিতে বিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং ভারতীয় দর্শনচিন্তার ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের ইতিহাস দীর্ঘ ত্রিংশ শতাব্দীর ইতিহাস।

এই সুদীর্ঘকাল ধরে যে দার্শনিক চিন্তা বিবর্তিত হয়েছে তার যথার্থ ইতিহাস যদি রচনা করা সম্ভব হত, তবে আমরা সত্যিই মূল্যবান সম্পদের অধিকারী হতাম। কিন্তু, ভারত-ইতিহাসের প্রথম পর্যায় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এত অস্পষ্ট যে ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা প্রায় অসম্ভব। সেইজন্যই বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের সঠিক তারিখ উল্লেখ এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় সম্ভব নয়।

আমরা যখন য়ুরোপীয় দর্শনের ইতিহাস পাঠ করি তখন দার্শনিকদের জীবনের পরিচয়ও পেয়ে থাকি। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকদের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারিনা। ন্যায় দর্শনের স্রষ্টা মহর্ষি গৌতম এবং প্রখ্যাত অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মত বিরাট দার্শনিক পুরুষদেরও ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় সামান্যই পাওয়া সম্ভব। ভারতীয় দার্শনিকদের অপরিসীম বিনয় এবং সাধারণভাবে ভারতীয় চিন্তায় ব্যক্তির চেয়ে ভাবধারার প্রাধান্য স্বীকৃতিই এই ব্যাপারের কারণ বলে মনে হয়। কারণ যা-ই হোক, দর্শন আলোচনায় দার্শনিকের ব্যক্তি-জীবনের পরিচয় লাভের কৌতূহল ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে মেটার কোন সম্ভাবনা নেই।

৪৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বুদ্ধদেব দেহরক্ষা করেছিলেন বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। এই তারিখটিকে একটি সীমারেখা বলে গ্রহণ করলে ভারতীয় চিন্তার দুটি স্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময় বৈদিক যুগের শেষ এবং দর্শন-সম্প্রদায়ের উদ্ভব। বৈদিক চিন্তায় আমরা দার্শনিকতার বীজ লক্ষ্য করি। কিন্তু প্রকৃত দর্শন তার পরবর্তী স্তরেই সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম স্তরের সাহিত্য মুখ্যতঃ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের কাছে প্রতিভাত বলে মনে করা হয়, কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের সাহিত্য দার্শনিকদের সচেতন সৃষ্টি। যথার্থ ভারতীয় দর্শন এই দ্বিতীয় স্তরের সামগ্রী। বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক, ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত নামে যে সমস্ত ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদায়ের কথা আমরা জানি তা সবই এই দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত।

এই দ্বিতীয় স্তরেও আবার ভগবদ্গীতা ঠিক দর্শন সম্প্রদায় বলে গৃহীত হতে পারেনা। বেদের মত গীতাতেও দার্শনিক চিন্তার বীজ নিহিত। পরবর্তীকালে অবশ্য শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা গীতার দর্শনসম্প্রদায়-ভিত্তিক ভাষ্য রচনা করেছেন। সুতরাং গীতায় বৈদিক যুগ এবং দর্শন-সম্প্রদায়ের যুগের চিন্তার মিলন হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। গীতা বৈদিক যুগ ও দর্শন সম্প্রদায়ের যুগের সেতুবন্ধ।

আমরা এই গ্রন্থে বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের পরিচয় দেব। এই প্রসঙ্গে বেদ ও গীতার কথা যতটুকু বলা প্রয়োজন ততটুকুই প্রসঙ্গতঃ বলা হবে। সেইজন্যই বেদ ও গীতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমরা এই গ্রন্থে কোন নির্দিষ্ট অধ্যায় রাখিনি।

৩। ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদায়

ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে বেদের স্থান খুবই উচ্চে এবং এর মূল্যও অপরিসীম। 'বেদ' কথাটির অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানের কোন দেশও নেই, কালও নেই। জ্ঞান সর্বদেশের সর্বকালের। ভারতীয়দের ধারণা, বেদ সর্বদেশের, সর্বকালের চিরন্তন জ্ঞান। এই জ্ঞান কোন মানুষের সৃষ্টি নয়। পবিত্রচরিত্র ঋষিদের কাছে এই জ্ঞান ভাস্বর হয়েছিল। আমরাও চেষ্টা করলে নিজেদের অভিজ্ঞতায় এই জ্ঞানের অধিকারী হতে পারি। তবে এইজন্য দৈহিক এবং মানসিক প্রস্তুতি দরকার, সাধনা আবশ্যক। আমাদের সুবিধার জন্য সাধনালভ্য চিরন্তন জ্ঞান ঋষিরা বেদ-আকারে প্রকাশ করেছেন।

ভারতীয় দর্শনে বেদের স্থান।

কোন কোন ভারতীয় দার্শনিক বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেন। এঁদের নাম আস্তিক। আবার একদলের দার্শনিক বেদ-প্রামাণ্যে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের বলা হয় নাস্তিক। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত এই ষড়দর্শন আস্তিক দর্শন নামে আখ্যাত। ঈশ্বরে বিশ্বাস বা পরলোকে বিশ্বাস অর্থেও 'আস্তিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তবে ঈশ্বরে বিশ্বাস বোঝাতে 'আস্তিক' কথাটি ব্যবহার করলে ষড়দর্শনকেই আস্তিক বলা যাবে না, কারণ সাংখ্য এবং পূর্বমীমাংসা ঈশ্বর মানেন না। চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনকে বেদ-প্রামাণ্যে অবিশ্বাসজন্য নাস্তিক বলা হয়। পরলোকে বিশ্বাস বোঝাতে 'আস্তিক' শব্দ ব্যবহার করলে ষড়দর্শন, বৌদ্ধ এবং জৈন সবাইকেই আস্তিক বলতে হয়। দর্শনে 'আস্তিক' বলতে বেদ-প্রামাণ্যে বিশ্বাস এবং 'নাস্তিক' বলতে বেদপ্রামাণ্যে অবিশ্বাস বোঝায়। এই অর্থেই ষড়দর্শন আস্তিক এবং চার্বাক বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন নাস্তিক। বৈয়াকরণ সম্প্রদায় এবং আয়ুর্বেদ সম্প্রদায়ও আস্তিক নামে পরিচিত। এ ছাড়াও স্বল্পপ্রসিদ্ধ আরও কয়েকটি আস্তিক দর্শন আছে।

ভারতীয় দর্শনের সম্প্রদায় ভেদ।

বেদ-নির্ভরতার পরিমাণ অনুসারে ষড়দর্শনকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। বেদের দুভাগ সর্বজন স্বীকৃত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ড যাগ-যজ্ঞ নিয়ে আলোচনা করে, জ্ঞানকাণ্ডের উপজীব্য দার্শনিক তত্ত্ব। বেদের কর্মকাণ্ড ভিত্তি করে যে দর্শন দাঁড়িয়েছে তার নাম পূর্বমীমাংসা। বেদের জ্ঞানকাণ্ডভিত্তিক দর্শনের নাম উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। বেদ-নির্ভরতা এই দুটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়। সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন বেদ-প্রামাণ্য-নির্ভর

ভারতীয় দর্শনের বেদ-নির্ভরতার মাত্রাভেদ।

কিন্তু পূর্বমীমাংসা ও বেদান্তের মত এত বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল নয়। বেদ-নিরপেক্ষভাবে যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্তগুলো সমর্থনের চেষ্টা করে সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক। পূর্বমীমাসা ও বেদান্তেও যুক্তি আছে কিন্তু এই যুক্তি একান্তভাবেই বেদকে সমর্থন করার জন্য প্রযুক্ত। বেদ-নিরপেক্ষ যুক্তি সাধারণতঃ পূর্বমীমাংসা ও বেদান্তে স্থান পায় না। এই দিক থেকে পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত একান্তভাবেই বেদ-নির্ভর ; কিন্তু সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক বেদনির্ভরতা সত্ত্বেও স্বতন্ত্রসিদ্ধও বটে।

বেদ-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করেই মুখ্যতঃ চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনের প্রতিষ্ঠা। এরা নাস্তিক নামেই প্রসিদ্ধ। ওপরে আলোচিত ভারতীয়-দর্শন সম্প্রদায় বিভাগ নিম্নলিখিত ছকে সহজেই প্রকাশ করা যায়।

ভারতীয়-দর্শন-সম্প্রদায়

- আস্তিক (বেদপ্রামাণ্যে বিশ্বাসী)
  - সম্পূর্ণ বেদ-নির্ভর
    পূর্বমীমাংসা (বেদের কর্মকাণ্ড ভিত্তিক)
    ও
    উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত (বেদের জ্ঞানকাণ্ড নির্ভর)
  - বেদ-নির্ভরতা সত্ত্বেও স্বতন্ত্রসিদ্ধ
    সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক।
- নাস্তিক (বেদপ্রামাণ্যে অবিশ্বাসী)
  চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন

৪। ভারতীয় দর্শনে যুক্তির স্থান

ভারতীয় দর্শন কি অযৌক্তিক বিশ্বাস-নির্ভর ?

ভারতীয় দর্শনে বেদের অনন্য-সাধারণ ভূমিকার কথা ত আগেই বলেছি। বৌদ্ধ এবং জৈনের মত নাস্তিক দর্শনে বেদ-বিশ্বাস না থাকলেও নিজেদের ধর্মপ্রবক্তাদের ওপর যথেষ্ট বিশ্বাসই বর্তমান। বৌদ্ধদর্শনে বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং জৈনদর্শনে তীর্থঙ্কর-নির্দেশে অচলা ভক্তি খুবই লক্ষণীয়। এই সব দেখেশুনে অনেক য়ুরোপীয় সমালোচক ভারতীয় দর্শনকে অযৌক্তিক বিশ্বাসনির্ভর (dogmatic) বলে নিন্দা করেছেন।[১] আমরা এই অভিযোগের যৌক্তিকতা আলোচনা করবো।

শঙ্করাচার্য 'তর্কপ্রতিষ্ঠানাৎ'...[২] নামক সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শুষ্ক তর্ক সত্য নির্ণয়ের সহায়ক নয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, তর্ক করে কখনই সত্য প্রতিষ্ঠা করা

১. থিলি, 'A History of Philosophy' পৃষ্ঠা ৩
স্টেস, 'A Critical History of Greek Philosophy পৃষ্ঠা ১৪

২. ব্রহ্মসূত্র (২।১।২) দ্রষ্টব্য।

যায় না। যখন কোন লোক তর্ক করে কিছু স্থাপন করেন, তখন, অধিকতর কূটবুদ্ধির লোক তা তর্ক করে নস্যাৎ করে দিতে পারেন। এমনি করে দেখা যায়, তর্কের শেষ নেই। তর্ক করে কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করলে তা কখনই নস্যাৎ হবেনা, এমন কথা বলাই যায় না। কিন্তু কোনপ্রকার অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির ওপর নির্ভর করে যদি কিছু বলা যায় তবে তা এত সহজে নস্যাৎ করা যায় না। সেইজন্যই বিজ্ঞানে পরীক্ষণ প্রণালীর ওপর নির্ভর করে যে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা শুধু তর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত সত্যের চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয়। ভারতীয় দার্শনিকেরা বৈদিক ঋষি, বুদ্ধদেব বা জৈন তীর্থঙ্করদের মত অসাধারণ তপস্বীদের অভিজ্ঞতায় নির্ভর করেন। বেদ ত বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের অভিজ্ঞতারই প্রকাশ। বুদ্ধদেবের লোকোত্তর উপলব্ধির প্রকাশ বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে এবং তীর্থঙ্করদের সত্য উপলব্ধিই জৈন দর্শনের ভিত্তি। নিছক তর্কের চেয়ে উপলব্ধির মূল্য অনেক বেশী। সেইজন্যই ভারতীয় দার্শনিকেরা অভিজ্ঞ তপস্বীদের উপলব্ধিতে আস্থা রাখেন। অবশ্য এই সব উপলব্ধি যেকোন লোকই তপস্যার দ্বারা লাভ করতে পারেন। হাইড্রোজেনের বিশেষ অনুপাতের সঙ্গে অক্সিজেনের বিশেষ অনুপাত মিশিয়ে দিলে জল হয় (H_2O=Water)। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে একথার সত্যতা প্রমাণ করেছেন। সাধারণলোক পরীক্ষা না করেই একথার সত্যতা মেনে নেয়। কিন্তু কৌতূহলী কোন লোক ত নিজে পরীক্ষা করেও একথার সত্যতা জানতে পারে। তেমনি তপস্বীরা যে সমস্ত কথা বলেছেন তা আমরা সাধারণতঃ এমনিতেই বিশ্বাস করে নেই। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছা করেন তবে যথাযুক্ত সাধনার পথে তিনি তপস্বীদের কথার সত্যতা নিজের অভিজ্ঞতার আলোয় যাচাই করে দেখতে পারেন। সুতরাং তপস্বীদের কথায় বিশ্বাস করা যদি অযৌক্তিক হয়, তবে বৈজ্ঞানিকদের কথায় বিশ্বাসও যে অযৌক্তিক হবে। আসলে ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে বিচারহীনতা এবং অযৌক্তিকতার অভিযোগ বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং অজ্ঞতাপ্রসূত বলেই মনে হয়। আমরা ত এইমাত্র দেখলাম ভারতীয় দর্শন বিচার করেই নিছক তর্কের ওপর নির্ভর করেনা।

তর্ক করে সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

আমরা আগেই বলেছি, বেদ মানে জ্ঞান ; দেশ-কালোত্তীর্ণ জ্ঞান। এই জ্ঞান কোন পুরুষসৃষ্ট নয়। সেইজন্যই অপৌরুষেয়। চিরন্তন জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে যদি কোন দর্শন দাঁড়ায় তবে সে ত তার কোন দোষের কথা নয়, গুণেরই কথা। জাহাজ যখন দৃঢ় নোঙর আঁকড়ে ধরে তখন সে নিরাপদ, তেমনি যে দর্শন দৃঢ় জ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছে সেও ত নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য।

দৃঢ় জ্ঞান বা বেদ-নির্ভর ভারতীয় দর্শন নির্ভরযোগ্য।

এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে—বেদ ত নির্ভরযোগ্য, কিন্তু বেদভিত্তিক ষড়দর্শন একই কথা বলে না কেন? সাংখ্য-যোগের সিদ্ধান্তের সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিকের সিদ্ধান্তের পার্থক্য কেন? পূর্বমীমাংসা এবং উত্তর-মীমাংসার বক্তব্যভেদের কারণ কি? তাছাড়া বৈদিক ঋষিদের উপলব্ধির সঙ্গে বুদ্ধদেব বা জৈন তীর্থঙ্করদের উপলব্ধিরই বা মিল

হচ্ছেনা কেন? উত্তর সহজ। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্যই এরকম বক্তব্যভেদ লক্ষ্য করা যায়। সত্য এক, অভিন্ন। সবাই সত্যকেই জেনেছেন এবং প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দ্রষ্টার ক্ষমতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের জন্য সত্যের বিভিন্ন রূপ বা প্রকাশ লক্ষিত হচ্ছে। উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হবে। জলের ত কোন আকার নেই। যখন তাকে যে পাত্রে রাখা যায় তখনই তা সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। সত্যের অবস্থাও তাই। নিরাকার সত্য দ্রষ্টাভেদে ভিন্নরূপ ধারণ করে। সুতরাং একথা মানতেই হয় যে, বিচার করে দেখলে ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে বিচারহীনতার অভিযোগ আনা যায় না।

বেদ-ভিত্তিক ষড়দর্শনের পার্থক্যের কারণ।

আর ভারতীয় দর্শনে যুক্তির স্থানই নেই, একথাও সত্য নয়। সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের উপলব্ধ সত্য যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোধগম্য করার চেষ্টা ত পূর্বমীমাংসা এবং বেদান্ত দর্শনে রয়েইছে। সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনে বেদনিরপেক্ষ যুক্তিতেও সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ বৈদিক সিদ্ধান্ত যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসার কাজ; সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন যুক্তিতেও লভ্য তা দেখাতে চেষ্টা করে। দর্শনে যুক্তি বা তর্ক কোন বিশেষ উপলব্ধির ভিত্তিতেই প্রযুক্ত হবে একথা ত অনেক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকও স্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নৈয়ায়িক দার্শনিক বার্টাণ্ড রাসেল-এর 'Mysticism and Logic' গ্রন্থটির উল্লেখ করা যেতে পারে। রাসেল এই গ্রন্থে যুক্তি উপলব্ধিনির্ভর হলেই সার্থক, এই মত পোষণ করেছেন। আমরাও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সার্থক পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে 'দর্শনের ভূমিকায়'[১] এই মতেরই যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি। সুতরাং এই দিক থেকেও ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে বিচারহীনতার অভিযোগ টেকেনা।

ভারতীয় দর্শনে যুক্তিও গৃহীত।

জড়বাদী চার্বাক দর্শন ভারতীয় দর্শনই বটে। চার্বাক দর্শনে একমাত্র প্রত্যক্ষ-এর ওপরই নির্ভর করা হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য অভিজ্ঞতাবাদীদর্শন (Empirical philosophy)-এর সঙ্গে চার্বাকের সগোত্র সম্পর্ক। সুতরাং চার্বাকের কথা ভেবেও ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে ঢালোয়া বিচারহীনতার অভিযোগ আনা যায় না।

জড়বাদী চার্বাক দর্শনও ভারতীয় দর্শন।

ভারতবর্ষে দর্শন আলোচনার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি প্রচলিত। এই পদ্ধতি অনুসারে সর্বপ্রথম বিরুদ্ধবাদীর মতবাদ প্রকাশ করে পূর্বপক্ষ স্থাপন করতে হয়, পরে তা খণ্ডন করে সর্বশেষে নিজের সিদ্ধান্ত বলা যায়। ভারতীয় দর্শনে যদি বিচারের স্থানই না থাকতো তবে পূর্বপক্ষ খণ্ডনের প্রসঙ্গই উঠতো না। ভারতীয় দর্শন অত্যন্ত বিচারনিষ্ঠ বলেই এই প্রয়াস।

ভারতীয় দর্শনের বিচার নিষ্ঠা।

---

১. লেখকের দর্শনের ভূমিকা ৩৭—৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভারতীয় দর্শনে তত্ত্বালোচনার তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রীতি প্রচলিত। এদের নাম বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। বাদ রীতিতে সিদ্ধান্তবিবৃতি বা স্বমত-প্রতিষ্ঠাই মুখ্য কাজ। জল্পে পরমত-খণ্ডন এবং স্বমত-প্রতিষ্ঠা উভয়ই অভিপ্রেত। বিতণ্ডায় পরমত-খণ্ডনই মুখ্য উদ্দেশ্য। বিতণ্ডাক্ষেত্রে সমস্ত বিরুদ্ধমত খণ্ডন করে পরোক্ষভাবে স্বমতের সত্যতা নির্দেশ করা হয়। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সক্রেটিস অনেকটা এই ধরনের পদ্ধতিই অনুসরণ করতেন। এই তিন রীতিতেই যুক্তি বা তর্কের স্থান আছে। তবে জল্প এবং বিতণ্ডাতেই তর্কের প্রাধান্য বেশী। পরমতখণ্ডন প্রসঙ্গে শেষোক্তরীতিতে বুদ্ধির এমন দীপ্তি প্রকাশিত যা পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও বিশেষ চোখে পড়ে না। বৈতণ্ডিক শ্রীহর্ষ এবং নাগার্জুন তর্কের অদ্ভুত খেলা দেখিয়েছেন। নব্যন্যায়ে বিচার শৈলী যেভাবে নির্দেশিত হয়েছে তাতে বাহুল্য প্রভৃতির স্থান একেবারেই নেই। বক্তব্য কত সংক্ষেপে অথচ বাহুল্য বর্জন করে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায় তার নির্দেশ যে ভাবে নব্যন্যায় দিয়েছে তার তুলনা পৃথিবীর দর্শনের ইতিহাসে বিশেষ মিলবেনা। এর পরও যদি ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে বিচারহীনতার অভিযোগ আনা হয়, তবে নাচার। নব্যন্যায়ের 'গাদাধরী' বা অদ্বৈত বেদান্তের 'অদ্বৈত সিদ্ধি'র মত গ্রন্থে দার্শনিক বিচারের যে আদর্শ স্থাপন করা হয়েছে তা পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কোথাও নেই। ওদের দেশে এই সব গ্রন্থের প্রচার নেই বলে ভারতীয় দর্শনের চমৎকারিত্ব ওদের উপভোগ্য হতে পারে নি। ভারতীয় দর্শনের এই সব অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রচার হওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় দর্শনে তত্ত্বালোচনার পদ্ধতি বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা।

বেদবাক্যে বিশ্বাস, যা নিয়ে এত মারামারি, সেই প্রসঙ্গেও ভারতীয় দার্শনিকদের নির্দেশ—শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন করতে হবে। শুধু বাক্য শুনলে হবেনা, শোনার পর মনন এবং নিদিধ্যাসনও করা চাই। মনন বলতে সম্ভাবনা-নিশ্চয় এবং অসম্ভাবনা-পরিহার বোঝায়। অর্থাৎ কোন বেদবাক্য শোনার পর এই বাক্যের অসম্ভাবনা সম্পর্কে মনে যে সমস্ত চিন্তা জাগে তা যুক্তি দিয়ে দূর করতে হবে এবং এমনি করে যুক্তি দিয়েই বাক্যের নিশ্চয়তা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। পরে ধ্যান বা একাগ্র সাধনার পথে সেই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে হবে। এরই নাম নিদিধ্যাসন। সুতরাং বেদবাক্য প্রসঙ্গেও ত মননমাধ্যমে তর্কের অবতারণার নির্দেশ আছে। সবচেয়ে বড় কথা, পরের মুখে ঝাল না খেয়ে নিজের মুখে ঝাল খাওয়ার উপদেশও ত দিয়েছে ভারতীয় দর্শন। নিদিধ্যাসন করে যতক্ষণ বেদবাক্যের সত্যতা নিজের উপলব্ধির মধ্যে না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ ত মুক্তি নেই। এই সব নানা দিক বিচার করেই ভারতীয় দর্শন বিচারহীন নয়, বিচারনিষ্ঠ, এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছাতে হয়।

বেদবাক্য সম্বন্ধে মনন ও নিদিধ্যাসনের নির্দেশও ভারতীয় দর্শন দেয়।

৫। বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মূলগত ঐক্য

কোন একটি বিশেষ দেশের দর্শন সেই দেশের ভৌগলিক অবস্থান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। ভারতবর্ষ

মুখ্যতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য একদিন বহুভোগীকে প্রলুব্ধ করেছে। ইতিহাস একথার প্রমাণ দেবে। সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়ে ভারতবাসী উচ্চচিন্তায় নিমগ্ন থাকার সময় পেয়েছে প্রচুর। ফলে, এমন দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে যা মানুষের উচ্চতম ও মহত্তম চিন্তার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। ভারতীয় দর্শন ভারতবাসীর গর্বের বস্তু।

কোন দেশের দর্শন সেই দেশের ভৌগলিক অবস্থান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া দ্বারা প্রভাবান্বিত।

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে সব সময়েই ঐক্য স্বীকৃত হয়। ভারতবর্ষ বৈচিত্র্য অস্বীকার করে না, কিন্তু বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা যে একেরই প্রকাশ, সে কথাও বিস্মৃত হয় না। উপনিষদের ঋষি বলেছেন—"যো একঃ, অবর্ণঃ, বর্ণানেকান্ নিহিতার্থো দদাতি, সো নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু" (যিনি এক, অবর্ণ ; কিন্তু যিনি বর্ণবৈচিত্র্যের নিহিতার্থ বিধান করেন, তিনি আমাদের বুদ্ধি শুভকর্মে নিযুক্ত করুন)। সমস্ত ভারতীয় সাধকদেরই এই কথা। "এক"ই বৈচিত্র্যের নিহিতার্থ বিধান করেন। আমরা ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এইবার তাদের মধ্যে যে মূলগত ঐক্য আছে তা দেখাতে চেষ্টা করবো। ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় অনেক। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী অভিন্ন নয়, কিন্তু এঁরা যে ভারতবর্ষেরই দার্শনিক সম্প্রদায় তা সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। যে লক্ষণ এই সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয় তাকে আমরা সাধারণ লক্ষণ বা মূলগত ঐক্য নামে অভিহিত করতে পারি। আমরা এইবার এই লক্ষণগুলোর পরিচয় লিপিবদ্ধ করবো।

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবিধান করে।

(ক) সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই **জীবনের প্রয়োজনে দর্শনচর্চার অপরিহার্যতা স্বীকার করেন**। শুধু কৌতূহল নিবৃত্তিই দর্শনচর্চার উদ্দেশ্য নয়, জীবনকে দুঃখমুক্ত, সুন্দরতর ও মহত্তর করাই দর্শন আলোচনার উদ্দেশ্য, সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকদেরই এই ধারণা। সেইজন্যই কোন্ দার্শনিক গ্রন্থ কোন্ পুরুষার্থ সিদ্ধ করে তা গ্রন্থারম্ভেই উল্লেখ করা ভারতীয় রীতি। ভারতবর্ষে মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ বলা হয়। অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকই মোক্ষলাভের পথনির্দেশের জন্য দর্শন-চর্চা করেন। পাশ্চাত্ত্যে 'ফিলসফি' বলতে জ্ঞান-প্রেম বা জ্ঞানানুরাগ বোঝায়। সেখানে জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষাই দার্শনিক জিজ্ঞাসার উৎস। আমাদের দেশে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাই দর্শন-চর্চার মূলে। অবশ্য জ্ঞানেই মুক্তি একথা চার্বাক ভিন্ন সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকই বলেন। সুতরাং শেষপর্যন্ত জ্ঞানলাভই আমাদের উদ্দেশ্য। এই জ্ঞানের আলোতে জীবন নিয়ন্ত্রিত করাও আমাদের উদ্দেশ্যের অঙ্গীভূত। অর্থাৎ আমরা জ্ঞানাচারণের জন্যই জিজ্ঞাসায় মাতি। জিজ্ঞাসার জন্য জিজ্ঞাসা আমাদের অভিপ্রেত নয়। এইদিক থেকে ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য ফিলসফির পার্থক্য স্বীকার করতে হয়।

জীবনের প্রয়োজনে দর্শন চর্চা।

অবশ্য ভারতীয় দর্শনের এই চর্যার দিক বা আচরণাঙ্গ একে নীতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রে রূপান্তরিত করেছে, এমন মনে করার কারণ নেই। থিলি, স্টেস প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা এই অভিযোগ এনেছেন ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা বলেই মনে করি। ভারতীয় দর্শনের প্রয়োগের দিক খুবই উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ঔপপত্তিক দিক বা Theoretical aspect-ও উপেক্ষণীয় নয়। ঔপপত্তিক বা চর্চার দিক থেকে তত্ত্ববিজ্ঞান, জ্ঞানবিজ্ঞান এবং তর্কবিজ্ঞান বা ন্যায়শাস্ত্র[১] ভারতীয় দর্শনের অত্যন্ত উন্নত এবং সমৃদ্ধ শাখা। ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের তুলনা য়ুরোপীয় দর্শনেও মেলা ভার।

ভারতীয় দর্শনের ঔপপত্তিক দিকও উপেক্ষণীয় নয়।

(খ) ভারতীয় দর্শনে আচরণাঙ্গের প্রাধান্যের কারণ ভারতীয় দর্শন জীবননিষ্ঠ। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন উদ্ভট কল্পনার জাল রচনা করা ভারতীয় দার্শনিকদের মতে অপরাধ। আমাদের দেশের দার্শনিকেরা বিচার করে দেখেছেন, জগতে সুখের চেয়ে দুঃখের মাত্রা অনেক বেশী। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখের বর্ষারই প্রাবল্য, মাঝে মাঝে যে সুখের অভিজ্ঞতা হয় তা ত সাময়িক বিদ্যুৎ বিকাশ মাত্র। শিশু জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁদে। যে শিশু কাঁদেনা সে সকলেরই শিরঃপীড়ার কারণ হয়। সে বাঁচবে কি-না তাই সন্দেহ। শিশু কাঁদে কেন? দুঃখের অভিজ্ঞতাই তাকে কাঁদায়। সুরক্ষিত মাতৃজঠরে দীর্ঘদিন অবস্থানের পর যখন শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে নিজেকে বড় অসহায় মনে করে। চারদিকের উজ্জ্বল আলো, অরক্ষিত অঙ্গন কেমন যেন তার অপরিচিতের অকূল জলধি বলে মনে হয়। তাই শিশু কাঁদে। কান্না দিয়ে যে জীবন শুরু হয়, সে জীবনে কান্না আর থামতেই চায়না। মানুষের দেহ ত একটা যন্ত্র। সুতরাং এই যন্ত্র মাঝে মাঝে বিকল হয়। ফল, রোগ এবং দুঃখ। জীবনে ভোগ্যবস্তু পেলেও দুঃখ, না পেলেও দুঃখ। পেলে দুঃখ এই ভেবে যে, আরও পেলাম না কেন। কবি ঠিকই বলেছেন—'এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি'। মহাভারতকারের উপদেশ—"ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি" (কাম কখনই কামোপ-ভোগের দ্বারা তৃপ্ত হয় না)। অগ্নিতে কাষ্ঠ সংযোগ করলে অগ্নি কি কখনও নির্বাপিত হয়? সুতরাং পেলেও দুঃখ। আর না পাওয়ার দুঃখ ত স্বাভাবিক। যৌবনকে আমরা জীবনের অত্যন্ত উপভোগ্য কাল বলে মনে করি। কিন্তু যৌবনেরই কি জ্বালা কম? রূপের মোহ, শক্তির অশুভ অপচয় যৌবনকে কি বিষিয়ে দেয় না? তারপর কালক্রমে একদিন দেহে জরা ত আসতে বাধ্য। তখন চলাচলে অসুবিধা, প্রতি মুহূর্তে পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি কি জীবনে কম দুঃখ আনে? একদিন প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে মৃত্যুর কোলে এলিয়ে পড়তেই হবে। 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান'—কাব্য

ভারতীয় দর্শনের জীবন নিষ্ঠা

১. তত্ত্ববিজ্ঞান = Metaphysics
জ্ঞানবিজ্ঞান = Epistemology
তর্কবিজ্ঞান বা ন্যায়শাস্ত্র = Logic

করে বলা যায়, কিন্তু সাধারণ মানুষ এমন কথা কি অন্তর দিয়ে বলতে পারে? এ জগতে সাধারণতঃ কেউই মরতে চায়না। মৃত্যুভীতি এবং আতঙ্ক নেই এমন লোক সংসারে দুর্লভ। সেইজন্যই ধর্মরাজ বক যখন যুধিষ্ঠিরকে জগতে সবচেয়ে আশ্চর্য কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি বলেন—'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্, শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি, কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্' (রোজই জীব মরে অথচ যারা থাকে তারা ভাবে তাদের মৃত্যু নেই, এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি?) অর্থাৎ মরতে কেউই চায় না। যা চাই না তা যদি নিতে বাধ্য হই, তবে চোখের জলেই তা গ্রহণ করি। মৃত্যু সম্বন্ধেও একই কথা। জগতে ও জীবনে শোকও কি কম? প্রিয়জনের অকাল ও আকস্মিক বিয়োগ বা সময়কালে মৃত্যু সবই তো শোকাবহ। এ জগতে এমন পরিবার নেই যেখানে শোক প্রবেশ করেনি। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব ও পুত্রশোকাতুরা জননীর কাহিনী মনে পড়ে। কোন এক পুত্র-বিয়োগ-বিধুরা জননী বুদ্ধদেবের চরণতলে বসে কেঁদে বলেছিলেন, 'আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিন'। বুদ্ধদেব তাকে অনেক করে বোঝালেন, তা সম্ভব নয়। স্নেহান্ধ জননী সে কথা বিশ্বাস করতে পারেন না। তিনি অনুরোধে অচলা। বুদ্ধদেব তখন বললেন,—'মা, আপনি এমন ঘর থেকে কিছু সর্ষে নিয়ে আসুন যেখানে শোকের ছায়া কখনও পড়েনি। আমি আপনার ছেলেকে বাঁচিয়ে দেব।' মা ভাবলেন, এ অতি সহজ কাজ, শোক ত শুধু তাঁরই ঘরে; অন্যদের ত শোক নেই। চোখের জল মুছে ছুটলেন সর্ষের সন্ধানে। দ্বারে দ্বারে ঘুরলেন। কিন্তু অ-শোক গৃহের সর্ষে ত মিলল না। জননী বিস্ময়-বিমূঢ়তার মধ্যে জানালেন এমন কোন ঘর নেই যেখানে শোক নেই। চোখের জলে তিনি নিবেদন করলেন এই কথা করুণাঘন বুদ্ধের দরবারে। বুদ্ধদেব করুণাবিগলিত কণ্ঠে বললেন,—তবে শোক কেন মা? এ জগতের ত এই রীতি। আসুন আমরা শোকজয়ের সাধনা করি।

জীবনের দুঃখ, দুর্গতি, রোগ, শোক, জরা দেখে ভারতীয় দার্শনিকেরা ব্যথিত হয়েছেন। এই দুঃখ-জয়ের সাধনাই তাঁদের দর্শন-চর্চার মূলে। তাঁরা ভেবেছেন—এই দুঃখ কেন? দুঃখের নিদান আবিষ্কার করে এই নিদান-নিধনই ভারতীয় দার্শনিকদের কাজ। জীবনকে তাঁরা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু স্বভাবলব্ধ জীবনকে তাঁরা রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। তাঁদের সাধনা দুঃখের নয়, দুঃখ জয়ের; নৈরাশ্যের অন্ধকারের নয়, আশার আলোর; মৃত্যুর বিভীষিকার নয়, অমৃতের আনন্দের। এই প্রসঙ্গে কার্ল মার্ক্স-এর একটি মন্তব্য মনে পড়ে। তিনি বলেছেন—"Philosophers have so far interpreted the world; the point is to change it"[১] (দার্শনিকেরা এতদিন জগতের শুধু ব্যাখ্যাই দিয়েছেন, প্রয়োজন হল জগতের রূপান্তরের)। আমাদের বিশ্বাস, ভারতীয় দার্শনিকেরা জগতের ব্যাখ্যা রচনার কালে প্রতি মুহূর্তেই জগতের রূপান্তরেরই চিন্তা করেছেন। অবশ্য কার্লমার্ক্স

দুঃখ-জয়ের সাধনাই দর্শন চর্চার মূলে।

১. Marx. Thesis on Feuerbach.

অর্থনৈতিক রূপান্তরের কথা বলেছেন, ভারতীয় দার্শনিকরা সাধনা করেছেন আধ্যাত্মিক রূপান্তরের।

ভারতীয় দর্শন কি নৈরাশ্যবাদী?

পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা ভারতীয় দার্শনিকদের এই প্রচেষ্টা ভাল চোখে দেখেন নি। তাঁরা ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। জীবনের দুঃখ, বেদনা ও ব্যর্থতার দিক যাঁরা বড় করে দেখেন তাঁদের বলা হয় নৈরাশ্যবাদী। আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি, ভারতীয় দার্শনিকেরা জীবনে দুঃখাতিশয্যের কথা বলেছেন। সেইজন্যই তাঁদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ। আমাদের এই অভিযোগের সত্যতা বিচার করে দেখতে হবে।

নৈরাশ্যবাদ ভারতীয় দর্শনের প্রথম কথা, আশাবাদ তার শেষ কথা।

বুদ্ধদেবকে এই প্রসঙ্গে ভারতীয় দার্শনিকদের প্রতিনিধি স্থানীয় মনে করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—'সর্বং দুঃখং'। কিন্তু এই তাঁর শেষ কথা নয়। বুদ্ধগয়ায় বোধিক্রমতলে তিনি সাধনার সিদ্ধি স্বরূপ 'চত্বারি আর্য্য সত্যানি' বা চারিটি পবিত্র সত্যের জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এই চারটি পবিত্র সত্য হচ্ছে—(১) দুঃখ আছে (২) দুঃখের কারণ আছে (৩) দুঃখের নিবৃত্তি আছে এবং (৪) দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও আছে। দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ দিয়েছেন বুদ্ধদেব। সুতরাং দুঃখ আছে, বুদ্ধদেবের এই প্রথম কথা; দুঃখের নিবৃত্তি ও নিবৃত্তির উপায় আছে, এই বুদ্ধদেবের শেষ কথা। সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকই এই সুরে কথা বলেন। তাঁরা দুঃখ স্বীকার করে দুঃখ-নিবৃত্তির পথ-নির্দেশের জন্যই দর্শন-চর্চা করেন। চার্বাক ভিন্ন সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকই মোক্ষাভিলাষী।[১] ভারতীয় মতে দুঃখ-নিবৃত্তিই মোক্ষ। সুতরাং দুঃখনিবৃত্তিই ভারতীয় দর্শন-চর্চার উদ্দেশ্য। এই দিক থেকে বিচার করলে ভারতীয় দর্শন নৈরাশ্যের কথা দিয়ে শুরু হলেও চরম আশা ও আশ্বাসের বাণী দিয়েই শেষ হয়েছে। 'দুঃখের নিবৃত্তি হবে' —চরম দুর্দশার অমানিশায় ভারতীয় দার্শনিকদের এই বাণীই ত আশার আলো দেখায়। এ আলো সত্যি সত্যি সার্থকতার পথ দেখায়, আলেয়ার মত হতাশার পথে ঘোরায়না। সুতরাং নৈরাশ্যবাদ ভারতীয় দার্শনিকদের প্রাথমিক প্রস্তাব মাত্র, বলিষ্ঠ আশাবাদই তাঁদের মূল সিদ্ধান্ত। এই প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ স্মরণীয় কথা এই যে, প্রাচীন ভারতের কোন নাটকই বিয়োগান্ত নয়। দুঃখ যে কখনও শেষ কথা হতে পারেনা, ভারতীয় চিন্তার এই বিশিষ্ট বাণীই নাট্যকারেরা নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন।

এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে—ভারতীয় দর্শনে নৈরাশ্যবাদ প্রথম প্রস্তাবই বা হবে কেন? জীবন কি শুধুই দুঃখের? সুখভোগ জীবনে কি কিছু কম আছে? প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলবো, ভারতীয় দার্শনিকেরা বিচার করে দেখেছেন যে জীবনে

---

১. এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, চার্বাক মত ভারতীয় অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গে মেলেনা। সেজন্য আমরা যখন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মূলগত ঐক্য আলোচনা করি, তখন চার্বাক মত বাদ দিতে বাধ্য হই। আমাদের এই আলোচনাতেও ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় বলতে চার্বাক ভিন্ন অন্য সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায় বুঝতে হবে।

সুখের চেয়ে দুঃখ অনেক বেশী। তাঁদের এই বিচার-ধারা আমরা খানিকটা আগেই অনুসরণ করেছি। পুনরুক্তির ভয়ে তা আমরা পুনরুদ্ধার করছি না। যারা চিন্তা করেনা, অন্ধের মত চলে, তাদের আসলে সুখ-দুঃখের পার্থক্যভেদই নেই। যাঁরা সুখ-দুঃখের স্বরূপ বোঝেন তাঁদের কাছে জগৎ সত্যিই দুঃখময়।

জীবনে সুখের চেয়ে দুঃখের মাত্রা অনেক বেশী।

ভারতীয় দার্শনিকেরা সত্যাশ্রয়ী, সত্যানুসন্ধানী। সত্য অপ্রিয় হলেও সত্য। জীবন প্রকৃতই দুঃখময়, একথা অপ্রিয় সত্য। ভারতীয় দার্শনিকেরা সত্যচ্যুত হতে প্রস্তুত নন। তাই তাঁরা অপ্রিয় সত্যকথাও বলেন।

ভারতীয় দর্শন সত্যাশ্রয়ী ও সত্যানুসন্ধানী।

অনেকে হয়ত বলবেন, অপ্রিয় সত্য বলতে নেই, এইত সাধারণ নিয়ম। আমরা বলবো, একথা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। মনে করুন, কোন দুস্তর দুর্গম পথের নবীন পথিক সেই পথের কোন অভিজ্ঞ যাত্রীকে পথের খবর জিজ্ঞাসা করেছে। সেই অভিজ্ঞযাত্রী যদি পথের দুর্গমতা, দুস্তরতা, গুপ্ত সর্প, গূঢ় ফণা অপ্রিয় সত্য বলে সেই পথিককে না বলে, তবে সে কি সত্যিই পথিকের বন্ধুর কাজ করে? প্রথমতঃ অবশ্য অভিজ্ঞযাত্রীর এই কথা নবীন পথিকের খুবই ভাল লাগবে। সে তখন নির্ভয়ে সানন্দে অসতর্ক হয়েই পথ চলবে। কিন্তু পরে যখন সে ভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করবে তখন কি অভিজ্ঞযাত্রীর মুণ্ডপাত সে কটূকথায় করবে না? অভিজ্ঞযাত্রী যদি আগেই পথের বিপদ সম্বন্ধে নবীন পথিককে সতর্ক করে দিত, তবে সে নিশ্চয়ই সাবধানে পথ চলতো এবং ফলে বিপদ এড়ানো হয়ত তার পক্ষে সম্ভব হত। সে তখন নিশ্চয়ই সদুপদেশের জন্য অভিজ্ঞযাত্রীর সাধুবাদ করতো। সেইজন্যই একজন আমেরিকান চিন্তানায়ক বলেছেন,[১] "Optimism seems to be more immoral than pessimism, for pessimism warns us of danger, while optimism lulls into false security." (আশাবাদ নৈরাশ্যবাদের চেয়ে অধিকতর অনৈতিক বলে মনে হয়, কারণ নৈরাশ্যবাদ আমাদের বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করে, কিন্তু আশাবাদ ভ্রান্ত নিরাপত্তার কোলে ঘুম পাড়িয়ে রাখে)। ভারতীয় দার্শনিকেরা জীবনপথের বন্ধুরতা এবং দুর্গমতা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়ে সত্যিকারের বন্ধুর কাজ করেছেন। ভ্রান্ত নিরাপত্তার মধ্যে দুরাশার স্বপ্ন দেখে লাভ কি? কারণ স্বপ্নভঙ্গে যে হতাশ হয়ে বলতে হবে—"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়!"

অপ্রিয় সত্যও বলা উচিত।

তিক্ত ঔষধের ফলে ত রোগ সারে। ঔষধ তিক্ত বলে তা পরিত্যাগ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ? ভারতীয় দার্শনিকেরা তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু

---

১. George Herbert Palmer লিখিত Contemporary American Philosophy প্রথম খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তার ফল ত মধুময় ; সংসারের দুঃখ-দহন-জ্বালার শান্তি। তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থাপক বৈদ্যকে দোষারোপ করা মূঢ়তা। সে রোগীর শত্রু নয়, মিত্র। তেমনই ভারতীয় দার্শনিকেরা আমাদের মঙ্গলের জন্যই জগৎ ও জীবনের প্রকৃতরূপ আমাদের কাছে উদ্ঘাটন করেছেন। সুতরাং তাঁদের নিন্দাবাদ না করে সাধুবাদই করা উচিত।

তিক্ত ঔষধে রোগ সারে। ঔষধ তিক্ত বলেই পরিত্যাজ্য হতে পারে না।

ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ সর্বজন স্বীকৃত। কর্মবাদ অনুসারে যে যেমন করে সে তেমনই ফল পায়। শুভকর্মের শুভফল, অশুভকর্মের ফল অশুভ। আমরা জীবনে যে দুঃখ পাই তার জন্য আমরাই দায়ী। আসলে প্রত্যেকেই আমরা নিজেরই ভাগ্যবিধাতা। পুণ্য পুরস্কৃত হবেই, পাপ নিশ্চিতভাবেই তিরস্কৃত হবে—ভারতীয় দার্শনিকদের এই বিশ্বাসই আমাদের জীবনে পরম আশ্বাসের কাজ করে। ভাল কাজের ভাল ফল পাওয়া যাবে, এত আশারই কথা। এই আশায় বুক বেঁধেই ত শত ব্যর্থতা ও বঞ্চনার মধ্যেও বাঁচা সম্ভব। নইলে যে আত্মহত্যা করতে হয়। আর সত্যিই যাদের এই বিশ্বাস নেই তারা রিক্ত জীবনের তিক্ততা আত্মহত্যা করেই দূর করতে চায়। হাল আমলের আত্মহত্যাধিক্যের মূলে এই কারণই বর্তমান বলে মনে করি। ভারতীয় দর্শন কর্মবাদের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন-মন্ত্র শেখাতে চায়, মৃত্যুমন্ত্র নয়। কর্মবাদের হিতার্থ আশাবাদ, নৈরাশ্যবাদ নয়। এই জন্মে হোক, জন্মান্তরে হোক পুণ্যকর্মের শুভফল মিলবেই মিলবে। সাময়িক ব্যর্থতা, বিশেষ ক্ষণের আশাভঙ্গ সবই আমাদের কৃতকর্মের ফল। যে কেবল আকাশে স্বপ্ন বপন করে, সে হতাশে আকাশ-কুসুম ছাড়া আবার চয়ন করবে কি ? সুতরাং সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। সুফল নিশ্চিত। এই দিক থেকে বিচার করলেও ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে নৈরাশ্যবাদের অভিযোগ আনা যায় না।

ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ আশাবাদ ঘোষণা করে।

ভারতীয় সাধক প্রার্থনা করেন—অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় ....(অসৎ থেকে আমাকে সতে নিয়ে চল, অন্ধকার থেকে নাও আলোতে, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতলোক উত্তীর্ণ করে দাও)। এই প্রার্থনার মধ্যেই ভারতীয় দর্শনের মর্মবাণী মুখর হয়ে উঠেছে। ভারতীয় দার্শনিকেরা আলো এবং অমৃতের সাধনা করেন, অন্ধকার ও মৃত্যুর জয়গান করেন না। সুতরাং তাঁদের আশাবাদী না বলে নৈরাশ্যবাদী বলি কোন্ মুখে ?

ভারতবর্ষের দার্শনিক আলোর সাধনা করে।

(গ) যে দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় দার্শনিককে চরম হতাশার মধ্যে ডুবিয়ে না রেখে বলিষ্ঠ আশাবাদের মধ্যে মুক্তি দেয় তাকে আধ্যাত্মিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আমেরিকান দার্শনিক উইলিয়ম জেমস বলেছেন [১] "অধ্যাত্মবাদ বলতে এক শাশ্বত

[১] "Spiritualism means the affirmation of an eternal moral order and letting loose of hope. This need of an eternal order is one of the deepest needs of our breast. And those poets, like Dante and Wordsworth, who live on the conviction of such an order, owe to that fact the extraordinary tonic and consoling power of their verse"

নৈতিক নিয়মের স্বীকৃতি ও আশাপোষণ বোঝায়। এই শাশ্বত নৈতিক নিয়মের দাবী আমাদের অন্তরের গভীরতম দাবীগুলোর অন্যতম। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং দান্তের মত যে সমস্ত কবি এই রকমের একটা নিয়মে বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের কাব্যের অপ্রাকৃত উজ্জীবনী শক্তি এবং শান্তিদানের ক্ষমতা এই বিশ্বাস থেকেই পেয়েছিলেন। **চার্বাক ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই এক শাশ্বত নৈতিক নিয়মের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন।** আসলে এক শাশ্বত নৈতিক নিয়মে বিশ্বাসের আবহাওয়াতেই ভারতীয় চিন্তানায়কগণ মানুষ।

ভারতীয় দর্শনের অধ্যাত্মবাদ বা শাশ্বত নৈতিক নিয়মে বিশ্বাস।

এক শাশ্বত নৈতিক নিয়মে বিশ্বাস সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকদের মজ্জাগত হলেও তাঁরা সবাই নৈতিক নিয়মটিকে একই নামে অভিহিত করেন না। ঋগ্‌বেদের ঋষিরা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, মানবলোক, নক্ষত্রলোক, দেবলোক সর্বত্র ধর্ম ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী একটি অমোঘ নিয়মের কল্পনা করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন "ঋত"[১] অর্থাৎ সত্য। সত্য অনিবার্য ও অলঙ্ঘনীয়। ঋতও তাই। ঋত শুধু প্রকাশ্য আচরণেরই নিয়ামক নয়, অপ্রকাশ্যে ও কায়মনোবাক্যে যে আচরণ করা যায় তারও নিয়ামক। এই ঋতকে ফাঁকি দেবার কোন উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে বেদের "যম ও যমীর আখ্যান" স্মরণীয়। যম ও যমী ভাই-বোন। তারা গোপনে ব্যাভিচার করে ভেবেছিল যে, এই পাপকর্মের সাক্ষী না থাকায় শাস্তি হবে না। কিন্তু ঋত-এর শাসন এড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শাস্তি তাদের ঠিকই হয়েছিল।

নৈতিক নিয়মের বিভিন্ন নাম, ঋগ্‌বেদে ঋত।

পরবর্তীকালে এই আমোঘ নিয়মের ধারণাই পূর্বমীমাংসা দর্শনে 'অপূর্ব' আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল। 'অপূর্বই' বর্তমানে অনুষ্ঠিত কোন যজ্ঞের প্রত্যাশিত ফল ভবিষ্যতে লাভ করা নিশ্চিত করে তোলে। কথাটি বুঝিয়ে বলা দরকার। শাস্ত্রে আছে—"অগ্নিহোত্রং যুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" (স্বর্গকামী ব্যক্তি অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করবে)। মনে করুন, আজ একজন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করলেন। এই যজ্ঞের প্রত্যাশিত ফল স্বর্গলাভ ত আজই হবে না। সেজন্য মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল—অতীতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফল যে ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? পূর্বমীমাংসা দার্শনিকেরা এই নিশ্চয়তা-নির্দেশের জন্যই 'অপূর্ব' স্বীকার করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলেই সেই যজ্ঞজন্য 'অপূর্ব'-এর সৃষ্টি হয় এবং এই 'অপূর্বই' পরে প্রত্যাশিত ফল নিশ্চিতভাবে প্রদান করে। অপূর্ব অব্যর্থ ও অনিবার্য।

পূর্বমীমাংসা দর্শনে 'অপূর্ব'

ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকেরা অদৃষ্ট নামে যা স্বীকার করেছেন তা এই নিয়মেরই একটি বিশেষ প্রকাশ। যে কোন কাজ করলেই তার একটা প্রভাব অদৃশ্যাকারে বর্তমান থাকে। এরই নাম অদৃষ্ট (ন দৃষ্ট)। এই প্রভাব পরবর্তীকালে কৃতকর্মের উপযুক্ত ফল প্রদান করে। এর ব্যতিক্রম নেই।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে অদৃষ্ট।

১ ঋগবেদ ১।১।৮, ১।২৩।৫, ১।২৪।৯, ১।১২৩।১৩ Pragmatism. 106—107.

সাধারণভাবে সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়-স্বীকৃত 'কর্মবাদ' এই নীতিরই নবরূপায়ণ। কর্মবাদের নিহিতার্থ 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। কৃত কর্মের ফল নষ্ট (কৃতপ্রণাশ) হয় না, আবার অকৃত কর্মের ফল লাভও (অকৃতাভ্যুপগম) হয় না। আসলে কার্যকারণ-নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই কর্মবাদ। কার্যকারণ নীতি অনুসারে কোন কার্যই কারণ ছাড়া হয় না। আবার একই কারণ থেকে একই কার্য হয়। কর্মবাদ অনুসারে জীবনের সুখ-দুঃখ কর্মেরই ফল, কর্ম কারণ, সুখ-দুঃখ তার কার্য। শুভকর্মের ফল সুখ আর দুষ্কর্মের ফল দুঃখ। এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। অর্থাৎ শুভকর্ম থেকে দুঃখ এবং দুষ্কর্ম থেকে সুখ কখনই হতে পারে না। 'কর্মবাদের' বিপক্ষে অনেক বিরূপ সমালোচনা শোনা যায়! কর্মবাদের এই ভিত্তির দিকটা উপলব্ধি করলে এর বৈজ্ঞানিকতা অস্বীকার করা যাবে না। কারণ, কার্যকরণ নীতি ত অবৈজ্ঞানিক নয়, বিজ্ঞান-সমর্থিত।

কর্মবাদ কার্য-কারণ নীতি ভিত্তিক।

আস্তিক ষড়দর্শন এবং জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় কর্মবাদ স্বীকার করেন। এইক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, কর্মফলের বাসনা ত্যাগ করে যদি কোন কাজ করা যায়, তবে সেই কর্ম এই নীতির আওতায় পড়ে না। শুষ্ক বীজ থেকে যেমন অঙ্কুর জন্মে না, তেমনই নিষ্কাম কর্মজন্য ফলভোগ নেই। ফলভোগ শুধু সকাম কর্মেরই।

সকাম কর্মেরই ফলভোগ হয়।

ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা, ব্যর্থতা এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিচিত্র রকমের বিভিন্নতা আমরা 'কর্মবাদের' দ্বারাই ব্যাখ্যা করতে পারি। একই পরিবারে একই রকম সুযোগ সুবিধায় মানুষ দু-জন ব্যক্তি জীবনে সাফল্য ও সম্ভোগের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এমন অভিজ্ঞতা আমাদের হামেশাই হয়। পিতামাতার একজন সন্তান কৃতী, প্রতিষ্ঠিত ও সম্পন্ন, অন্য জন সব দিক থেকেই একেবারে ব্যর্থ, এরকম ত প্রায়ই দেখা যায়। সমাজে কেহ ধনী, কেহ নির্ধন; কেহ পণ্ডিত, কেহ অপণ্ডিত; কেহ প্রতিষ্ঠিত, কেহ অপ্রতিষ্ঠিত। এতসব বিভিন্নতার কারণ কি? এই জন্ম বা পূর্বজন্মকৃত কর্মফলেই এই পার্থক্য। এই জন্মে বা পূর্বজন্মে যে কাজ আমরা করে থাকি না কেন সে জন্য ফলভোগ আমাদের করতেই হবে। কখন এমনও দেখা যায় যে, এই জন্মে খারাপ কাজ করেও একজন লোক সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে; অথচ ধার্মিক নানাভাবে নিগৃহীত হয়। আমাদের মনে তখন কর্মবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় জাগে। আসলে এই ব্যাপার কর্মবাদ অপ্রমাণ না করে প্রমাণই করে থাকে। অধার্মিক যখন সুখে থাকে তখন বুঝতে হবে পূর্বজন্মের সুকর্মের ফল এখন সে ভোগ করছে, সমস্ত সুকর্মের ফলভোগ যখন তার শেষ হবে তখন এই জন্মের দুষ্কর্মের ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। ধার্মিকের লাঞ্ছনা তার পূর্বজন্মকৃত দুষ্কর্মের ফল। এই জন্মের ধর্মকর্মের ফল পূর্বজন্মকৃত কর্মফলভোগের শেষ না হলে মিলবে না।

ব্যক্তি জীবনের বিভিন্নতা কর্মবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

কর্মবাদ শুধু ব্যক্তিমানুষের জীবন ও ভাগ্যই নিয়ন্ত্রিত করে না, জড়জগতের শৃঙ্খলা এবং বিন্যাসও বিধান করে। অর্থাৎ জগতের প্রতিটি বস্তু কর্মের নিয়ম মানতে বাধ্য। 'ধর্মের জয় এবং অধর্মের ক্ষয়'—এই নীতিই বিশ্ব সংসার নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুবিন্যাস এমন ভাবেই হয়েছে যাতে কর্মের নিয়ম অব্যাহত ও অমোঘ থাকতে পারে।

কর্মবাদ জড়জগতের শৃঙ্খলা এবং বিন্যাসও বিধান করে।

'কর্ম' বলতে নিয়ম এবং কর্মফলের সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত রাখে কর্মজাত এমন প্রভাব বা শক্তি দুইই বোঝায়। 'কর্ম' শব্দটিকে দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করে এর নানারকম শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। একটি নীতি অনুসারে কর্মকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়—অনারব্ধ এবং আরব্ধ বা প্রারব্ধ। অনারব্ধ কর্ম বলতে যে কর্ম এখনও তার ফল দিতে আরম্ভ করেনি তাকেই বোঝায়, আর আরব্ধ বা প্রারব্ধ কর্ম তাই যা ইতোমধ্যে ফল দিতে শুরু করেছে। অনারব্ধ কর্ম আবার দ্বিবিধ—প্রাক্তন বা সঞ্চিত এবং ক্রিয়মাণ বা সঞ্চীয়মান। প্রাক্তন বা সঞ্চিত কর্ম পূর্বজন্মকৃত ও গচ্ছিত, ক্রিয়মাণ বা সঞ্চীয়মান কর্ম এ জন্মেই কৃত ও সঞ্চিত।[১]

কর্মের শ্রেণী বিভাগ

ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে কর্মের নিয়ম ঈশ্বর-নির্ভর ও নিয়ন্ত্রিত। ঈশ্বর কর্মের নিয়ম বা অদৃষ্ট অনুসরণেই জগৎ সৃষ্টি করেন। অদৃষ্ট জড় ও অচেতন। ফলে চেতন কোন কিছুর নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন অদৃষ্টের পক্ষে যার যা প্রাপ্য তা দেওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্যই ঈশ্বর অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করে কর্মানুসারে জীবের সুখদুঃখ বিধান করেন। কিন্তু সাংখ্য, মীমাংসা, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শনে কর্মের নিয়ম সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করা হয়। এঁদের মতে কর্মের নিয়ম ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন নয়, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। এই সমস্ত দর্শনে জগতের উৎপত্তি ও বিন্যাস ঈশ্বর স্বীকার না করেই ব্যাখ্যা করা হয়।

ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে কর্মের নিয়ম ঈশ্বর-নির্ভর ও নিয়ন্ত্রিত।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নিষ্কাম কর্ম শুধু ফলভোগশূন্যই নয়, কর্ম-মুক্তিরও নিদান। সকাম কর্ম মানুষকে বাঁধে, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম মানুষকে কর্ম থেকে মুক্তি দেয়। কামনা-বাসনা-জাত সঞ্চিত কর্ম নিষ্কাম কর্মে বিনষ্ট হয়। মুক্ত আত্মা মানুষের নানাবিধ মঙ্গলকর্মে ব্যাপৃত থাকতে পারেন, কিন্তু সেই কর্ম তাঁকে কখনই বদ্ধ করেনা। মুক্ত পুরুষের এই অবস্থাকে জীবন্মুক্তি বলে।

নিষ্কাম কর্ম শুধু ফলভোগ শূন্যই নয়, কর্ম মুক্তিরও নিদান।

প্রখ্যাত দিনেমার দার্শনিক হরল্ড হফ্‌ডিঙ্গ ধর্ম বলতে 'মূল্য সংরক্ষণে বিশ্বাস'[২] বুঝেছেন। কর্মবাদ মূল্য সংরক্ষণে বিশ্বাসই প্রকাশ করে। যার যার কর্মের মূল্য তার তার জন্যই সংরক্ষিত থাকে, এই ত কর্মবাদের বক্তব্য। এই কর্মবাদ ও মূল্য সংরক্ষণে বিশ্বাসের জন্যই জৈনবাদ বা বৌদ্ধবাদ উভয়ই ধর্ম নামে পরিচিত। এমনিতে বৌদ্ধ বা জৈন প্রস্থানে ঈশ্বর স্বীকার করা হয়নি। সাধারণতঃ নিরীশ্বর ধর্ম হয় না বলেই লোকের বিশ্বাস।

'ধর্ম' বলতে মূল্য সংরক্ষণে বিশ্বাসও বুঝায়।

১। প্রকরণ পঞ্চিকা (চৌখাম্বা সং) ১৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। "The belief in the conservation of values"—Hoffding, The Philosophy of Religion.

অনেকে অভিযোগ এনেছেন, কর্মবাদ একান্তভাবেই মানুষকে দৈব-নির্ভর করে তোলে এবং তার স্বাধীন কর্মোদ্যোগ বা পুরুষকার নষ্ট করে দেয়। সেইজন্যই না-কি ভারতীয়েরা এমন কর্মবিমুখ অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠেছে। আমাদের ধারণা, অভিযোগ অজ্ঞতাপ্রসূত। আমাদের অদৃষ্ট ত আমাদেরই কর্মসৃষ্ট। আমরা ভাল কাজ করলে আমাদের অদৃষ্ট ভাল হবে, আর আমরা যদি কুকর্মে রত হই তবে আমাদের অদৃষ্ট মন্দ হবে। আমরাই আমাদের অদৃষ্ট বা ভাগ্যস্রষ্টা। সুতরাং অদৃষ্টবাদী হলেই লোক কর্মবিমুখ হবে কেন? বরং অদৃষ্টবাদী শুভকর্মের শুভফল অবশ্যম্ভাবী জেনে নানাবিধ কল্যাণ কর্মে অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে আত্মনিয়োগ করবে। দৈব পূর্বজন্মকৃত কর্মসঞ্জাত। নতুন এবং বিপরীত অভ্যাসের দ্বারা যেমন প্রাক্তন অভ্যাস পরিবর্তন করা যায়, তেমনই এই জীবনের শুভকর্ম দ্বারা দৈব অতিক্রম করা সম্ভব।[১]

কর্মবাদ ও পুরুষকারের মধ্যে সামঞ্জস্য সম্ভব।

(ঘ) **ভারতীয় দার্শনিকেরা এই জগৎকে একটি নৈতিক নাট্যমঞ্চ বলে মনে করেন।** ইংরেজ কবি নাট্যকার শেক্সপিয়রও জগৎকে নাট্যমঞ্চ বলেই অভিহিত করেছেন (The world is a stage)। নাট্যমঞ্চে যেমন দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করেন, তেমনই এই জগতে পূর্ব-কর্মানুসারে মানুষ তার দেহ, ইন্দ্রিয়, জন্ম এবং পরিবেশ লাভ করে থাকে। এই জীবনের বিদ্যা, বিত্ত, প্রতিষ্ঠা সবই পূর্বজন্মের কর্মফল। আবার এই জন্মের কর্মফল হিসেবেই পরজীবনের সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অবস্থা। শাশ্বত কর্মের নিয়মই জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতির নিয়ামক। কর্মের নীতি বা নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। এই জগৎ নাট্যমঞ্চ এই নীতির পরিচালনাতেই চলে। সেইজন্যই এই জগৎকে নৈতিক নাট্যমঞ্চ বলা হয়েছে।

জগৎ একটি নৈতিক নাট্যমঞ্চ বিশেষ।

(ঙ) **ভারতীয় দার্শনিকদের আর একটি সর্বজনস্বীকৃত বক্তব্য এই যে, জগৎ, জীবন ও জীব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বা অজ্ঞানতার জন্য বন্ধন এবং বন্ধনমুক্তি সত্যজ্ঞানের ফল।** ভারতীয় দর্শনে বন্ধন বলতে জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়ে নানারকমের দুঃখকষ্ট ভোগ বোঝায় এবং মুক্তির অর্থ এই জন্ম-মৃত্যুর অধীনতা থেকে অব্যাহতি। ভারতীয় দার্শনিকদের ধারণা, কামনা-বাসনা প্রণোদিত হয়ে কর্ম করলেই জন্মগ্রহণ করতে হয়। মানুষ জাগতিক ভোগ্যবস্তুর প্রকৃতরূপ না জানার জন্যই সেই দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। উদাহরণ দিলে কথাটি বোঝা যাবে। মরুভূমির তৃষ্ণার্ত পথিক মরীচিকার কথা না জেনে তাকে জল মনে করে সেই দিকে ধাবিত

১। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। উৎসাহী পাঠক তা অনুধাবন করলে উপকৃত হবেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মদেব বলেছেন, "পৌরুষম্ হি পরম মন্যে ; দৈবম নিশ্চিত্য মুহ্যতে" (আমি পৌরুষকেই সর্বোপরি মনে করি, দৈববিশ্বাস মানুষকে মূঢ় করে)। ভগবদ্গীতা (১৮।১৪) কর্মসাফল্যের জন্য দৈব ও চেষ্টা উভয়ই প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি (১।৩৫১) বলেন, রথ যেমন এক চাকায় চলে না তেমনি দৈব পুরুষকারের সাহায্য ভিন্ন সাফল্য আনেনা।

হয়। ছুটে ছুটে সে ক্লান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে। যদি সে মরীচিকার প্রকৃতরূপ জানতো তবে কী সে এর পেছনে ছুটতো? মায়াবন-বিহারিণী হরিণীকে ধরার অকারণ পণ করে লাভ কি? সাধারণ লোক জাগতিক বস্তু আনন্দদায়ক বলে মনে করে। সেইজন্যই তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ফলে নতুন নতুন জন্ম পরিগ্রহ করতে বাধ্য হয়। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে জাগতিক বস্তু মরীচিকা বা মায়াবন-বিহারিণী হরিণীর মত। এদের আনন্দের আলো আসলে প্রতারণার আলেয়া। মহাভারতে যযাতির উপাখ্যানে এই সত্যই পরিবেশিত হয়েছে। মহারাজ যযাতি ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে আনন্দ ও তৃপ্তি খুঁজেছিলেন এবং পরে চরম ব্যর্থতার হাহাকারের মধ্যে আর্তনাদ করে বলেছিলেন—'ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি' (কামনা কখনই কাম্যবস্তু উপভোগের দ্বারা প্রশমিত হয় না)। অগ্নিতে কাষ্ঠ সংযোগ করলে অগ্নি নির্বাপিত হয় কি? আসলে ভোগ্যবস্তু উপভোগে দুঃখ বাড়ে, আনন্দ মেলে না। তখন কবির কথায় বলতে হয়—"আমি যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।" ভারতীয় দার্শনিকেরা তাই বলেন বন্ধন ভুলের মাশুল। ভ্রান্তিভঙ্গই মুক্তি। জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য এবং অদ্বৈত বেদান্তের মতে মুক্তি এই জীবনেই লাভ করা যায়। অবশ্য অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে মুক্তি কেবলমাত্র মৃত্যুর পরই লভ্য। মুক্ত অবস্থা যে বিগত-দুঃখ অবস্থা এই বিষয়ে সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই একমত। কিন্তু এই অবস্থা অপরিসীম আনন্দ ও পরিপূর্ণতা সূচনা করে কি-না, এই বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে। জৈন ও বেদান্ত দর্শনে মুক্ত অবস্থা পরিপূর্ণ আনন্দ-অবস্থা বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সাংখ্য, ন্যায় এবং বৌদ্ধ দর্শনে মুক্তি একমাত্র দুঃখনাশই সূচনা করে।

অজ্ঞানের জন্য বন্ধন, সত্য জ্ঞানে বন্ধন-মুক্তি।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে—তবে কি ভারতীয় দর্শন আমাদের এই জগৎ ও জীবনকে উপেক্ষা করতে শিখিয়েছে? ভারতীয় দার্শনিকদের কাছে এই জগৎ ও জীবনের কি কোন মূল্য নেই? উত্তরে বলবো—আমাদের ইহলোক সর্বস্বতা সংশোধন করাই ভারতীয় দার্শনিকদের মুখ্য লক্ষ্য। আমরা অন্ধভাবে গড্ডলিকা প্রবাহে এই জগৎকেই সর্বস্ব মনে করে দুঃখসাগরে ভাসি। ভারতীয় দর্শন আমাদের এই অদূরদর্শিতা এবং একদেশদর্শিতা দূর করার জন্যই উপদেশ দিয়েছে। ভারতীয় দর্শনের মতে ইহলোক ও পরলোক দুই মিলেই পরিপূর্ণ বৃত্ত, এদের কোন একটিকেই বৃত্ত বলে মনে করলে একদেশ-দর্শিতা ও অদূরদর্শিতার ফল ভোগ করতে হয়। ইহলোককেই একমাত্র সত্য বলে মনে করলে আমরা ব্যক্তি-অবস্থার বৈচিত্র্যের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারি না, ব্যর্থতায় সান্ত্বনা পাইনা এবং ফলে জীবন দুঃসহ মনে করে আত্মহত্যা করি। ভারতীয় দর্শন জীবনের এই চরম বিপর্যয় রোধ করার জন্যই ইহলোকের মত পরলোকের অস্তিত্বের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এতে কোন দোষ নেই, বরং মানবকল্যাণের বিচারে এর যৌক্তিকতাই স্বীকার করতে হয়। কর্মবাদের সঙ্গে পরলোকের অস্তিত্ব গাঁটছড়া বাঁধা। পরলোক না মানলে কর্মবাদের ব্যাখ্যা মেলেনা। কর্মবাদের

ভারতীয় দর্শন জগৎ ও জীবনকে উপেক্ষা করে না।

যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা আমরা কিছুক্ষণ পূর্বে দেখাতে চেষ্টা করেছি। সুতরাং পরলোক মানতেও আমরা বাধ্য।

(চ) ভারতীয় দার্শনিকদের মতে সত্যজ্ঞান মুক্তির কারণ। কিন্তু এই সত্যজ্ঞান ইন্দ্রিয়-সংযম এবং দীর্ঘ মনন ভিন্ন লাভ করা যায় না। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় জাগতিক বিভিন্ন বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে বস্তু বা বিষয় মরীচিকার মত। সুতরাং সত্যজ্ঞান পেতে হলে ইন্দ্রিয়গুলো যাতে বিষয়াভিমুখী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সেইজন্যই ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলোকে যে জ্ঞান অনিষ্টকর বলে প্রতিপন্ন করে, সে জ্ঞান কখনই ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন লাভ করা সম্ভব নয়। তাই ভারতীয় দার্শনিকেরা সত্যজ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয়-সংযমের নির্দেশ দিয়েছেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মদেব দম বা সংযমকে সমস্ত গুণসমুদয় এবং সত্যোপনিষদ বা সত্যের রহস্য নামে উল্লেখ করেছেন।

ইন্দ্রিয় সংযম ও দীর্ঘ মনন ভিন্ন সত্যজ্ঞান লাভ করা যায় না।

আমাদের বাক্য ও কর্ম অনেক সময়ই রাগ, দ্বেষ ও বহুদিনের ভ্রান্ত সংস্কারের জন্য আমরা যা সত্য বলে জানি তা অনুধাবন করেনা। সেইজন্যই আমাদের দেশে বলা হয়—"জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ" (ধর্ম কি তা আমি জানি কিন্তু তাতে আমার প্রবৃত্তি নেই, অধর্ম কি তাও আমি জানি, কিন্তু তাতে নিবৃত্তি আসেনা)।[১] রাগ, দ্বেষ ও ভ্রান্ত সংস্কার দূর করার জন্য ইন্দ্রিয়-সংযম এবং নতুন সদভ্যাস অর্জন করা দরকার। সুতরাং সংযম বলতে শুধু বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে প্রতিনিবৃত্ত করাই বোঝায় না, সত্যে ইন্দ্রিয় সংযোগ এবং কদভ্যাস পরিত্যাগ করে সদভ্যাস অর্জনও বোঝায়। আমাদের দেশে নৈতিকশিক্ষায় শুধু নিষেধেরই উল্লেখ নেই, বিধিরও উল্লেখ আছে। যা করতে নেই তার সম্বন্ধে নিষেধ আর যা করতে হবে তার সম্বন্ধেই বিধি। সেইজন্যই ভারতীয় নীতিশাস্ত্র বা যোগদর্শনে শুধু যম আর নিষেধেরই নির্দেশ নেই, নিয়ম বা বিধিরও বিধান আছে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ পঞ্চপ্রকার যম বা নিষেধ। হিংসা করতে নেই (অহিংসা), মিথ্যা বলতে নেই (সত্য), চুরি করতে নেই (অস্তেয়), ইন্দ্রিয়ে রতি থাকতে নেই (ব্রহ্মচর্য), ধনলালসা করতে নেই (অপরিগ্রহ)—এই সবই নিষেধাত্মক নির্দেশ। শৌচ বা দেহশুদ্ধি, সন্তোষ বা স্বল্পে তুষ্টি, তপস্ বা বিভিন্ন ব্রতনিয়ম পালন, স্বাধ্যায় বা নিয়মিত ধর্মগ্রন্থপাঠ এবং ঈশ্বর প্রণিধান বা ঈশ্বরের স্মরণ, মনন ও অনুরক্তি—যোগদর্শনের বিভিন্ন পালনীয় কর্মবিধি বা নিয়ম। যোগদর্শনের মত বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি দর্শনেও নিষেধাত্মক এবং বিধিবিধায়ক উভয় প্রকার নির্দেশই আছে। ভগবদ্‌গীতা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—"বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা"[২] (ইন্দ্রিয় যার বশীভূত তারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত) অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বশীভূত

ইন্দ্রিয়-সংযম সত্যলাভের পক্ষে অপরিহার্য।

১ পঞ্চদশী ৬।১৭৬ দ্রষ্টব্য।

২ ভগবদ্‌গীতা ২।৬১

হলেই জ্ঞানলাভ সম্ভব। ইন্দ্রিয় সংযম প্রসঙ্গে গীতা আরও বলেছেন—রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্, আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি (যাঁর মন নিজের বশীভূত, তিনি রাগদ্বেষমুক্ত এবং আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।[১] তা হলে দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্রিয় সংযম মানে ইন্দ্রিয়গুলোকে আত্মবশীভূত করা। অর্থাৎ আমরা যদি ইন্দ্রিয়ের দাস না হই এবং ইন্দ্রিয়গুলো যদি আমাদেরই দাস হয়, তা হলেই ইন্দ্রিয় সংযম হয়েছে বুঝতে হবে। এই অবস্থাতেই সত্যজ্ঞান লাভ সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, যোগদর্শনে ইন্দ্রিয় সংযম ও মনঃসংযোগের বিস্তারিত প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, ন্যায়বৈশেষিক এবং বেদান্ত দর্শনেও এই যোগপ্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে এবং এই সমস্ত দার্শনিকেরা যোগপ্রক্রিয়া অনুসরণের নির্দেশও দিয়েছেন।

যোগদর্শনে ইন্দ্রিয় সংযম ও মনঃসংযোগের বিস্তারিত প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে।

ইন্দ্রিয় সংযত হলে সত্যজ্ঞান লাভের অধিকার জন্মে। সত্যজ্ঞান লাভের অধিকারী শাস্ত্র বা গুরুর কাছ থেকে সত্যজ্ঞান কি তা শুনলেই কিন্তু মুক্ত হয়ে যান না। ভারতীয় দার্শনিকেরা বলেন, মুক্তির জন্য সত্যজ্ঞানের সম্যক উপলব্ধি ও অনুসরণ আবশ্যক। **সম্যক উপলব্ধি সত্যজ্ঞান সম্পর্কে দীর্ঘ মনন ভিন্ন সম্ভবই নয়।** কোন কথা শুনলেই সেই বিষয়ে বিশ্বাস আমাদের জন্মে না। সেই কথায় বিশ্বাস স্থাপনের জন্য বিরুদ্ধ চিন্তা যুক্তি দিয়ে দূর করা দরকার এবং সেই কথার সত্যতা সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্য স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করা আবশ্যক। সত্যজ্ঞান সম্পর্কেও এই একই বক্তব্য। সত্যজ্ঞানের বিরুদ্ধচিন্তা দূর করে এই বিষয়ের অনিবার্যতা অনুধাবন করা দরকার এবং সেইজন্য দীর্ঘ মনন এবং চিন্তা আবশ্যক। দীর্ঘকাল ধরে আমরা যে কথা শুনে এসেছি তার বিরুদ্ধ সত্য কথা সহজে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সেই-জন্যই ভ্রান্তজ্ঞান পরিত্যাগ করে সত্যজ্ঞান লাভের জন্য ভারতীয় দার্শনিকেরা সত্যজ্ঞান সম্পর্কে স্থির চিন্তা এবং অবিরত ধ্যানের নির্দেশ দিয়েছেন।

সম্যক উপলব্ধি সত্যজ্ঞান সম্পর্কে দীর্ঘ মনন ভিন্ন সম্ভব নয়।

(ছ) **চার্বাক ভিন্ন সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় মুক্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলে মনে করেছেন এবং তাদের দর্শনচর্চা এই পুরুষার্থ লাভেরই প্রচেষ্টা।** মুক্তি যে জাগতিক দুঃখনাশ বোঝায় এই বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই। তবে মুক্ত অবস্থা যে আনন্দ ও পরিপূর্ণতার অবস্থা সে কথা বৈদান্তিক ও জৈন দার্শনিক ভিন্ন অন্যেরা সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। কোন কোন দার্শনিকদের ধারণা, জীবিত অবস্থাতেও মুক্ত হওয়া যায়। অবশ্য অন্যেরা একথা মানেন না। তাঁদের মতে একমাত্র মৃত্যুর পরই মুক্তি সম্ভব। সাংখ্য, অদ্বৈতবেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে জীবন্মুক্তি বা জীবিত অবস্থায় মুক্তি স্বীকৃত; কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি দর্শনে একমাত্র বিদেহ মুক্তি বা

চার্বাক ভিন্ন সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় মুক্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলে মনে করে।

১ ভগবদ্গীতা ২।৬৪

মৃত্যুর পর মুক্তিই প্রমাণিত। জীবন্মুক্ত অবস্থায় জীব জনকল্যাণ কর্মে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন এবং নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের জন্য কখনই আর বদ্ধ হন না। আচার্য শঙ্কর, বুদ্ধদেব প্রভৃতিকে জীবন্মুক্ত পুরুষের দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যায়। বৌদ্ধধর্মের প্লাবন থেকে সনাতন ধর্মের রক্ষা এবং বিভিন্ন মঠ প্রতিষ্ঠা আচার্য শঙ্করের স্মরণীয় কীর্তি। করুণাঘন বুদ্ধদেব কাতর প্রাণীর ত্রাণের পথ-নির্দেশের জন্যই বুদ্ধত্ব লাভের পরও জীবন ধারণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় বিভিন্ন দর্শন-প্রস্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১। চার্বাক দর্শন

চার্বাকের জড়বাদী দার্শনিক। তাঁরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে মনে করেন।

ভারতীয় দর্শনে চার্বাক বলতে জড়বাদী দার্শনিককে বোঝায়। চার্বাকেরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেন (প্রত্যক্ষৈব প্রমাণবাদী)। এঁদের মতে অনুমান বা অন্যের বাক্যনির্ভর-জ্ঞান প্রায়ই ভ্রান্ত হয়, সুতরাং এঁদের প্রমাণ বলে গ্রহণ করা যায় না। আমরা একমাত্র প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করেই জ্ঞান পেতে পারি।

জড়বস্তু ও জীব ভূতসৃষ্ট।

আমরা জড়জগৎ প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং এর সত্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেকোন জড়বস্তু ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূতের সৃষ্টি। আমরা এই চতুর্ভূতের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেই জানি। মানুষের অভৌতিক আত্মা বলে কিছু নেই। জীব সম্পূর্ণরূপেই ভূতসৃষ্ট।

চৈতন্য জড়ভূতের সৃষ্টি। পরলোক নেই।

'আমি অন্ধ', 'আমি খঞ্জ', 'আমি রুগ্ন'—এই জাতীয় বাক্য আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি। এই ব্যবহার থেকেই বোঝা যায় যে, আত্মা এবং দেহ অভিন্ন। জীবিতের দেহে চৈতন্য নামে একটি গুণের অস্তিত্ব জানা যায়। এই চৈতন্য জড়ভূতেরই সৃষ্টি। এখানে প্রশ্ন উঠবে জড়ভূত থেকে চৈতন্যের আবির্ভাব হবে কী করে? চার্বাকেরা বলেন, উপাদানে অনুপস্থিত গুণ অনেক সময়ই উপাদান সৃষ্ট বস্তুতে থাকে; যেমন, পান, সুপারী ও চুণ একসঙ্গে চিবুলে একটা লাল আভা দেখা দেয়, কিন্তু এই আভা পান বা সুপুরী বা চুণ কোনটাতেই নেই। গুড় থেকে মদ তৈরি হলে তাতে মাদকতা জন্মে, কিন্তু গুড়ে ত মাদকতা নেই। অনুরূপভাবে চতুর্ভূতের বিশেষ সংমিশ্রণে সজীব দেহে চৈতন্যের উদয় হয়। দেহনাশের সঙ্গে চৈতন্যেরও নাশ হয়। মানুষের এই জীবনই একমাত্র জীবন। পরলোক বলে কিছু নেই, কারণ পরলোকের প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং পাপ বা পুণ্যের জন্য তিরস্কার বা পুরস্কার পরজন্মে পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

আত্মা নশ্বর। ঈশ্বরের কল্পনা অযৌক্তিক, কারণ তিনি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নন। জগৎ চতুর্ভূতের স্বাভাবিক সংমিশ্রণেই সৃষ্ট। কোন ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেননি। সুতরাং পরজন্মে সুখ বা ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য ধর্মকর্ম করার কোন প্রয়োজন নেই। বেদ অবিশ্বাস্য। ধূর্ত পুরোহিত সম্প্রদায় সাধারণলোকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বার্থোদ্ধারের জন্য বেদের সৃষ্টি করেছে। এদের ভণ্ডামির মুখোস খুলে দিতে হবে।

ঈশ্বর নেই। বেদ অপ্রামাণ্য।

ঈশ্বর নেই। পরলোক নেই। অতীত বিগত, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান জীবনে যত ভোগ সম্ভব তাই অকুণ্ঠ চিত্তে করা কর্তব্য। দুঃখমিশ্রিত বলে জীবনের সুখ পরিত্যাগ করা মূর্খতা। মাছে কাঁটা আছে বলে মূঢ় ছাড়া মাছ খায়না কে? তুষের জন্য তণ্ডুল ত্যাগ করে কোন্ অপদার্থ? গরু-ছাগলের ভয়ে চাষ ছাড়ে কোন্ অর্বাচীন চাষী? জীবনের অপরিমিত সুখস্বাচ্ছন্দ্য যতটা সম্ভব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গ্রহণ করতে হবে এবং দুঃখ যতটা সম্ভব পরিহার করে চলতে হবে—এই ত জীবনের আদর্শ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় চার্বাকদের উপদেশ—"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" (যতদিত বাঁচবে সুখে বাঁচবে, ঋণ করে হলেও ঘি খাবে)। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সুখবাদ (Hedonsim)-এর বক্তব্যের সঙ্গে এই কথার অভিন্নতা লক্ষণীয়। সুখবাদ জীবনের সুখকেই সবচেয়ে বড় করে দেখেছে।

সুখ লাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

২। জৈন দর্শন

চব্বিশজন তীর্থঙ্কর বা ধর্মপ্রবক্তার উপদেশ থেকে জৈনধর্ম ও দর্শনের সৃষ্টি। এঁদের মধ্যে সর্বশেষ তীর্থঙ্কর হলেন বর্ধমান বা মহাবীর। তিনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। কিন্তু সর্বপ্রথম তীর্থঙ্কর বোধ হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ।

চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর বা ধর্মপ্রবক্তার উপদেশ থেকে জৈনধর্ম ও দর্শনের সৃষ্টি।

জৈনেরা প্রতক্ষ্যই একমাত্র প্রমাণ, এই চার্বাক মত মানেন না। তাঁরা বলেন, অনুমান এবং অন্যের বাক্যনির্ভরজ্ঞান যদি কখনও কখনও ভ্রান্ত হয় বলে পরিত্যজ্য, তবে প্রত্যক্ষও নিশ্চয়ই কখনও কখনও ভুল হয় বলে প্রমাণপদবাচ্য নয়। তা ছাড়া কতগুলো অনুমান ভ্রান্ত এই অভিজ্ঞতা থেকে যখন চার্বাকেরা সমস্ত অনুমানই অনির্ভরযোগ্য এই সিদ্ধান্ত করে বা আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয় বলে এদের অস্তিত্ব নেই বলে যুক্তি দেখায় তখন ত তারা অনুমানই করে। সুতরাং প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ নয়, এই চার্বাক-মত যুক্তিহীন।

প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, এই চার্বাক মত যুক্তিহীন।

জৈনেরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান এবং বিশ্বস্ত লোকের বাক্যনির্ভর জ্ঞানকেও প্রমাণ বলে স্বীকার করেন। অনুমান যখন ন্যায়ের নিয়ম মেনে চলে তখনই তা সত্যজ্ঞান

দিতে সক্ষম। আর অন্যের বাক্যনির্ভর জ্ঞান বক্তা বিশ্বাসযোগ্য হলেই নিশ্চিত।

জৈনেরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান ও শব্দকেও প্রমাণ বলে মনে করেন।

জৈনেরা বলেন, যে সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপার আমাদের সীমিত ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা যুক্তিগ্রাহ্য নয় তা একমাত্র সর্বজ্ঞ তীর্থঙ্করদের উপদেশ থেকেই জানা যায়। সূক্ষ্ম এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তীর্থঙ্করদের উপদেশই একমাত্র প্রমাণ।

জৈনেরা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই তিনটি প্রমাণের ওপর নির্ভর করে লাভ করেন।

জৈনেরা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা এই তিনটি প্রমাণের ভিত্তিতেই লাভ করেছেন। প্রত্যক্ষ থেকে আমরা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূতের অস্তিত্ব জানি। চার্বাকেরা এই কথা ঠিকই বলেছেন। অনুমান করে জৈনেরা আকাশ ও কাল-এর অস্তিত্ব জানেন। আকাশ না থাকলে দ্রব্যগুলো থাকবে কোথায়? কাল না হলে পরিবর্তন ঘটবে কী করে? জৈনেরা পরিবর্তন ও অপরিবর্তনের কারণ স্বরূপ যথাক্রমে ধর্ম ও অধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। জৈনদর্শনে প্রচলিত অর্থে ধর্ম ও অধর্ম শব্দ গৃহীত হয়নি; এই মতে ধর্ম পরিবর্তনের কারণ এবং অধর্ম কারণ অপরিবর্তনের। জৈনেরা এসব ছাড়াও সমস্ত সজীব দেহেই জীব বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এঁদের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান দুইই জীব বা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আমরা যখন কোন বস্তুর রূপ রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণ প্রত্যক্ষ করি, তখন সেই বস্তুটিই প্রত্যক্ষ হয়। অনুরূপভাবে আমরা যখন দুঃখ প্রভৃতি আত্মার অবস্থা আন্তর প্রত্যক্ষে জানি, তখন আত্মাই প্রত্যক্ষ করি। অনুমান করেও আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়। গাড়ির মত দেহকেও ইচ্ছামত পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা যায়; সুতরাং দেহকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার নিশ্চয়ই কিছু আছে। এরই নাম আত্মা। চৈতন্য কখনই জড়ের কার্য হতে পারেনা। চার্বাকেরা এমন কোন দৃষ্টান্তই দেখাতে পারবে না যেখানে জড়ভূতের মিলনে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়।

জৈনদের মতে যত সজীব দেহ তত আত্মা। ধূলিকণারও আত্মা আছে।

জৈনদের মতে যত সজীবদেহ তত জীব বা আত্মা। আত্মা শুধু প্রাণীদেরই নেই, উদ্ভিদ এমনকি ধূলিকণারও আছে। ধূলায় জীবাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম জীবের অস্তিত্ব আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করে। সমস্ত জীব বা আত্মাই সমান ভাবে সচেতন নয়। উদ্ভিদ বা ধূলিকণাস্থিত জীব কেবলমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় বিশিষ্ট এবং এদের শুধু স্পর্শ চৈতন্যই আছে। কতকগুলো নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর দুটি ইন্দ্রিয়, অন্যদের ইন্দ্রিয় তিনটি, আবার অন্য কতকগুলোর চারটি ইন্দ্রিয়। মানুষ এবং কতগুলো উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর পাঁচটি ইন্দ্রিয় এই সবগুলো ইন্দ্রিয় দিয়েই এরা জানে। কিন্তু দেহ বিশিষ্ট জীব বা আত্মা যত শক্তিশালী ইন্দ্রিয়েরই অধিকারী হোক না কোন এর জ্ঞান এবং শক্তি সীমিত। এই রকমের জীব সমস্ত রকমের দুঃখ ও ক্লেশের অধীন।

জীব অবশ্য অনন্ত চৈতন্য, অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত আনন্দের অধিকারী হতে পারে। জীব-প্রকৃতিতেই এই সমস্ত গুণ অন্তর্নিহিত। মেঘে যেমন সূর্যের স্বাভাবিক

কিরণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তেমনই কর্মের দ্বারা জীবের এই গুণগুলো ঢাকা পড়ে যায়। সূর্যের কিরণ যেমন ধূলিকণার আবির্ভাবে মলিন হয়, তেমনই কর্ম বা কামনাশক্তি দ্বারা আকৃষ্ট পুদ্গল বা বস্তুকণা জীব বা আত্মার স্বাভাবিক গুণগুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। অর্থাৎ আত্মার বন্ধন কর্মজন্যই হয়ে থাকে। কর্ম দূর করে জীব বন্ধনমুক্ত হতে পারে এবং ফলে তার স্বাভাবিক গুণগুলো পুনঃ প্রকাশিত হয়।

জীব অনন্ত চৈতন্য, অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত আনন্দের অধিকারী হতে পারে।

তীর্থঙ্করদের জীবন ও শিক্ষা মুক্তির সম্ভাবনা প্রমাণ করে মুক্তির পথনির্দেশ দেয়। বন্ধন-মুক্তির জন্য সম্যগ-দর্শন সম্যগ-জ্ঞান এবং সম্যকচরিত্র প্রয়োজন। সম্যগ-দর্শন বলতে তীর্থঙ্করদের শিক্ষা ও উপদেশে পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং সম্যগ-জ্ঞান বলতে এঁদের শিক্ষা ও উপদেশের পরিপূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি বোঝায়। সম্যকচরিত্র পঞ্চ মহাব্রত উদ্‌যাপন নির্দেশ করে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ বা সমস্ত কামনা ত্যাগই পঞ্চ মহাব্রত। সম্যগ-দর্শন, সম্যগ জ্ঞান এবং সম্যকচরিত্রের সংযুক্ত অনুশীলনের ফলে কামনা বাসনা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যে কর্ম আত্মাকে পুদ্গল বা বস্তুতে বাঁধে তা দূরীভূত হয়। বাধা অপসৃত হওয়ায় আত্মা তার স্বাভাবিক গুণগুলো অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত-শক্তি এবং অনন্ত-আনন্দ পুনর্প্রাপ্ত হয়। এরই নাম মুক্তি।

তীর্থঙ্করদের জীবন ও শিক্ষা মুক্তির সম্ভাবনা প্রমাণ করে মুক্তির পথ নির্দেশ দেয়।

জৈনরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। সমস্ত ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী তীর্থঙ্করেরাই জৈনদর্শনে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেছেন। এঁরা জীবনের আদর্শ স্বরূপ। এঁদের জীবন ও শিক্ষা অনুসরণ করে সার্থকতার পথে এগিয়ে যাওয়াই সাধারণ লোকের কাজ।

জৈনরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না।

সমস্ত জীবের প্রতি সহানুভূতি এবং অহিংসা জৈন ধর্ম ও দর্শনের একটি বিশিষ্ট শিক্ষা সমস্ত মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এই ধর্ম ও দর্শনের নির্দেশ। জৈনেরা বলেন, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কোন জিনিস কি এবং কি নয় তা বিচার করলে সেই জিনিসের অসংখ্য দিক পাওয়া যায়। সুতরাং যে কোন জিনিস সম্বন্ধে আমরা যে কোন ঘোষণাই করি না কেন তা সেই জিনিসের যে বিশেষ দিকটি কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রকাশ করেছে সেই দিক থেকে সত্য। সুতরাং আমাদের জ্ঞান যে সীমিত এবং যে কোন জিনিস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে সেই জিনিসের সমস্ত দিকের পরিচয় বহন করে না, একথা মনে রাখা উচিত। এইজন্যই আমাদের কোন কথা খুব সতর্কভাবে বলা সঙ্গত এবং অন্যের মতও যে যুক্তিযুক্ত হতে পারে তা স্বীকার করা কর্তব্য।

সমস্ত ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী তীর্থঙ্করেরাই জৈনদর্শনে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেছেন।

সর্বশেষে বলি, জৈনদর্শন বাহ্যজগতের সত্যতা স্বীকার করে বলে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী (realistic), বহু আত্যন্তিক সত্তায় বিশ্বাসী বলে বহুতত্ত্ববাদী (pluralistic) এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না বলে নিরীশ্বরবাদী।

জৈনেরা বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী, বহুতত্ত্ববাদী এবং নিরীশ্বরবাদী।

৩। বৌদ্ধদর্শন

বৌদ্ধদর্শন জৈনদর্শনের মতই ধর্মও বটে।

বৌদ্ধদর্শন জৈনদর্শনের মতই ধর্মও বটে। এই দর্শন তথাগত গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ রোগ, জরা এবং মৃত্যুর দৃশ্য দেখে সংসারের অপরিসীম দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং সর্বশেষে এক সন্ন্যাসীকে দেখে সন্ন্যাস গ্রহণই দুঃখজয়ের উপায় বলে মনে করেছিলেন। দুঃখ-প্রসঙ্গ তাঁকে খুবই চিন্তিত করে তুলেছিল। তিনি এই ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য রাজৈশ্বর্য, সুন্দরী রূপবতী স্ত্রী এবং একমাত্র শিশুপুত্রকে মৃৎপাত্রের মত পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুমতলে সম্যক জ্ঞানের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন দীর্ঘকাল। সর্বশেষে দীর্ঘসাধনায় সিদ্ধি স্বরূপ সিদ্ধার্থ পেয়েছিলেন বুদ্ধত্ব এবং সেইজন্যই তিনি পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব নামেই সমধিক খ্যাত।

বুদ্ধদেব এই ধর্ম ও দর্শনের প্রবক্তা। তিনি চারটি সত্য উপলব্ধি করেছিলেন

বুদ্ধদেব "চত্বারি আর্য্য সত্যানি" বা চারিটি পবিত্র সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বোধিদ্রুমতলে। দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব এবং দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ও আছে—এই চারটি সত্য।

দুঃখ আছে, একথা বৌদ্ধদের মত অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকেরাও স্বীকার করেন।

দুঃখের অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রথম সত্যটি সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকেরাই স্বীকার করেন। আমরা এই প্রসঙ্গ ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মূলগত ঐক্য আলোচনাকালে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছি। বুদ্ধদেব তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে জানতে পেরেছিলেন যে, দুঃখ কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়, দুঃখ সমস্ত সত্তা ও অভিজ্ঞতায় অন্তঃস্যূত, সুতরাং সর্বব্যাপী। সাধারণতঃ যাকে সুখ বলে মনে করা হয় তাও স্বরূপতঃ দুঃখ।

সবই সর্তাধীন ও পরিবর্তনশীল। দুঃখের ও কারণ আছে।

দ্বিতীয় সত্য সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্ত কার্য-কারণ সম্পর্কের বিশ্লেষণনির্ভর। তিনি বলেন, বাহ্য বা আন্তর জগতের যে কোন জিনিসই অন্য কোন কারণের কার্য। নিঃসর্ত, স্বনির্ভর বলে কিছু নেই। সবই সর্তাধীন এবং পরিবর্তনশীল। কারণ ছাড়া কার্য হয় না। আমাদের দুঃখও কারণহীন নয়। জন্মই দুঃখের কারণ। জাগতিক বস্তুর তণ্‌হা বা তৃষ্ণা আবার জন্মের হেতু। কামনা-বাসনাই আমাদের দুনিয়ার ধূলার মালিন্যে টেনে আনে। আমাদের তৃষ্ণা বা কামনা মূলতঃ অজ্ঞানজন্য। আমরা যদি বস্তুর প্রকৃত পরিচয় অর্থাৎ এদের অনিত্য ও দুঃখরূপ জানতাম তবে কখনই এদের প্রতি আকৃষ্ট হতাম না। ফলে আমাদের জন্মও হতনা এবং আমাদের ডুবতেও হতনা দুঃখের দুস্তর সায়রে।

দুঃখের কারণ দূর করতে পারলে দুঃখ থাকে না।

দুঃখ অন্যান্য জিনিসের মত সর্তাধীন বলে দুঃখের সর্ত বা কারণ দূর করতে পারলে দুঃখ থাকবে না। এই হচ্ছে দুঃখ-নিবৃত্তি-সম্পর্কিত বুদ্ধদেবের তৃতীয় সত্য।

দুঃখের কারণ অপসারণের পথই দুঃখ-নিবৃত্তির পথ। এরই নাম বুদ্ধদেবের চতুর্থ সত্য। এই পথ "অষ্টাঙ্গিক মার্গ" নামে পরিচিত। সম্যগদৃষ্টি সম্যক সঙ্কল্প, সম্যগবাক্, সম্যক কর্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যগব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি এবং সম্যক সমাধি হচ্ছে মুক্তি-পথের আটটি অঙ্গ বা স্তর। এই অষ্টাঙ্গ পথ অজ্ঞান এবং তজ্জাত কামনা-বাসনা দূর করে। ফলে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয় এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। এরই নাম নির্বাণ।

দুঃখের কারণ অপসারণের পথই দুঃখ নিবৃত্তির পথ।

বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও উপদেশ ওপরে আলোচিত চারটি আর্য সত্যের মধ্যেই নিহিত। এই থেকেই বোঝা যায়, বুদ্ধদেব নিজে তথাকথিত দার্শনিক সমস্যার চেয়ে ব্যবহারিক জীবনের দুঃখজয়ের সমস্যা নিয়েই বেশি চিন্তা করেছেন। দুঃখদীর্ণ মানুষ যখন ব্যথায় কাঁদে তখন তার কাছে তাত্ত্বিক আলোচনা করে সময় নষ্ট করাকে বুদ্ধদেব অপরাধ বলে মনে করতেন। তবু তাঁর পক্ষে দার্শনিক আলোচনা থেকে একেবারে প্রতিনিবৃত্ত থাকা সম্ভব হয়নি। বুদ্ধদেবের শিক্ষা থেকে নিম্নলিখিত কয়েকটি দার্শনিক মত আমরা সংগ্রহ করতে পারি :

বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও উপদেশ থেকে আমরা কয়েকটি দার্শনিক মত সংগ্রহ করতে পারি।

(ক) সমস্ত জিনিসই সর্তাধীন, এমন কোন জিনিস নেই যা স্বনির্ভর বা সর্তশূন্য।

(খ) সর্তের পরিবর্তনের সঙ্গে সর্তনির্ভর বিষয়েরও পরিবর্তন হয়। জগতে নিত্য বলে কিছু নেই। সবই পরিবর্তনশীল।

(গ) আত্মা, ঈশ্বর বা অন্য কোন অপরিবর্তনীয় সত্তা নেই।

(ঘ) বর্তমান জীবনের সঙ্গে কর্মজন্য ভবিষ্যৎ জীবনের একটা ধারাবাহিকতা আছে, যেমন কোন বৃক্ষের সঙ্গে সেই বৃক্ষের বীজজন্য অন্য বৃক্ষের ধারাবাহিকতা থাকে। একটি মোমবাতি থেকে যদি আর একটি মোমবাতি জ্বালানো যায়, তবে প্রথমটি নিভে গেলেও দ্বিতীয়টি জ্বলে। ফলে মোমবাতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু তার নিত্যতা প্রমাণিত হয় না। তেমনই আত্মার ধারাবাহিকতা আছে, কিন্তু নিত্যতা নেই।

বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও উপদেশ ভিত্তি করে পরবর্তীকালে চারটি বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। মাধ্যমিক বা শূন্যবাদী সম্প্রদায়, যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায়, সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় এবং বৈভাষিক সম্প্রদায়ই হচ্ছে এই চতুর্সম্প্রদায়। আমরা অতি সংক্ষেপে এখানে এঁদের কিছু পরিচয় দেব। এদের সম্বন্ধে এবং ভারতীয় দার্শনিক সমস্ত সম্প্রদায় সম্বন্ধেই বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরবর্তী অধ্যায় গুলোতে করব।

বৌদ্ধ দর্শনের চারটি সম্প্রদায়।

(১) **মাধ্যমিক বা শূন্যবাদী সম্প্রদায়ঃ** এই সম্প্রদায়ের মতে জগৎ শূন্যস্বরূপ। বাহ্যবস্তু এবং আন্তরঅবস্থা সবই অসত্য। এই মতবাদের নাম শূন্যবাদ। পাশ্চাত্য দর্শনে ডেভিড হিউম অনেকটা এই মতবাদেরই প্রবক্তা।

এই মতে বাহ্য ও আন্তর সমস্ত বস্তুই মিথ্যা।

(২) **যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায়ঃ** এই সম্প্রদায় অনুসারে বাহ্যবস্তুর আত্যন্তিক সত্তা নেই। যা কিছু বাহ্য বলে প্রতিভাত হয় তা সব কিছুই মানসিক ধারণা মাত্র। মনের সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, মনকে অস্বীকার করতে হলে মন দিয়েই করতে হয় অর্থাৎ মনকে মেনে নিতে হয়। এরই নাম বিজ্ঞানবাদ। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বার্কলি এই মতবাদই প্রচার করেছেন।

এই মতে যা কিছু বাহ্য বলে প্রতিভাত হয় তা সব কিছুই মানসিক ধারণা মাত্র।

(৩) **সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ঃ** এই সম্প্রদায়ের মতে বাহ্যবস্তু এবং আন্তর অবস্থা দুইই সত্য। বাহ্যবস্তু যদি মনের ধারণা মাত্র হত তবে আমরা যে কোন জিনিস যে কোন জায়গাতেই ত প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। কিন্তু তা কি আমরা পারি? বাঘ বা সিংহ বা গণ্ডার যে কোন স্থানেই দেখা যায় কি? সুতরাং প্রত্যক্ষ বস্তুর অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ বস্তু থাকলেই প্রত্যক্ষ সম্ভব, না থাকলে সম্ভব নয়। সুতরাং বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। আমরা বস্তুর ধারণা থেকে সেই বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করি। বস্তু না থাকলে বস্তুর ধারণা থাকতে পারে না। এই মতবাদের নাম বাহ্যানুমেয়বাদ। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে জনলক অনুরূপ মতবাদ প্রচার করেছেন।

এই মতে বাহ্যবস্তু ও আন্তর অবস্থা দুইই সত্য। আমরা বস্তুর ধারণা থেকে বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করি।

(৪) **বৈভাষিক সম্প্রদায়ঃ** এই সম্প্রদায় সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের মতই বাহ্যবস্তু এবং আন্তর অবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করে। তবে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের মত বস্তুর ধারণা থেকে বস্তুর অনুমান হয়, একথা এই সম্প্রদায় বলে না। বৈভাষিকদের মতে বস্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষেই জানা যায়। কোন ধারণার অনুবর্তী বস্তু যদি কোনদিনই প্রত্যক্ষ না করা যায়, তবে ধারণা থেকে বস্তুর অস্তিত্ব অনুমানই বা করা যাবে কি করে? যে বস্তু কোনদিনইপ্রত্যক্ষ করিনি তা ত অনুমান করা যাবে না। এই মতবাদের নাম বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদ। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকেরা (Naive Realists) এই মতেরই সমর্থক।

এই মতেও বাহ্য ও আন্তর অবস্থা দুইই সত্য, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষেই বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব জানা যায়।

ধর্মব্যাপারে মতভেদের জন্য মহাযান ও হীনযান নামে বৌদ্ধধর্মের দুটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। কার মুক্তির জন্য সাধনা করতে হবে —নিজের না সকলের? এই সমস্যা নিয়েই মুখ্যতঃ এদের মতভেদ। মহাযানীদের মতে সকলের মুক্তির জন্যই ব্যক্তির সাধনা করা উচিত। কিন্তু হীনযানীরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, নিজের মুক্তির জন্যই নিজের সাধনা। ওপরে আলোচিত দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম দুটি মহাযান-পন্থী এবং শেষের দুটি হীনযানপন্থী। সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং শ্যামদেশে হীনযান পন্থারই প্রচার ও প্রতিষ্ঠা; কিন্তু তিব্বত, চীন এবং জাপানে মহাযানপন্থারই প্রাধান্য

ধর্মব্যাপারে মতভেদের জন্য বৌদ্ধধর্মের দুটি সম্প্রদায়—মহাযান ও হীনযান।

৪। ন্যায়দর্শন

ন্যায়দর্শন গৌতম মুনির সৃষ্টি। ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ এই চতুর্প্রমাণ। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সন্নিকর্ষের ফলে তার যে সাক্ষাৎ জ্ঞান জন্মে তাকেই বলে প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ দুই প্রকার—আন্তর ও বাহ্য। অন্তরেন্দ্রিয় বা মন দিয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান-এর নাম আন্তর প্রত্যক্ষ এবং বাহিরিন্দ্রিয় বা চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি দিয়ে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান জন্মে তাকে বলে বাহ্যপ্রত্যক্ষ। অনুমেয় বস্তুর সঙ্গে কোন লিঙ্গের অব্যভিচারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে লিঙ্গ মাধ্যমে সেই বস্তুর প্রত্যক্ষভিন্ন জ্ঞানকে অনুমান বলে। উদাহরণ দিলে ভাল বোঝা যাবে। ধূমের সঙ্গে অগ্নির অব্যভিচারী সম্পর্কে আছে। অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানেই অগ্নি। এর কোন ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নেই। কোথাও ধূম* (লিঙ্গ) দেখে যদি সেখানে অগ্নি আছে, একথা মনে করি, তবে অগ্নির জ্ঞানকেই অনুমান বলা হবে। অগ্নির জ্ঞান যে প্রত্যক্ষভিন্ন, এবিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। অনুমেয় বস্তু বা সাধ্য এবং লিঙ্গের যে অব্যভিচারী সম্পর্ক তার নাম ব্যাপ্তি। একটি অনুমানে অন্ততঃ পক্ষে তিনটি অবয়ব এবং তিনটি পদ থাকে। পক্ষ, সাধ্য এবং লিঙ্গ বা সাধন অনুমানের তিনটি পদ। যার সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা হয় তাকে বলে পক্ষ, যা অনুমিত হয় তার নাম সাধ্য এবং যে জিনিসের মাধ্যমে অর্থাৎ যে জিনিসের প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে অনুমান হয় তাকে বলে লিঙ্গ বা সাধন। পর্বতে ধূম দেখে পর্বতে অগ্নির অনুমানের ক্ষেত্রে পর্বত পক্ষ, ধূম লিঙ্গ বা সাধন এবং অগ্নি সাধ্য। সংজ্ঞা-সজ্ঞী সম্বন্ধ-জ্ঞানকে উপমান বলে। অর্থাৎ কোন বস্তুর সজ্ঞার্থ বা বর্ণনা শুনে সেই বস্তুর যে জ্ঞান হয় তাকে বলে উপমান। যে 'গবয়' কী জানেনা, তাকে যদি বলা হয় যে, 'গবয়' গরুর মতই, তবে গরুর চেয়ে বৃহদাকার বন্য প্রাণী এবং সে বনে সত্যই এরকম একটি প্রাণী দেখে যদি তাকে 'গবয়' বলে চিনতে পারে, তবে এই জ্ঞানকে উপমান বলা হবে। বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা গ্রন্থের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে লব্ধ জ্ঞানের নাম শব্দ। আমরা যখন শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন বিষয়ে লাভ করি তখন তাকে শব্দজ্ঞান বলে গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়-স্বীকৃত অন্যান্য প্রমাণগুলোকে নৈয়ায়িকেরা এই চতুর্প্রমাণে পর্যবসিত করেন।

মহর্ষি গৌতম ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। এই দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান উপমান ও শব্দ এই চারটি প্রমাণ স্বীকৃত।

জ্ঞানের বিষয়কে প্রমেয় বলে। নৈয়ায়িকেরা নিম্নলিখিত দ্বাদশ প্রমেয় স্বীকার করেছেন—(১) আত্মা (২) শরীর (৩) ইন্দ্রিয় (৪) অর্থ বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় (৫) বুদ্ধি (৬) মনস্ (৭) প্রবৃত্তি (৮) দোষ বা মানসিক ত্রুটি, যেমন রাগ দ্বেষ ও মোহ (৯) প্রেত্যাভাব বা পুনর্জন্ম (১০) ফল বা মানসিক ত্রুটিজাত সুখ-দুঃখের অনুভূতি (১১) দুঃখ (১২) অপবর্গ বা মুক্তি। ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন, এই দ্বাদশ প্রমেয়ই সব নয়, আরও আছে ; তবে মুক্তির জন্য এই কটি প্রমেয়ের জ্ঞানই প্রয়োজন।

জ্ঞানের বিষয়কে প্রমেয় বলে। ন্যায় দর্শনে দ্বাদশ প্রমেয় স্বীকৃত।

* যে জিনিস দেখে অন্য জিনিস অনুমান করা যায়, তাকেই লিঙ্গ বলে।

আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় এবং তার বিষয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করাই ন্যায়দর্শনের উদ্দেশ্য। ন্যায়মতে আত্মা দেহ ও মন থেকে ভিন্ন। দেহ জড় পদার্থ সৃষ্ট। মন সূক্ষ্ম, অবিভাজ্য, অনুপরিমাণ এবং নিত্য পদার্থ। সুখ-দুঃখের মত মানসিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্য মন একটি ইন্দ্রিয় বিশেষ। এর নাম অন্তরেন্দ্রিয়। আত্মা পদার্থ হলেও মন ও দেহভিন্ন পদার্থ, চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আত্মা যখন বিষয় সংযুক্ত হয় তখনই আত্মাতে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। মুক্তিকালে আত্মায় চৈতন্য থাকেনা। মন অনুপরিমাণ, কিন্তু আত্মা কর্তা ও ভোক্তা। রাগ, দ্বেষ ও মোহ সঞ্জাত মিথ্যা জ্ঞানের জন্যই আত্মা বিষয়ে আকৃষ্ট হয় এবং জন্ম, মৃত্যু, পাপ ও পুণ্যের নাগর দোলায় দোলে। অপবর্গ বা মুক্তি দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বোঝায়। তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তি লাভের উপায়। অনেকে বলেন, মুক্ত অবস্থায় অপরিসীম আনন্দের অভিজ্ঞতা হয় কিন্তু নৈয়ায়িকরা একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, অন্ধকার ছাড়া যেমন আলো হয় না তেমনি দুঃখ ছাড়া সুখ হতে পারে না। সুতরাং যখন দুঃখ নেই তখন সুখও নেই। মুক্ত অবস্থা দুঃখ মুক্ত কিন্তু সুখযুক্ত নয়।

আত্মা দেহ ও মন থেকে ভিন্ন। মুক্তি বলতে দুঃখ-মুক্তি বোঝায়।

নৈয়ায়িকেরা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি পরমাণু, দেশ, কাল, ব্যোম, মন ও আত্মার সাহায্যে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। জীবের পূর্ব জীবনের যথানির্দিষ্ট কর্মফল ভোগ করার জন্যই এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। জীব যাতে তার কর্মফল অনিবার্যভাবে পেতে বাধ্য হয়, ঈশ্বর সেই দিকে লক্ষ্য রাখেন। তাঁর বিচারে পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের তিরস্কার হবেই হবে।

ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ এবং ঈশ্বরের প্রকৃতি।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রমাণ নিম্নরূপ। সাবয়ব বস্তু কর্তা ভিন্ন সম্ভবপর নয়। এই জগৎ সমুদ্র, পর্বত, সূর্য, প্রভৃতি সাবয়ব (অবয়ব বা অংশযুক্ত) বস্তুতে পরিপূর্ণ। সুতরাং এই জগতেরও নিশ্চয়ই কোন কর্তা আছেন। জীবাত্মা তার সীমিত জ্ঞান ও ক্ষমতা নিয়ে এই জগতের স্রষ্টা হতে পারেনা, কারণ অদৃশ্য পরমাণু নিয়ে কাজ কারবার করা তার ক্ষমতার অতীত। জগতের স্রষ্টা অসীম ক্ষমতা ও অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী। বিশ্বের নৈতিক নিয়মের নিয়ন্তা কোন সচেতন আত্মাই হতে পারেন এবং তাঁকেই ঈশ্বর বলা হয়। জীবের কল্যাণের জন্যই ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জগতে শুধু সুখই থাকবে, দুঃখ থাকবে না এতটুকুও। কর্মে মানুষের স্বাধীনতা থাকায় সে স্বেচ্ছায় ভাল এবং মন্দ দু'রকম কাজই করবে, এই ত স্বাভাবিক। ফলে ভালকাজের জন্য সুখ এবং মন্দকাজের জন্য দুঃখভোগ তার পক্ষে অনিবার্য। তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহে ত্বরায় অথবা বিলম্বে সমস্ত জীবই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে দুঃখ সাগর পার হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে দুঃখ-সাগর পার হওয়া সম্ভব।

৫। বৈশেষিক দর্শন

বৈশেষিক দর্শন কণাদমুনি প্রতিষ্ঠিত এবং সপ্তপদার্থবাদী।

কণাদ মুনি বৈশেষিকদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। ন্যায়দর্শনের সঙ্গে বৈশেষিক-দর্শনের অনেক মিল। সেইজন্যই বৈশেষিক দর্শনকে ন্যায়দর্শনের সমানতন্ত্র বলা হয়। জীবমুক্তিই উভয় দর্শনের উদ্দেশ্য। বৈশেষিক দর্শন সমস্ত প্রমেয়গুলোকে সাতটি পদার্থে পর্যবসিত করেছে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব—এই সাতটি পদার্থ।

দ্রব্যের প্রকৃতি ও বিভিন্ন দ্রব্য।

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম থেকে ভিন্ন, কিন্তু গুণও কর্মেরই আধার। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, আকাশ, দেশ, কাল, আত্মা ও মন—এই নয়টি দ্রব্য। এদের মধ্যে প্রথম পাঁচটির নাম ভূত এবং গন্ধ, স্বাদ, বর্ণ, স্পর্শ এবং শব্দ যথাক্রমে এদের গুণ। এদের মধ্যে আবার প্রথম চারটি ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎ এই চার প্রকার পরমাণুর সৃষ্টি। পরমাণু অবিভাজ্য, অজ, অমর ও নিত্য। যে কোন জড়বস্তুকে ভাঙিতে ভাঙিতে শেষ পর্যন্ত আমরা পরমাণুতে এসে পৌঁছাই এবং পরমাণুকে আর ভাঙা যায় না। আকাশ, দেশ এবং কাল অদৃশ্য দ্রব্য এবং এদের প্রত্যেকেই নিত্য ও বিভু। মন নিত্য, কিন্তু বিভু নয়; পরমাণুর মত অণুপরিমাণ। মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলে এবং আন্তর অবস্থার জ্ঞান আমরা এই ইন্দ্রিয় দিয়েই পাই। মন অণুপরিমাণ বলে এক মুহূর্তে একাধিক অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব নয়। আত্মা চৈতন্যের আধার, নিত্য এবং বিভু দ্রব্য। "আমি সুখী" এইরূপ আন্তর প্রত্যক্ষে জীবাত্মার অস্তিত্ব জানা যায়। পরমাত্মা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব জগতের কারণ হিসাবে অনুমিত হয়। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ এবং পরমাণু জগতের উপাদান কারণ। ঈশ্বর পরমাণুর সাহায্যেই জগৎ সৃষ্টি করেন। পরমাণুর সংযোগ এবং বিয়োগ থেকেই যথাক্রমে জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়। তবে পরমাণু নিজে নিজেই সংযুক্ত বা বিযুক্ত হতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এরা সংযুক্ত বা বিযুক্ত হয়ে থাকে। ঈশ্বর কর্মের নীতি অনুসারে এদের সংযুক্ত এবং বিযুক্ত করেন। জীব কর্মানুসারে বা অদৃষ্ট অনুযায়ী যাতে যথাযথ ফল পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ঈশ্বর পরমাণু-সংযোগ করে জগৎ সৃষ্টি করেন। একেই বৈশেষিক পরমাণুবাদ বলা হয়। পাশ্চাত্য দর্শনের পরমাণুবাদের মত এই পরমাণুবাদ যান্ত্রিক বা জড়বাদী সম্মত নয়। যান্ত্রিক মতে পরমাণু সংযোগের পেছনে কোন উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে কর্মানুসারে বা অদৃষ্ট অনুযায়ী জীবদের ফল প্রদানের উদ্দেশ্যেই পরমাণু-সংযোগ। সুতরাং বৈশেষিক দর্শনের পরমাণুবাদ যান্ত্রিক নয়, উদ্দেশ্যমূলক। জড়বাদীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে জগতের নিমিত্ত কারণ রূপে ঈশ্বর স্বীকৃত হন। সুতরাং বৈশেষিক পরমাণুবাদ জড়বাদী সম্মত হতে পারেনা।

অন্তরিন্দ্রিয়

বৈশেষিক মতে গুণ দ্রব্যে থাকে, কিন্তু গুণের কোন গুণ বা কর্ম থাকে না। দ্রব্য কোন কিছুর ওপর নির্ভর না করেই থাকতে পারে, কিন্তু গুণ কোন না কোন দ্রব্যে

ছাড়া থাকতেই পারে না। গুণের কোন কর্ম বা গতি নেই। বৈশেষিক দর্শনে চতুর্বিংশতি গুণের কথা পাওয়া যায়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, সংস্কার, ধর্ম এবং অধর্ম। পরত্ব দৈশিক এবং কালিক দূরত্ব দুই-ই বোঝায়, অপরত্ব দৈশিক এবং কালিক নিকটত্ব সূচনা করে।

দ্রব্য ও গুণের সম্পর্ক।

কর্ম বলতে গতি বোঝায়। গুণের মত কর্মও দ্রব্যে থাকে। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন—এই পাঁচ প্রকার কর্ম।

কর্মের প্রকৃতি।

সমস্ত মানুষের এমন কিছু সাধারণ ধর্ম আছে যার জন্য তারা সকলেই একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত এবং অন্য শ্রেণী থেকে পৃথক। এই সাধারণ ধর্মই 'মনুষ্যত্ব' এবং একেই সামান্য বলা হয়। এই সামান্য কোন ব্যক্তি মানুষের জন্মের সঙ্গে জন্মগ্রহণ করে না এবং কোন ব্যক্তি মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে পঞ্চত্ব প্রাপ্তও হয় না। সামান্য নিত্য, ব্যক্তি অনিত্য। ব্যক্তি-মানুষ জন্মগ্রহণ করে ও মরে, কিন্তু মনুষ্যত্বের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। এইজন্যই একটি বিশেষ শ্রেণীর সমস্ত ব্যক্তির সাধারণ এবং নিত্য ধর্মকে সামান্য বলা হয়।

সামান্য।

বিশেষ সামান্যের বিপরীত স্বভাব। দেশ, কাল, আকাশ, মন এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ পরমাণুর মত নিরংশ এবং নিত্য দ্রব্যের ঐকান্তিক বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ বলে। একটি মন বা আত্মা থেকে অন্য আর একটি মন বা আত্মার পার্থক্য কিভাবে নির্ণয় করা যায়? একটি অপ-পরমাণু থেকে অন্য আর একটি অপ-পরমাণুর তফাৎই বা বুঝি কি করে? এরা যে পরস্পর পৃথক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অংশের বিভিন্নতার দ্বারা এদের পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না, কারণ এরা নিরংশ বা অংশহীন। অন্যদিকে এরা প্রায় একরূপ। সুতরাং পারস্পরিক ভেদ-নির্ণয়ের জন্য এদের ঐকান্তিক বৈশিষ্ট্য কিছু স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। বিশেষ পদার্থ অন্যভাবে ভেদহীন দ্রব্যের ভেদ-নির্ণয়ের জন্য স্বীকৃত এই ঐকান্তিক বৈশিষ্ট্য। নিত্য দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য বলে বিশেষ ও নিত্য। অনেকে বলেন, বিশেষ পদার্থের বিশেষ আলোচনা যে দর্শনে পাওয়া যায়, তারই নাম বৈশেষিক দর্শন।

বিশেষ।

যে নিত্য সম্পর্কের ভিত্তিতে অংশী অংশে থাকে, গুণ বা কর্ম দ্রব্যে থাকে, সামান্য বিশেষে থাকে, তাকেই বলে সমবায়। অংশী বস্ত্র তার অংশ তন্তুতে থাকে, রূপ, রস প্রভৃতি গুণ এবং আকুঞ্চন, প্রসারণ প্রভৃতি কর্ম কোন না কোন দ্রব্যে থাকে, 'মনুষ্যত্ব'—সামান্য সমস্ত মানুষের মধ্যেই বর্তমান। অংশীর সঙ্গে অংশের, গুণ ও কর্মের সঙ্গে দ্রব্যের এবং সামান্যের সঙ্গে বিশেষের এই যে নিত্য সম্পর্ক তা-ই সমবায়।

সমবায়।

অভাব বলতে বস্তুর নাস্তিত্ব বোঝায়। জলের আকার নেই, ফুলটি সাদা নয়, ঘটপট নয় প্রভৃতি বচন কোন না কোন কিছুর নাস্তিত্ব সূচনা করে বলে এরা সবাই অভাব পদার্থ-নির্দেশক। অভাব চার প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব

এবং অন্যোন্যাভাব। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি আবার সংসর্গাভাবের অন্তর্গত। কোন কিছু উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে সেই বস্তুর উপাদানে বস্তুর যে অভাব তাকে বলে প্রাগভাব, যেমন মূর্তি তৈরি হওয়ার আগে মাটিতে মূর্তির অভাব। কোন কিছু ধ্বংস হলে ধ্বংসাবশেষে বস্তুর যে অভাব তারই নাম ধ্বংসাভাব, যেমন কপাল বা ঘটখণ্ডে ঘটের অভাব। কোন বস্তুতে অন্য কিছুর চিরকালের অনুপস্থিতিকে অত্যন্তাভাব বলে, যেমন বায়ুতে রূপের অভাব। রূপ কোনদিনই বায়ুতে থাকে না। এই তিন প্রকার অভাবই কোন কিছুতে অন্য কিছুর অভাব বোঝায় বলে এদের সবাইকেই বলে সংসর্গাভাব। একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য আর একটি বস্তুর ভেদ যে অভাব সূচনা করে তাকেই বলে অন্যোন্যাভাব। যখন দুটি জিনিস ভিন্ন, তখন একটির অভাব অন্যটিতে সর্বজনস্বীকৃত। বস্ত্র দুগ্ধ নয়, দুগ্ধও বস্ত্র নয়। দুটি ভিন্ন জিনিসে এইরূপ একটিতে আর একটির পারস্পরিক অভাবকে অন্যোন্যাভাব বলে।

অভাব।

অত্যন্তাভাব সম্বন্ধে অন্যমত।

ঈশ্বর, জীবের বন্ধন ও মুক্তি প্রভৃতি তত্ত্বালোচনায় বৈশেষিক দর্শন ন্যায়মত অনুসরণ করে। মত-সাদৃশ্যের জন্যই বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনকে সমানতন্ত্র বলা হয়।

ন্যায় ও বৈশেষিক সমানতন্ত্র।

৬। সাংখ্যদর্শন

সাংখ্যদর্শন সর্বপ্রাচীন দর্শন নামে পরিচিত। কপিলমুনি এই দর্শনের স্রষ্টা। এই মতে পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্রসিদ্ধ দুটি আত্যন্তিক তত্ত্ব। এইজন্যই সাংখ্যদর্শনকে দ্বৈতবাদী দর্শন বলা হয়। পুরুষ চৈতন্যস্বভাব। চৈতন্য পুরুষের গুণ নয়, স্বরূপ। দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন থেকে ভিন্ন আত্মাই পুরুষ। এই আত্মা বা পুরুষ জগতের সমস্ত পরিবর্তন ও গতির সাক্ষী বা দ্রষ্টা, কিন্তু নিজে অপরিবর্তিত এবং অপরিবর্তনীয়। খাট, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি জড়বস্তু সচেতন প্রাণীর ভোগের জন্যই ব্যবহৃত হয়। এরা কখনই নিজেদের ভোগে লাগে না। সুতরাং জড় বা প্রকৃতি থেকে ভিন্ন প্রকৃতিজাত জড়বস্তুর ভোক্তারূপে পুরুষ বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই। সাংখ্যকর্তারা বলেন, দেহভেদে আত্মা বা পুরুষ ভিন্ন; বহু পুরুষ স্বীকার না করলে সকলেরই একসঙ্গে জন্ম বা মৃত্যু বা একই জ্ঞান হত। কিন্তু তা হয়না বলে বহু পুরুষের অস্তিত্বই স্বীকার করতে হয়।

সাংখ্যদর্শন কপিল মুনি প্রতিষ্ঠিত দ্বৈতবাদী দর্শন।

প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ, নিত্য ও জড়। পুরুষের ভোগে লাগা ছাড়া এর নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য নেই। প্রকৃতি নিত্য চঞ্চলাও বটে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির তিনটি উপাদান, কিন্তু এরা গুণ নামে অভিহিত। সাধারণতঃ এই তিনটি গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে। জাগতিক বস্তুর সুখ, দুঃখ এবং নিস্পৃহতা উৎপাদনের ক্ষমতা দেখে গুণের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় একই মিষ্টদ্রব্য একই লোকের কাছে কখনও সুখ,

প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ।

কখনও দুঃখ, কখনও বা নিস্পৃহতা সৃষ্টি করে। এমনিভাবে দেখান যায় যে, জগতের প্রত্যেকটি দ্রব্যেরই সুখ, দুঃখ এবং নিস্পৃহতা উৎপাদনের ক্ষমতা বর্তমান। সাংখ্যমতে কার্যকারণ সম্ভাবনারূপে থাকে; কারণ কার্যের অব্যাক্তরূপ, কার্য কারণের ব্যাক্তি বা প্রকাশ। দুগ্ধে যে দধির সম্ভাবনা আছে, তাই দধিতে পরিস্ফুট হয়। এই মতবাদের নাম সৎকার্যবাদ। জগতের সমস্ত বস্তুরই সুখ, দুঃখ এবং নিস্পৃহতা গুণ বর্তমান বলে এদের কারণ প্রকৃতিতেও যথাক্রমে সুখ, দুঃখ ও নিস্পৃহতা গুণযুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ থাকবে। সত্ত্ব প্রকাশক, রজঃ কর্মদ্যোতক এবং তমঃ আবরক।

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হলেই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয় এবং প্রকৃতি সৃষ্টিউন্মুখ হয়ে ওঠে। প্রকৃতির সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া নিম্নলিখিতরূপে অগ্রসর হয়। প্রকৃতি থেকে প্রথমতঃ বিরাট বিশ্বের বীজস্বরূপ মহৎ আবির্ভূত হয়ে থাকে। আত্ম-চৈতন্য এই মহতে প্রতিবিম্বিত হয় এবং ফলে মহৎকে চেতন বলে মনে হয়। চৈতন্যের জন্য একে বুদ্ধিও বলে। বুদ্ধি থেকে অহঙ্কারের সৃষ্টি। অভিমান অহঙ্কারের বৈশিষ্ট্য। আত্মা ভুল করে অহঙ্কারের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন ভাবে, নিজেকে কর্তা বলে মনে করে। অহঙ্কার থেকে সত্ত্বগুণাধিক্যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞান ও কর্ম উভয়েন্দ্রিয় মন সৃষ্ট হয়। তমঃগুণাধিক্যে অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র বা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের সম্ভাবনাযুক্ত পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি করে। পঞ্চতন্মাত্র থেকে আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ ও ক্ষিতি এই পঞ্চমহাভূত আবির্ভূত হয়। পুরুষ ও প্রকৃতিসহ সর্বসমেত এই পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্ব সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। এদের মধ্যে পুরুষ ভিন্ন আর সবই প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত তত্ত্ব। প্রকৃতি সমস্ত বস্তুর আদি কারণ। মহৎ, অহঙ্কার এবং পঞ্চ-তন্মাত্র একদিকে যেমন কতগুলো কার্যের কারণ, তেমনি অন্যদিকে আবার নিজেরাও কতগুলো কারণের কার্য। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ মহাভূত কার্য কিন্তু কারণ নয়। পুরুষ বা আত্মা কারও কারণ বা প্রকৃতি নয়, আবার কারও কার্য বা বিকৃতিও নয়।

আত্মা স্বরূপতঃ অসঙ্গ বা মুক্ত।

আত্মা স্বরূপতঃ অসঙ্গ বা মুক্ত এবং মৃত্যুহীন। কিন্তু অবিদ্যা বা অজ্ঞানের এমনই প্রভাব যে আত্মা নিজেকে দেহ ও ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন বলে ভাবতে পারে না। আত্মা ও অনাত্মার এই অবিবেক সমস্ত দুঃখ, দুর্গতি ও লাঞ্ছনার কারণ। আমাদের দেহ পঙ্গু বা আহত হলে নিজেরাই পঙ্গু বা আহত বলে মনে করি। আসলে দেহ যে আত্মা নয়, এই বোধ নেই বলেই আমাদের এই মনোভাব। অনুরূপভাবে আত্মা যেন মন নয়, এই ধারণা না থাকার জন্যই মনের সুখ ও দুঃখ আত্মার সুখ ও দুঃখ বলে গৃহীত হয়। একবার যদি আমরা আত্মা যে দেহ ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বা অনাত্মা নয়, এই বোধ জাগ্রত করতে পারি তবেই জীবনের সুখ-দুঃখ, সার্থকতা-ব্যর্থতা ও আশা-নৈরাশ্য আর আমাদের প্রভাবান্বিত করতে পারে না। আত্মা তখন সমস্ত কিছুর নিস্পৃহ দ্রষ্টা হিসেবে অবস্থান করে এবং কোন কিছুর কোন কলঙ্কই তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। এই অবস্থার নামই

মুক্তি বা কৈবল্য বা অপবর্গ। এই মুক্তিলাভই মানুষের জীবনের পরম পুরুষার্থ। এই জগতে বেঁচে থেকেও এই অবস্থা লাভ করা যায়। এর নাম জীবন্মুক্তি। আবার মৃত্যুর পরও এই অবস্থার অধিকারী হওয়া সম্ভব। একে বলে বিদেহ মুক্তি। এই মুক্তি নিঃসন্দেহে তত্ত্বজ্ঞান থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞানঅর্জন কঠোর সাধনা সাপেক্ষ। নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মার জ্ঞান অর্জনের জন্য যে সাধনা আবশ্যক তার বিশেষ পরিচয় যোগদর্শনে পাওয়া যায়। যোগনির্দিষ্ট সাধনপথে অগ্রসর হলেই তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মদর্শন সম্ভব। এই পথেই মুক্তি মেলে।

সাংখ্যদর্শনের মূল সুর, ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস।

সাংখ্য দর্শনের মূল সুর ঈশ্বর-বিশ্বাস-বিরোধী। সাংখ্যমতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা অযৌক্তিক। জগতের কারণরূপে ঈশ্বর-স্বীকৃতির কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃতিই জগতের যথাযোগ্য কারণ। কারণ কার্য উৎপন্ন করতে পরিবর্তিত হয়, নিত্য ও অপরিণামী ঈশ্বরের পক্ষে জগৎ সৃষ্টি করতে গিয়ে পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ঈশ্বর জগতের কারণ হতে পারে না। সাংখ্যদর্শনের কোন কোন ভাষ্যকার জগতের সাক্ষী বা দ্রষ্টারূপে পরম পুরুষ বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের পক্ষপাতী। অবশ্য তাঁরা বলেন, এই ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা নন, দ্রষ্টা মাত্র।

৭। যোগ দর্শন

সাংখ্যযোগ সমানতন্ত্র। তবে যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত।

ন্যায়বৈশেষিকের মত সাংখ্যযোগও সমানতন্ত্র। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এবং প্রমাণাবলী যোগদর্শনও স্বীকার করে। তবে যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকার করা হয়। সাংখ্যদর্শনে সাধারণতঃ তা করা হয় না। সেইজন্যই যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। ঋষি পতঞ্জলি এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। সেইজন্য একে পাতঞ্জল দর্শনও বলে।

চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ।

সাংখ্যদর্শনে বিবেকজ্ঞান মুক্তিলাভের উপায় বলে স্বীকৃত হয়েছে। বিবেকজ্ঞান লাভের জন্য অপরিহার্য সাধন-পদ্ধতি নির্দেশ করাই যোগদর্শনের মুখ্য কাজ। মানসিক চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি বা চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলা হয়েছে। এই যোগ অর্জন করতে পারলেই বিবেকজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। যোগদর্শনে চিত্তভূমির পাঁচটি স্তরের কথা বলা হয়েছে। প্রথমতঃ, ক্ষিপ্ত অবস্থায় মন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পাগলের মত ছোটে। দ্বিতীয়তঃ, মূঢ় অবস্থায় মন আচ্ছন্ন থাকে। নিদ্রায় এই অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয় অবস্থায় মন অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়। একে বলে বিক্ষিপ্ত অবস্থা। এই তিনটির কোন অবস্থাতেই যোগলাভ সম্ভব নয়। চতুর্থ এবং পঞ্চম অবস্থার নাম যথাক্রমে একাগ্র ও নিরুদ্ধ। কোন একটি বিশেষ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশকে একাগ্র অবস্থা বলে। নিরুদ্ধ অবস্থায় মন সম্পূর্ণ স্বস্থ হয়, তার কোন কাজই থাকে না। চিত্তভূমির চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরই যোগলাভের সহায়ক। যোগ বা সমাধি দ্বিবিধ

বলে কথিত হয়েছে—সমপ্রজ্ঞাত এবং অসমপ্রজ্ঞাত। প্রথম প্রকার সমাধিতে মন একটি বিশেষ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট থাকে এবং ফলে সেই বিষয়ের সুস্পষ্ট ধারণা হয়। দ্বিতীয় প্রকার সমাধিতে সমস্ত মানসিক চাঞ্চল্য বা চিত্তবিকার রুদ্ধ হয় এবং এই অবস্থায় সাধক সম্পূর্ণরূপে আত্মসমাহিত হন।

সমাধিলাভের জন্য আটটি ধাপ বেয়ে অগ্রসর হতে হয়। এই আটটি ধাপকে যোগাঙ্গ বলে।

যোগ বা সমাধিলাভের জন্য আটটি বিভিন্ন ধাপ বেয়ে অগ্রসর হতে হয়। এদের যোগাঙ্গ বলে। যম বা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, নিয়ম বা সন্তোষ প্রভৃতি সৎগুণ অর্জন, আসন বা বসার বিভিন্ন ভঙ্গী অভ্যাস, প্রাণায়াম বা শ্বাস নিয়ন্ত্রণ, প্রত্যাহার বা বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়ের প্রতিনিবৃত্তি, ধারণা বা মনোনিবেশ, ধ্যান বা একাগ্র মনন এবং সমাধি বা চিত্তের বিকার-নিরোধ অষ্টবিধ যোগাঙ্গ নামে পরিচিত।

যোগদর্শনে ঈশ্বরের প্রকৃতি ও প্রয়োজন।

যোগদর্শনে চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য ঈশ্বর-প্রণিধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যোগসিদ্ধান্ত অনুসারে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, বিভু, সব দোষ মুক্ত, নিত্য এবং পরিপূর্ণ পুরুষ। যোগদর্শনে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নিম্নরূপ। (১) পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ থেকেই জগতের অভিব্যক্তি। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ স্বভাব। সুতরাং একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পরিপূর্ণ পুরুষের পক্ষেই এদের মধ্যে সংযোগবিধান সম্ভব। এই পরিপূর্ণ পুরুষই ঈশ্বর।

(২) যারই পরিমাণ বা মাত্রাভেদ আছে, তারই সর্বনিম্ন এবং সর্বাধিক পরিমাণ বা মাত্রা সম্ভব। জ্ঞানের পরিমাণ বা মাত্রাভেদ সর্বজন স্বীকৃত। সুতরাং জ্ঞানের চরম মাত্রা বা সর্বজ্ঞতাও অবশ্য স্বীকার্য। এই সর্বজ্ঞই ঈশ্বর।

৮। মীমাংসা দর্শন

জৈমিনি মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা।

বেদের দুই ভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বিভিন্ন যাগযজ্ঞ উদযাপনের নির্দেশ রয়েছে কর্মকাণ্ডে। যে দর্শন বৈদিক কর্মকাণ্ড বা যাগযজ্ঞ যুক্তি দিয়ে সমর্থন করে এবং কর্মকাণ্ড-ভিত্তিক জগৎ ও জীবনবোধের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে, তারই নাম পূর্বমীমাংসা বা মীমাংসা-দর্শন। জৈমিনি মীমাংসাদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা।

মীমাংসক মতে প্রমাণ।

বেদপ্রামাণ্যই যাগযজ্ঞের ভিত্তি। মীমাংসকেরা বলেন, বেদ অপৌরুষেয়; সুতরাং সাধারণ মানুষের দ্বারা লিখিত গ্রন্থে যে সব ভুল থাকে বেদে তা থাকা অসম্ভব। বেদ নিত্য এবং স্বনির্ভর। লিখিত বা কথিত বেদ বিশেষ বিশেষ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মাধ্যমে নিত্যবেদের সাময়িক প্রকাশ মাত্র। বেদপ্রামাণ্য প্রদর্শনের জন্য মীমাংসকেরা প্রমাণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ। পর্যাপ্ত উপকরণ থাকলেই জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয় সুস্থ থাকলে এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হলে প্রত্যক্ষ হতে বাধ্য।

যথাযোগ্য ভিত্তি থাকলেই তার ওপর নির্ভর করে অনুমান সম্ভব। যখন আমরা ইতিহাস পড়ি, তখন শব্দ-প্রমাণের ওপর নির্ভর করে অতীতের জ্ঞান পাই। এসব প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উৎপন্ন জ্ঞান সত্যতা দাবী করে এবং আমরা যুক্তি না দিয়েই এদের দাবীর সত্যতা মেনে নিই। যদি সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে তবে জ্ঞানই হয়না। কারণ বিশ্বাস জ্ঞানের অঙ্গ এবং সংশয় থাকলে বিশ্বাস থাকতে পারে না। আমরা যখনই বেদ পাঠ করি, তখনই বেদ-নির্দেশের সত্যতা স্বীকার করি। অন্যান্য জ্ঞানের মতই বেদভিত্তিক জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ। যদি বেদ সম্বন্ধে কোন সংশয় জাগে, তবে মীমাংসা-দর্শন-নির্দিষ্ট যুক্তির দ্বারা এই সন্দেহ নিরসন করা যায় এবং তখন বেদ-প্রামাণ্য আবার ভাস্বর হয়ে ওঠে। আসলে বেদে অবিশ্বাস পোষণ করা শেষ পর্যন্ত কখনই সম্ভব নয়।

ধর্ম ও অধর্ম।

বেদনির্দিষ্ট কর্মই ধর্ম এবং বেদ-নিষিদ্ধ কর্ম অধর্ম। যা ধর্ম তাই আমাদের করা উচিত। অধর্ম না করা আমাদের কর্তব্য। ফললাভের বাসনা নিয়ে কর্তব্য করা অনুচিত। কর্তব্য হিসেবেই কর্তব্য করা বিধেয়। বেদনির্দিষ্ট যাগযজ্ঞ বেদনির্দিষ্ট বলেই করা উচিত। ফললাভের বাসনাই যেন আমাদের যাজ্ঞযজ্ঞ করতে প্ররোচিত না করে। আত্মসংযম এবং সম্যক জ্ঞান থাকলেই বৈধকর্ম নিষ্কামভাবে করা সম্ভব। দীর্ঘকাল নিষ্কামভাবে বৈধকর্ম করলে কর্মনাশ হয় এবং মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ ঘটে। প্রাচীন মীমাংসকদের মতে মুক্ত অবস্থা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বা স্বর্গসুখ সূচনা করে। কিন্তু পরবর্তীকালের মীমাংসকেরা মুক্তি বলতে জন্মরোধ এবং দুঃখনাশ বুঝতেন। তাঁরা মুক্ত অবস্থাকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অবস্থা বলে ঘোষণা করেন নি।

আত্মার প্রকৃতি।

আত্মা নিত্য ও অমর। যদি আত্মা মৃত্যুতেই ধ্বংস হয়ে যেত, তবে 'অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করলে স্বর্গলাভ হয়' এই বেদবাক্য নিষ্ফল হত। জৈনদের মত মীমাংসকেরাও আত্মা এবং দেহ অভিন্ন, এই চার্বাক মত খণ্ডন করে নিরপেক্ষ যুক্তির ভিত্তিতে আত্মার অমরতা প্রমাণ করেছেন। আমরা বিস্তারিতভাবে মীমাংসামত আলোচনার সময় সেই সমস্ত যুক্তির উল্লেখ করবো। মীমাংসকেরা চৈতন্যকে আত্মার স্বরূপ বা আত্মগত নিত্য গুণ বলে স্বীকার করেন না। এঁদের মতে চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ। আত্মা যখন দেহযুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়গুলো যখন বিষয়ের সংস্পর্শে আসে, একমাত্র তখনই আত্মাতে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। এই ব্যাপারে মীমাংসক মতের সঙ্গে ন্যায়মতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। নৈয়ায়িকেরাও চৈতন্যকে আত্মার আগন্তুক গুণ বলেই উল্লেখ করেছেন। মীমাংসকদের মতে বিদেহ মুক্ত আত্মার পরিস্ফুট চৈতন্য নেই, তবে চৈতন্যের সম্ভাবনা আছে।

দেহযুক্ত আত্মার বিবিধ প্রকার জ্ঞানই সম্ভব। জ্ঞান কতভাবে পাওয়া যায় বা প্রমাণ ক'টি এই প্রশ্নের উত্তর সমস্ত মীমাংসকেরাই একইভাবে দেন না। এই প্রসঙ্গে মীমাংসা দর্শনের দুটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি প্রাভাকর প্রবর্তিত—নাম প্রাভাকর সম্প্রদায়, অন্যটি কুমারিলভট্ট প্রতিষ্ঠিত—নাম

ভাট্ট সম্প্রদায়। প্রাভাকর মতে প্রমাণ পাঁচটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এবং অর্থাপত্তি। প্রথম চারটি প্রমাণ ন্যায়দর্শনের মতই স্বীকৃত হয়েছে। উপমান ভিন্ন অন্যান্য প্রমাণের ব্যাখ্যাও ন্যায়দর্শনের মতই। উপমান প্রসঙ্গে মীমাংসামত নিম্নরূপ। একজন লোক হনুমান দেখে যদি বনে যায় এবং সেখানে একটি বানর দেখে বলে—'এই বানরটি হনুমানের মত' এবং তার পরে প্রত্যক্ষনির্ভর এই বচনের ভিত্তিতে যদি বলে—'অতীতে যে হনুমান দেখেছিলাম তা এই বানরের মত' তবে এই জ্ঞানই উপমান বলে বুঝতে হবে। এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা যায় না। কারণ, এইক্ষেত্রে হনুমান অনুপস্থিত এবং কোন বস্তুর অনুপস্থিতিতে তার প্রত্যক্ষ হয় না। আপাতবিরোধের ক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান যে প্রমাণ নির্ভর করে পাওয়া যায়, তারই নাম অর্থাপত্তি। যখন দেবদত্ত দিনে খায় না আমরা জানি, অথচ তাকে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ দেখি, তখন সে রাতে খায়, এই কথা ভাবি। এই ভাবনা অর্থাপত্তি প্রমাণ-নির্ভর। ভাট্ট মীমাংসকেরা ওপরে আলোচিত পঞ্চ প্রমাণ ভিন্ন একটি ষষ্ঠ প্রমাণও স্বীকার করেন। এর নাম অনুপলব্ধি। দিনের আকাশ দেখে বলি 'আকাশে তারা নাই।' এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হতে পারে না। কারণ, বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ না হলে প্রত্যক্ষ হয় না। আর যে তারা নেই তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হবে কি করে? অনুরূপ বস্তুর নাস্তিত্বজ্ঞান যে প্রমাণের মাধ্যমে হয়, তারই নাম অনুপলব্ধি। দিনের আকাশে তারার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না বলেই বলি 'আকাশে তারা নাই।' তাই একে অনুপলব্ধি ছাড়া আর কি বলা যাবে?

মীমাংসা দর্শনের দুটি সম্প্রদায়—প্রাভাকর এবং ভট্ট। এদের মত পার্থক্য আছে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের ওপর নির্ভর করে মীমাংসকেরা জড়জগতের সত্যতা স্বীকার করেন। সুতরাং ন্যায়দর্শনের মতই এই দর্শনও বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী। মীমাংসকেরা আত্মার অস্তিত্বও স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা জগতের স্রষ্টা কোন পরমাত্মা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। অন্যান্য আস্তিক দার্শনিকদের মত এঁরা সৃষ্টি ও প্রলয়চক্রেও বিশ্বাসী নন। এঁদের মতে জগৎ একই অবস্থাতে চিরকাল আছে। জগতের আরম্ভও নেই, শেষও নেই। আত্মার কর্মানুসারে জগতের বিভিন্ন বস্তু গঠিত হয়। কর্মের নিয়ম বিশ্ব পরিচালনা করে। এই নিয়ম স্বাধীন, স্বাভাবিক ও নৈতিক। মীমাংসকরা বলেন, যখন কোন লোক কোন যজ্ঞ করেন, তখন তাঁর আত্মায় 'অপূর্ব' নামে একটি সংস্কার জন্মে। এই অপূর্বই পরবর্তীকালে সুযোগমত যজ্ঞের ফল প্রদান করে। এই অপূর্বের জন্যই ইহলোকে কৃতযজ্ঞের ফল পরলোকে পাওয়া যায়।

মীমাংসকরা বস্তুস্বাতন্ত্র্য-বাদী।

৯। বেদান্ত দর্শন

ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈদান্তিকদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে বেশী। ফলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে, বিদেশে ভারতীয় দর্শন বলতে লোকে বেদান্তদর্শনই বোঝে। বেদান্তদর্শন উপনিষদভিত্তিক। উপনিষদ বৈদিক যুগের

সর্বশেষ সাহিত্য-সৃষ্টি এবং বৈদিক চিন্তার পরাকাষ্ঠা উপনিষদেই পাওয়া যায়। সেই-জন্যই উপনিষদের আর এক নাম বেদান্ত। উপনিষদ অনেক এবং বিভিন্ন উপনিষদে অনেক সময় বিরুদ্ধ কথার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বাদরায়ন ব্যাস এইজন্যই উপনিষদের সর্বসম্মত মূল বক্তব্য একত্র করে সূত্রাকারে প্রকাশ করেছেন। এরই নাম ব্রহ্মসূত্র।

বেদান্তদর্শন উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য নির্ভর।

সূত্রগুলো এত সংক্ষিপ্ত যে, অনেক সময়ই এদের অর্থ সুস্পষ্ট নয়। সেইজন্য বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে এই সূত্রের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফলে বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ এবং রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সমধিক প্রসিদ্ধ। ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্যায় শঙ্করাচার্যের প্রভাব অপরীসীম। বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি বলে যা প্রচারিত হয় তা মুখ্যতঃ শঙ্কর্যাচার্যেরই মত। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ এই মতই প্রচার করেছেন দেশে ও বিদেশ। আমরা এখানে শাঙ্কর এবং রামানুজ বেদান্তই একটু বিশেষভাবে আলোচনা করবো।

বেদান্তের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শঙ্কর ও রামানুজের সম্প্রদায়ই বিশেষ বিখ্যাত।

বেদান্তদর্শন তিনটি প্রস্থান ভিত্তিক—শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়। ব্রহ্মসূত্র শ্রুতিপ্রস্থান, ভগবদ্গীতা স্মৃতিপ্রস্থান এবং ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য ন্যায়প্রস্থান। এমন কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায় নেই যা ব্রহ্মসূত্র এবং ভগবদ্গীতায় নির্ভর না করে এবং যার নিজস্ব কোন ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য নেই।

ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাতিরিক্ত এক বিরাট পুরুষের কল্পনা করা হয়েছে। এই বিশ্বের সমস্ত সজীব ও নির্জীব বস্তু, মানুষ ও ঈশ্বর এই পুরুষেরই অংশ হিসেবে কল্পিত। নাসদীয়সূক্তে সমস্ত বিশেষণের অতীত বিশ্বভূবন বিধৃত এক সত্তার কথা আছে। উপনিষদে এই পুরুষ বা সত্তাকেই কখনও শুধু সৎ, কখনও আত্মা, কখনও বা ব্রহ্ম নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই সত্তা থেকেই ভূত সকল জাত হয়েছে, এই সত্তাতেই তাদের স্থিতি এবং এই সত্তাতেই তারা লয় পায়। জগতের সবকিছুই যে একই সত্তার প্রকাশ এবং বহু বা নানা বলে যে কিছু নেই, উপনিষদ বারবার একথা ঘোষণা করেছেন। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (সব কিছুই ব্রহ্ম), অয়ম আত্মা ব্রহ্ম (এই আত্মা ব্রহ্ম), নেহ নানাস্তি কিঞ্চন (এখানে নানা বলে কিছু নেই) প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক উপনিষদের বাণী। উপনিষদ ব্রহ্মকে সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ বলে অভিহিত করেছেন। (সত্যম্ জ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম)।

বেদ ও উপনিষদের মধ্যে বৈদান্তিক চিন্তার উদ্ভব ও বিকাশ।

শঙ্করাচার্য উপনিষদ এবং ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, অদ্বৈতবাদই এদের মূল বক্তব্য। শাঙ্কর মত নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। সংক্ষেপে অর্ধশ্লোকে সাধারণতঃ শঙ্করের বক্তব্য প্রকাশ করে বলা হয়—"ব্রহ্ম সত্যং, জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব নাপর" অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নয়। প্রত্যেকটি কথাই ব্যাখ্যা করে বোঝান দরকার।

শঙ্কর অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন।

ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বলতে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নেই, একমাত্র এই বোঝায় না, ব্রহ্মের মধ্যেও কোন কিছু নেই অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বগতভেদরহিত, এই কথাও বোঝায়। শঙ্করের মতে ব্রহ্মের সজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত কোন ভেদই নেই। একই জাতির অন্তর্গত দুটি ব্যক্তির যে ভেদ তাকে বলে সজাতীয় ভেদ। ব্রহ্ম কোন জাতির অন্তর্গত নয়, কারণ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। সুতরাং তার সজাতীয় ভেদের প্রশ্নই ওঠেনা। ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ নেই। দুটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভেদকে বিজাতীয় ভেদ বলে। ব্রহ্ম নিজে জাতি নয় এবং ব্রহ্মের অনুরূপ অন্য কোন জাতিও নেই, সুতরাং তার বিজাতীয় ভেদ অসম্ভব। আর ব্রহ্মের যে স্বগত ভেদ নেই, সে কথা ত আগেই বলেছি। ব্রহ্মকে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব বলা হয়েছে। নিত্য, শুদ্ধ প্রভৃতি ব্রহ্মের কোন গুণ নয়, স্বরূপ। ব্রহ্ম আসলে নির্গুণ। ব্রহ্ম নিত্য বলতে ব্রহ্ম অনিত্য নয় বুঝতে হবে। ব্রহ্ম শুদ্ধ, এই কথার অর্থ ব্রহ্মের মধ্যে কোন কিছুর মিশ্রণ নেই। ব্রহ্ম বুদ্ধ কথার অর্থ, ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, আর ব্রহ্ম মুক্তস্বভাব বলতে মুক্তিই ব্রহ্মের প্রকৃতি, এই কথা বুঝতে হবে।

ব্রহ্ম একমাত্র সত্য বলতে ব্রহ্মছাড়া অন্য কিছু নেই, একমাত্র একথাই বোঝায়না, ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ নেই, একথাও বোঝায়।

এখানে প্রশ্ন উঠবে—এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যদি সত্য হন, তবে জগৎ এল কি করে? এই সমস্যা সমাধানের জন্য শঙ্করাচার্য শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের একটি বাণীর সাহায্য গ্রহণ করেন। এই বাণীটি হচ্ছে—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্"। (প্রকৃতিকে মায়া এবং মহেশ্বর বা প্রকৃতির স্রষ্টাকে মায়াবী বল জানবে)। শঙ্করাচার্য জগৎকে মায়াশক্তি সৃষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। এখানে প্রশ্ন ওঠে—"মায়া" কথাটির অর্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শঙ্কর ভ্রমজ্ঞানের উপমা ব্যবহার করেছেন। আমরা অন্ধকার রাত্রিতে রজ্জুকে সর্প বলে দেখি। এরই নাম ভ্রমজ্ঞান। এইরকম ভ্রমের ক্ষেত্রে কোন না কোন অধিষ্ঠান বা সত্য বস্তু থাকে। এইক্ষেত্রে রজ্জুই অধিষ্ঠান এবং এই অধিষ্ঠানের ওপরে অন্য কিছুর আবির্ভাব (এইক্ষেত্রে সর্প) কল্পনা করা হয়েছে। এইরকম ভ্রম অধিষ্ঠান বিষয়ে অজ্ঞানতার জন্যই হয়। রজ্জুকে রজ্জু বলে জানলে তাকে আর সর্প বলে গ্রহণ করা যায় কি? রজ্জুকে রজ্জু বলে না জানলেই, অর্থাৎ রজ্জু বিষয়ে অজ্ঞানতা থাকলেই রজ্জুতে সর্পজ্ঞান সম্ভব। অজ্ঞান কেবলমাত্র অধিষ্ঠানকে আবৃত করে না, নতুন কিছু সৃষ্টিও করে, যেমন রজ্জুর অজ্ঞান রজ্জুকে ঢেকে দিয়ে সর্পের বিকাশ ঘটায়। জগতের ব্যাখ্যাও আমরা অনুরূপভাবে পেতে পারি। এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমাদের অজ্ঞানের জন্য আবৃত হন এবং তার স্থানে আমরা জগৎ দেখতে পাই। সুতরাং এই দিক থেকে বিচার করলে মায়া এবং অজ্ঞান সমার্থক। যাদুকর যখন একটি টাকাকে দশটি টাকা করে দেখান তখন আমরা তা সত্য বলেই মানি। কারণ, একটি টাকাই যে আসলে দশটি টাকা করে দেখান হচ্ছে তা আমরা বুঝি না। সুতরাং যাদুকরের দিক থেকে যাদুশক্তি এবং আমাদের দিক থেকে অজ্ঞানতা একটি টাকাকে দশটি টাকা দেখায়।

ব্রহ্মই একমাত্র সত্য হলে জগতের প্রকৃতি কি? এ প্রশ্ন সমাধানের জন্যই শঙ্কর মায়াবাদ প্রচার করেন।

অনুরূপভাবে জগতের ক্ষেত্রে ব্রহ্মের মায়াশক্তি জগৎ সৃষ্টি করে এবং অজ্ঞানতার জন্য আমরা তা দেখি। অবশ্য যাদুকর যেমন জানে যে যাদুশক্তি আসলে কোন শক্তিই নয়, একেবারে ফাঁকি; ব্রহ্মের দিক থেকেও মায়াশক্তি আসলে তাই। তবে কেউ যদি মনে করে যে, ব্রহ্ম ও তার শক্তি ভিন্ন এবং ফলে অদ্বৈতবাদ আর থাকছে না, সেইজন্য শঙ্কর বলছেন, অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তি যেমন অভিন্ন, ব্রহ্ম এবং তার মায়াশক্তিও তেমনি অভিন্ন। সুতরাং অদ্বৈততত্ত্বের ব্যাঘাত কোন দিক থেকেই হচ্ছে না।

মায়া ও অজ্ঞান অনেকাংশে অভিন্ন।

এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—ব্রহ্ম কি তবে সৃষ্টি-ক্ষমতার অধিকারী? তাই যদি হয়, তবে তিনি নির্গুণ হবেন কী করে? এর উত্তরে শঙ্কর দৃষ্টিভঙ্গীর কথা তুলবেন। তিনি বলেন, যাদুকরের যাদুর ফাঁকি যে বোঝে না সে যাদুশক্তিকে সত্য বলেই জানে, কিন্তু যে যাদুকরের ফাঁকি বোঝে, সে যাদুশক্তিকে কোন শক্তি বলেই মানে না। তেমনি আমরা যারা ব্রহ্মের স্বরূপ জানি না, তারা তাঁকে স্রষ্টা বলে মনে করি এবং আমাদের কাছে জগৎও সত্য বলে মনে হয়, কিন্তু যিনি ব্রহ্মের স্বরূপ জানেন, তিনি বোঝেন ব্রহ্ম স্রষ্টা নন, সৃষ্টি মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গীর নাম ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং দ্বিতীয়টির নাম পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গী। প্রথমটি অজ্ঞানতাজনিত দৃষ্টি, দ্বিতীয়টি জ্ঞানের দৃষ্টি। শঙ্করাচার্য আর একটি দৃষ্টির কথাও বলেছেন। এর নাম প্রাতিভাসিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টি একান্তভাবেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক অজ্ঞানতাজনিত। ব্যবহারিক দৃষ্টির সঙ্গে এই দৃষ্টির মিল এই যে, উভয়ই অজ্ঞানতাজনিত; তফাৎ এই যে, ব্যবহারিক দৃষ্টি সার্বিক অর্থাৎ সকলের সাধারণ অজ্ঞানতাজনিত, কিন্তু প্রাতিভাসিক দৃষ্টি ব্যক্তির অজ্ঞানতাজনিত। উদাহরণ দিচ্ছি। অন্ধকার রাত্রিতে কোন কোন লোক রজ্জুতে সর্প দেখে; কিন্তু সবাই ত একই সঙ্গে দেখে না। রজ্জুতে সর্প দেখা একান্তভাবেই বিশেষ ব্যক্তির অজ্ঞানতা-জনিত ব্যাপার। এরই নাম প্রাতিভাসিক দৃষ্টি। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে জগৎ দেখা যায় তা সবাই একই সঙ্গে দেখে। এই দেখা কোন বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ অজ্ঞানজন্য নয়, সর্বলোকের সাধারণ অজ্ঞানজন্য। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ব্রহ্ম আসলে নির্গুণ; তবে অজ্ঞানতার জন্য ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাঁকে সগুণ স্রষ্টা ঈশ্বর বলে মনে হয়।

শঙ্কর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য স্বীকার করেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা পরিষ্কার করা দরকার। শঙ্কর জগতকে মিথ্যা বলতে কি বোঝেন? বহুলোক নানা উদ্ভট কথা এই প্রসঙ্গে বলেন। শঙ্করের আসল বক্তব্য এই বিষয়ে নিম্নরূপ। জগৎ পারমার্থিক দৃষ্টিতে থাকে না; সুতরাং জগতের পারমার্থিক সত্যতা নেই। প্রাতিভাসিক দৃষ্টিতে প্রাপ্ত বস্তু যেমন রজ্জুতে সর্পের চেয়ে জগতের অস্তিত্ব অনেক দীর্ঘস্থায়ী। কারণ, রজ্জুতে দৃষ্ট সর্প আলো নিয়ে এলেই আর দেখা যায় না। কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ না জানা পর্যন্ত সকলের কাছেই জগৎ প্রতিভাত হয়। সেইজন্য জগৎ প্রাতিভাসিক সত্যের চেয়ে উচ্চস্তরের। এরই নাম ব্যবহারিক সত্য। সুতরাং জগৎ মিথ্যা, এই কথার অর্থ জগৎ পারমার্থিক সত্য নয়, আবার প্রাতিভাসিক সত্যও নয়।

গজৎ মিথ্যা বলতে কি বোঝায়?

অনেকে বলেন, শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলে জগৎ অসৎ এই কথা বোঝাতে চান। এঁদের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শাঙ্কর দর্শনে বন্ধ্যাপুত্রের মত যা কখনই প্রতিভাত হয় না তাই অসৎ। জগৎ প্রতিভাত হয়, সুতরাং জগৎ অসৎ হতেই পারে না।

শঙ্করের মতে অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূর করতে পারলেই পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করা যায় এবং তখন জগৎ-মিথ্যাত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী লাভেচ্ছু ব্যক্তির সর্বপ্রথম নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামূত্রার্থ ফলভোগ-বিরাগ, সমদমাদি সাধন সম্পদ এবং মুমুক্ষুত্ব অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য জানার চেষ্টা করতে হলে কিছু প্রস্তুতি দরকার। নিত্য ও অনিত্য বস্তু যে ভিন্ন এই বোধ, ইহলোক ও পরলোকে সমস্ত কর্মফল ভোগের প্রতি বিরাগ, বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সংযম এবং মুক্তিলাভের প্রবল ইচ্ছাই এই প্রস্তুতি। এরপর সত্যসন্ধী ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কাছে যাবেন। গুরু তাঁর কানে কানে বলবেন, 'তত্ত্বমসি' (তুমিই সেই ব্রহ্ম) এই বাক্য শ্রবণের পর সত্যসন্ধী এই বাক্যের মনন ও নিদিধ্যাসন করবেন এবং ক্রমশঃ তিনি উপলব্ধি করবেন 'সোঽহম্' (আমিই সেই ব্রহ্ম)। এই উপলব্ধি মুক্তির অরিসীম আনন্দের উপলব্ধি। এই জ্ঞানের অধিকারী মুক্ত আত্মা দেহযুক্ত হয়েও দেহের কামনা-বাসনায় বদ্ধ হন না, কারণ তিনি দেহের ফাঁকির খবর জেনে গেছেন। দেহযুক্ত আত্মার মুক্তিকে জীবন্মুক্তি এবং বিদেহ আত্মার মুক্তিকে বিদেহ মুক্তি বলে। শঙ্করের মতে ব্রহ্মকে জেনে যিনি মুক্ত হয়েছেন, তিনি ব্রহ্মই হয়ে গেছেন। সুতরাং ব্রহ্মের আনন্দের তিনি অধিকারী, সমস্ত দুঃখ থেকে তিনি মুক্ত এবং ব্রহ্মের মতই তিনি পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, শাঙ্কর মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপতঃ এক, উভয়ই চৈতন্য স্বভাব। মুক্ত হলেই জীব তার স্বরূপ উপলব্ধি করে এবং ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হয়।

মুক্তির প্রকৃতি ও মুক্তি লাভের উপায়।

রামানুজাচার্য উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের ভিন্ন ভাষ্য রচনা করেছেন। তিনি ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এই ব্রহ্ম নিখিল দোষমুক্ত এবং সমস্ত কল্যাণগুণের আকর বাসুদেব নামে আখ্যাত হয়েছেন। এই ব্রহ্মের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নেই বটে, কিন্তু স্বগত ভেদ আছে। ব্রহ্মচিৎ ও অচিৎ এই দুই অংশের অধিকারী হিসেবে স্বগতভেদ যুক্ত। উর্ণনাভ যেমন নিজের দেহ থেকেই জাল সৃষ্টি করে, তেননি ব্রহ্ম তাঁর অচিৎ অংশ থেকে জড়জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এই জগৎ মিথ্যা নয়। আত্মা অণুপরিমাণ এবং ব্রহ্মের চিৎ অংশের প্রকাশ। চৈতন্য আত্মার স্বরূপ নয়, তবে নিত্যস্থিত একটি গুণ। প্রত্যেক আত্মা তার কর্মানুসারে দেহের অধিকারী হয়। দেহযুক্ত হওয়াই আত্মার পক্ষে বন্ধন। সুতরাং দেহ থেকে বিযুক্ত হলেই আত্মার মুক্তি। অজ্ঞানজন্য কর্ম থেকেই বন্ধন। অজ্ঞানহেতু আত্মা দেহের কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন কর্মে ব্যাপৃত হয় এবং ফলে তাকে বিভিন্ন জন্ম পরিগ্রহ করতে হয়। নিষ্কামভাবে বেদনির্দিষ্ট যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করলে কর্মফল নষ্ট হয় এবং মানুষ সত্যজ্ঞান-লাভের উপযুক্ততা অর্জন করে। উপনিষদ পাঠে ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় এবং তখন

রামানুজ মতে ব্রহ্ম জগৎ ও জীবের প্রকৃতি।

তিনিই একমাত্র উপাস্য বলে উপলব্ধি হয়। ব্রহ্মের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে যদি তাঁর উপাসনা করা যায়, তবে তিনি তুষ্ট হয়ে কৃপা করেন। এই কৃপা লাভ করলেই জীব দুঃখ-দুর্গতি থেকে মুক্তি পায় এবং তার আর পুনর্জন্ম হয় না। মুক্ত আত্মা ব্রহ্মের মত শুদ্ধ চৈতন্য লাভ করেন বটে, কিন্তু তিনি কখনই ব্রহ্ম হয়ে যেতে পারেন না। সসীম জীব কি কখনও অসীম ব্রহ্ম হতে পারে?

রামানুজের মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত।

রামানুজাচার্যের এই মতবাদের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। একে এই নামে অভিহিত করার কারণ এই যে, রামানুজের মতে এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম একমাত্র সত্য হলেও এই ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ গুণ বিশিষ্ট। সুতরাং রামানুজদর্শনে ব্রহ্মের অদ্বৈততত্ত্ব অবিশিষ্ট নয়, বিশিষ্ট।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ন্যায় দর্শন

গৌতম মুনি ন্যায়দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। ন্যায় দর্শনকে 'সর্বশাস্ত্র প্রদীপ' বলা হয়।

গৌতম মুনি ন্যায়দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গৌতম এবং অক্ষপাদ নামেও পরিচিত। এই দর্শন মুখ্যতঃ প্রমাণ ও প্রমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেইজন্য ন্যায়দর্শনকে প্রমাণশাস্ত্রও বলা হয়। যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা বা তর্কের প্রণালী নির্দেশ করাই এর মুখ্য কাজ। এই দিক থেকে ন্যায়দর্শনকে 'সর্বশাস্ত্র প্রদীপ' বলে উল্লেখ করা হয়। প্রদীপ যেমন সমস্ত কিছুই আলোকিত করে, ন্যায়দর্শন তেমনই চিন্তার এমন এক শৈলী নির্দেশ করে দেয় যা অবলম্বন করে সমস্ত শাস্ত্র আলোচনাই সম্ভব এবং আলোচনার নির্ভুলতার জন্য যা একান্তভাবেই অপরিহার্য। এই দৃষ্টিতেই ন্যায়দর্শনকে ন্যায়বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র এবং আন্বীক্ষিকী বলা হয়।

ন্যায়দর্শন তর্কশাস্ত্র হলেও মোক্ষশাস্ত্রও বটে।

শুদ্ধ চিন্তার একটি নির্ভরযোগ্য প্রণালী নির্দেশ করা ন্যায়দর্শনের উদ্দেশ্য হলেও চরম উদ্দেশ্য নয়। অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতই নৈয়ায়িকেরা মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলে মনে করেন। এই পুরুষার্থ লাভের জন্যই পদার্থের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ আবশ্যক এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্যই শুদ্ধ জ্ঞানের প্রণালী জানা দরকার। সুতরাং ন্যায়দর্শন তর্কশাস্ত্র হলেও মোক্ষশাস্ত্রও বটে।

গৌতমের ন্যায়-সূত্র ভিত্তি করেই ন্যায়দর্শনের শুভারম্ভ। এই গ্রন্থটি চার অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায় আবার দুই আহ্নিকের সমাহার। বাৎস্যায়নের ন্যায়-ভাষ্য,

উদ্দ্যোৎকরের ন্যায়-বার্ত্তিক, বাচস্পতির ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য টীকা, উদয়নের ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য পরিশুদ্ধি এবং কুসুমাঞ্জলি, জয়ন্ত ভট্টের ন্যায়মঞ্জরী প্রভৃতি পরবর্তীকালের গ্রন্থ ন্যায়-সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছে এবং ন্যায়-সূত্রের বিরোধী মত খণ্ডন করেছে। প্রাচীন ন্যায় আসলে গৌতমের ন্যায়-সূত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ; এর বিরোধী মত খণ্ডন এবং বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তরে এর সমর্থনের ভিত্তিতে রচিত দর্শন। গঙ্গেশের যুগান্তকারী গ্রন্থ 'তত্ত্বচিন্তামণি' থেকেই নব্যন্যায়ের পত্তন হয়। মিথিলায় সর্বপ্রথম এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা। পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে এই সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব, প্রতিপত্তি ও প্রসার লক্ষ্য করা যায়। নবদ্বীপই নব্যন্যায়-চর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। অবশ্য কেউ কেউ বলেন,[১] নব্যন্যায়ের দুটি শাখা—মৈথিল ও গৌড়ীয় এবং উভয় শাখাই সমপ্রাচীন। গৌড়ে নব্য-ন্যায়চর্চা মিথিলার পরে একথা সত্য নয়। নব্যন্যায় ন্যায়দর্শনকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই তর্কশাস্ত্রে বা দার্শনিক-বিচারপ্রণালী-নির্ণায়ক শাস্ত্রে পরিণত করেছে। অল্প অথচ তাৎপর্যপূর্ণ কথায় বাহুল্য বর্জন করে যথাযথভাবে সংজ্ঞার্থ বা লক্ষণ[২] নির্ণয় কার্যে নব্যন্যায় যে পারদর্শিতা দেখিয়েছে পৃথিবীর দর্শনের ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। বাসুদেব, রঘুনাথ, মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর এই সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত দার্শনিক। প্রাচীন ন্যায়ে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন আলাদা আলাদা আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু নব্যন্যায়ের অনেক গ্রন্থেই ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন একত্র আলোচিত হয়েছে। অন্নম্ভট্টের তর্কসংগ্রহ এবং বিশ্বনাথের ভাষাপরিচ্ছেদ বা কারিকাবলী নব্যন্যায়ের দুটি সুপরিচিত জনপ্রিয় গ্রন্থ। এই দুটি গ্রন্থেই ন্যায় বৈশেষিক দর্শন আলাদা আলাদা আলোচনা করা হয়নি।

ন্যায়দর্শনের দুটি সম্প্রদায়—প্রাচীন ও নব্য। ন্যায়দর্শনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

আলোচনার সুবিধের জন্য সমস্ত ন্যায়দর্শন চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(১) জ্ঞান-তত্ত্ব (২) জগৎ-তত্ত্ব (৩) জীব ও মুক্তিতত্ত্ব এবং (৪) ঈশ্বর-তত্ত্ব।

সমস্ত ন্যায়দর্শনকে সাধারণতঃ ষোড়শ পদার্থের বিবৃতি—ব্যাখ্যান—বিশ্লেষণ ও বিস্তৃতি বলে মনে করা হয়। ষোড়শ পদার্থগুলি নিম্নরূপ—

(১) **প্রমাণ** বা জ্ঞান লাভের উপায়; (২) **প্রমেয়** বা জ্ঞানের বিষয়; (৩) **সংশয়**; (৪) **প্রয়োজন**; (৫) **দৃষ্টান্ত**; (৬) **সিদ্ধান্ত**; (৭) **অবয়ব** বা অনুমানের অঙ্গ; (৮) **তর্ক**; (৯) **নির্ণয়** বা সত্য নির্ণয়; (১০) **বাদ** বা সত্য নির্ণয়ের জন্য বিচার; (১১) **জল্প** বা বিতর্কে জয়লাভের জন্য বাক্যযুদ্ধমূলক বিচার; (১২) **বিতণ্ডা** বা কেবলমাত্র পরমত খণ্ডন প্রয়াসে বিচার; (১৩) **হেত্বাভাস** বা অনুমান সংক্রান্ত দোষ; (১৪) **ছল** বা বক্তার অভিপ্রেত অর্থে তার বক্তব্য গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করে বক্তব্যের দোষ প্রদর্শন; (১৫) **জাতি** বা কেবলমাত্র সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের ওপর নির্ভর করে

ন্যায়দর্শন ষোড়শ পদার্থের বিবৃতি-ব্যাখ্যান, বিশ্লেষণ ও বিস্তৃতি বলে মনে করা হয়।

১। ৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত 'বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা' দ্রষ্টব্য।

২। Definition

অনর্থক অভিযোগ এবং (১৬) **নিগ্রহস্থান** বা পরাজয় বরণ স্থান ; অর্থাৎ যেখানে এসে বাদী এবং প্রতিবাদীর কোন একজন পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

ন্যায়দর্শন বস্তুস্বাতন্ত্রবাদী দর্শন।[১] এই দর্শনে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়, এই কথাই বলা হয়েছে। আমরা যখন 'ঘট' 'পট' প্রভৃতি বস্তুগুলি জানি তখন এসব বস্তু আমাদের জ্ঞানের দ্বারা সৃষ্ট হয় না। আমরা এদের জানি বলেই এরা আছে, একথা ঠিক নয় ; এরা আছে বলেই আমরা এদের জানি। বস্তুগুলোর পারস্পরিক সম্বন্ধ ও আমাদের জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না। এককথায়, বস্তুর অস্তিত্ব ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ মন ও জ্ঞান নিরপেক্ষ। বিষয় ব্যতীত কোন জ্ঞানই হয় না।[২]

ন্যায়মতে বিষয় ব্যতীত জ্ঞান হয় না।

নৈয়ায়িকদের জ্ঞানতত্ত্ব

নৈয়ায়িকেরা চারটি বিভিন্ন প্রমাণ স্বীকার করেন। (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান এবং (৪) শব্দ—এই চতুঃপ্রমাণ। আমরা এই চতুঃপ্রমাণ-প্রসঙ্গ বিস্তারিত আলোচনা করবো। তার আগে প্রমা বা শুদ্ধজ্ঞান কাকে বলে, অপ্রমা বা অশুদ্ধজ্ঞানের প্রকৃতি কি, অপ্রমা থেকে প্রমাকে পৃথক করার উপায় কি—প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

ন্যায়মতে চারটি প্রমাণ স্বীকৃত—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

জ্ঞান—প্রকৃতি ও প্রকার

জ্ঞান বলতে বস্তু-প্রকাশ বোঝায়।[৩] প্রদীপ যেমন তার সম্মুখস্থ সমস্ত বস্তু ভাস্বর করে, জ্ঞান তেমনই বস্তু প্রকাশিত করে। জ্ঞান দু'প্রকার—প্রমা বা প্রমিতি এবং অপ্রমা। প্রমা বা শুদ্ধজ্ঞান চার প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। অপ্রমাও চার প্রকার—স্মৃতি, সংশয়, ভ্রম বা বিপর্যয় এবং তর্ক। বস্তুর অসন্দিগ্ধ এবং যথার্থ অনুভবকে বলে প্রমা। আমার বাড়ীর সম্মুখের বৃক্ষটির প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রমা, কারণ বৃক্ষটির যথাযথ অনুভব আমি পেয়েছি এবং এই বস্তুর অনুভব সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নেই। কিন্তু নৈয়ায়িকদের মতে স্মৃতি প্রমা নয়, কারণ স্মৃতি অনুভব নয়। সংশয় অসন্দিগ্ধ নয় বলে প্রমাও নয়। ভ্রম অসন্দিগ্ধ ও অনুভব হলেও যথার্থ অনুভব নয়। তাই ভ্রম, প্রমা হতে পারে না। যখন আমরা অন্ধকার রাত্রিতে ভুল করে রজ্জুতে সর্প দেখি, তখন যা দেখি তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আমাদের থাকে না। কিন্তু তথাপি এ-টা ভ্রান্তদর্শন, কারণ এ ত বস্তুর যথার্থ দর্শন বা অনুভব নয়। তর্ক প্রমা নয়, কারণ তর্কে কোন বস্তুর অনুভব বা জ্ঞানই হয় না। এখানে প্রশ্ন উঠবে—তর্ক কাকে

বস্তু-প্রকাশই জ্ঞান। জ্ঞান দ্বিবিধ—প্রমা বা প্রমিতি এবং অপ্রমা।

১। Realistic Philosophy

২। ন চাবিষয়া কাচিদুপলব্ধিঃ, ন্যায়সূত্রভাষ্য (৪।১।৩২)

৩। জ্ঞান বা বুদ্ধি উপলব্ধি বা অনুভব। বুদ্ধি অর্থপ্রকাশক বা বিষয় প্রকাশক।

বলে ? তর্কের প্রকৃতি বোঝাবার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এক ভদ্রলোক বললেন—দূরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, সুতরাং সেখানে আগুন লেগেছে। অন্য আর এক ভদ্রলোক প্রতিবাদ করে বললেন—কোথায়! আগুন নেই ত। তখন প্রথম ভদ্রলোক নিজেকে সমর্থন করার জন্য বলেন—যদি সেখানে আগুন না লেগে থাকে তবে সেখানে এত ধূম থাকবে কেন ? দ্বিতীয় ভদ্রলোকের কথা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য এবং প্রকারান্তরে নিজের বক্তব্য সমর্থনের জন্য 'যদি' দিয়ে শুরু করে প্রথম ভদ্রলোকের এই যে যুক্তি, এরই নাম তর্ক। এটা কোন প্রমা নয়, কারণ এমন যুক্তি করে আগুন জানা যায় না, বরং আগে ধূম থেকে অগ্নির যে অনুমান করা হয়েছিল তা সমর্থন করা হয় মাত্র।

তদ্‌বতি তৎপ্রকারতা সত্যজ্ঞানের প্রকৃতি।

এবার প্রশ্ন উঠবে—সত্যজ্ঞানের প্রকৃতি কি ? অর্থাৎ কোন একটি জ্ঞান সত্য এবং কোন একটি জ্ঞান মিথ্যা হয় কেন ? অনুভব যখন বস্তুর অনুরূপ হয় তখন অনুভব বা জ্ঞান সত্য, কিন্তু অনুভব যখন বস্তুর অনুরূপ হয় না তখন তা ভ্রান্ত। 'পাতাটি সবুজ' এই জ্ঞান সত্য, কারণ পাতাটি বস্তুতঃই সবুজ। যা যেমন তাকে তেমন জানলেই জ্ঞান সত্য হয়। নৈয়ায়িকেরা তাই বলেন, সত্যজ্ঞান তদ্‌বতি তৎপ্রকারক। কিন্তু রজ্জুতে যখন সর্প দেখি, তখন এই জ্ঞান ভ্রান্ত। এখানে সর্পের অনুপস্থিতিতেই সর্প-জ্ঞান হচ্ছে বলে এই জ্ঞান মিথ্যা। নৈয়ায়িকেরা বলেন, মিথ্যাজ্ঞান 'তদ্‌ভাববতি তৎপ্রকারক'।

প্রবৃত্তি সামর্থ্য বা প্রবৃত্তিসম্বাদ সত্যজ্ঞান নির্ণয়ের উপায়।

সত্যজ্ঞান এবং মিথ্যাজ্ঞানের প্রকৃতি বোঝা গেল। এবার প্রশ্ন উঠবে—সত্যজ্ঞানকে সত্যজ্ঞান বলে জানি কি করে ? অর্থাৎ জ্ঞানের সত্যতার পরীক্ষা কি ? নৈয়ায়িকেরা বলেন, প্রবৃত্তিসামর্থ্য বা প্রবৃত্তিসম্বাদ সত্যজ্ঞান নির্ণয়ের উপায়। বৈশেষিক, জৈন বা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরাও এই মত সমর্থন করেন। কোন জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে যখন অভীষ্টলাভ হয় তখন সেই জ্ঞান সত্য আর তা না হলে জ্ঞান মিথ্যা। সোজা কথায়, কর্মে সাফল্য বা অসাফল্যের ওপর নির্ভর করে জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নিরূপিত হয়। কোন একটি বস্তুকে টক বলে জেনে খেতে যদি সত্যিই টক লাগে, তবে সেই জ্ঞান সত্য বলে জানবো, কিন্তু কোন একটি জিনিসকে টক বলে জেনে খেয়ে যদি দেখা যায় যে তা তেতো তবে সেই জ্ঞান মিথ্যা বলে বুঝতে হবে।

ন্যায় মতে যে যে কারণে জ্ঞান হয় সে সে কারণেই জ্ঞান সত্য বা মিথ্যা হয় না। অর্থাৎ জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ ভিন্ন অন্য কারণের ওপর নির্ভরশীল। জ্ঞান জানা এবং জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব জানাও এক জিনিস নয়। এমন হতে পারে যে, কোন একটি জ্ঞান হয়েছে, একথা আমরা জানি, কিন্তু জ্ঞান সত্য বা মিথ্যা হয়েছে কি-না, তা আমরা জানিনা। একেই নৈয়ায়িকদের উৎপত্তি এবং প্রতিপত্তি উভয় দিক থেকেই পরতঃ প্রামাণ্য এবং পরতঃ অপ্রামাণ্যবাদ বলা হয়।

জ্ঞান কি করে জানা যায়, এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে নৈয়ায়িকেরা বলেন, কোন একটি জ্ঞান (ব্যবসায়) পরের আর একটি জ্ঞান (অনুব্যবসায়) দিয়ে জানা

যায়। আমরা পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানে যাকে 'ইনট্রোসপেকশন (Introspection) বলি অনুব্যবসায় তার সমজাতীয়। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক জন লেয়ার্ডও অনুরূপ মত প্রচার করেছেন।[১]

নৈয়ায়িকদের জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা শেষ হল। আমরা এবার নৈয়ায়িক-স্বীকৃত বিভিন্ন প্রমাণ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো।

প্রত্যক্ষ

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে অনুমান নিয়েই বিস্তৃত আলোচনা লক্ষ্য করি। প্রত্যক্ষের এই বিশদ আলোচনা পাশ্চাত্ত্য দর্শনে নেই। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে প্রত্যক্ষেরও বিচার, বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমা ও প্রমাণ উভয়ই। নৈয়ায়িকদের মতে সমস্ত প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষই প্রধান। কারণ, প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণই হয় না; অনুমান, উপমান বা শব্দ প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করেই সম্ভব। যে জিনিস পূর্বে কখনই প্রত্যক্ষ করিনি তা অনুমান করা যায় না। উপমানজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি জিনিসের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ না করলে জ্ঞান হয় না আর শাব্দজ্ঞানে প্রথমতঃ শব্দ শুনতে (প্রত্যক্ষ) হয় এবং পরে জ্ঞান হয়। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানী মিলও বলেছেন, প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করেই অন্য সমস্ত জ্ঞান হয়।[২]

প্রত্যক্ষই প্রধান প্রমাণ। অন্যান্য প্রমাণ প্রত্যক্ষনির্ভর।

সমস্ত প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষই যে প্রধান তার দ্বিতীয় কারণ হিসেবে নৈয়ায়িকেরা বলেন, প্রত্যক্ষই সমস্ত জ্ঞানের চরম প্রমাণ। আমরা অনুমান, উপমান বা শাব্দজ্ঞান সম্বন্ধে সহজেই সংশয় করতে পারি, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণতঃ কোন সংশয় করা হয় না। আমরা একই জিনিস প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শাব্দজ্ঞানের সাহায্যে জানতে পারি। কিন্তু অনুমানলব্ধ জ্ঞান এবং শাব্দজ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, প্রত্যক্ষজ্ঞান অন্যকোন প্রমাণের অপেক্ষিত নয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞান ভুল হয় না। তবে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষও ভ্রান্ত হতে পারে। সেইজন্যই নৈয়ায়িকেরা বলেন, যখনই কোন প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্বন্ধে মনে কোন সংশয় জাগবে তখন অবশ্যই আমরা অন্যান্য জ্ঞানের মতই এই জ্ঞানের সত্যতা যাচাই করে দেখবো।

প্রত্যক্ষজ্ঞান সাধারণতঃ ভুল না হলেও কখনও কখনও ভুল হয়।

য়ুরোপীয় দর্শনে অভিজ্ঞতাবাদী[৩] এবং নব্যবস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী[৪] দার্শনিকেরা প্রত্যক্ষের

১। Prof. John Laird লিখিত প্রবন্ধ 'Contemporary British Philosophers' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

২। "The truths known by intuition are the original premises from which all others are inferred—System of Logic. p. 3.

৩। Empiricists.

৪। Modern realists.

বলে? তর্কের প্রকৃতি বোঝাবার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এক ভদ্রলোক বললেন—দূরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, সুতরাং সেখানে আগুন লেগেছে। অন্য আর এক ভদ্রলোক প্রতিবাদ করে বললেন—কোথায়! আগুন নেই ত। তখন প্রথম ভদ্রলোক নিজেকে সমর্থন করার জন্য বলেন—যদি সেখানে আগুন না লেগে থাকে তবে সেখানে এত ধূম থাকবে কেন? দ্বিতীয় ভদ্রলোকের কথা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য এবং প্রকারান্তরে নিজের বক্তব্য সমর্থনের জন্য 'যদি' দিয়ে শুরু করে প্রথম ভদ্রলোকের এই যে যুক্তি, এরই নাম তর্ক। এটা কোন প্রমা নয়, কারণ এমন যুক্তি করে আগুন জানা যায় না, বরং আগে ধূম থেকে অগ্নির যে অনুমান করা হয়েছিল তা সমর্থন করা হয় মাত্র।

এবার প্রশ্ন উঠবে—সত্যজ্ঞানের প্রকৃতি কি? অর্থাৎ কোন একটি জ্ঞান সত্য এবং কোন একটি জ্ঞান মিথ্যা হয় কেন? অনুভব যখন বস্তুর অনুরূপ হয় তখন অনুভব বা জ্ঞান সত্য, কিন্তু অনুভব যখন বস্তুর অনুরূপ হয় না তখন তা ভ্রান্ত। 'পাতাটি সবুজ' এই জ্ঞান সত্য, কারণ পাতাটি বস্তুতঃই সবুজ। যা যেমন তাকে তেমন জানলেই জ্ঞান সত্য হয়। নৈয়ায়িকেরা তাই বলেন, সত্যজ্ঞান তদ্‌বতি তৎপ্রকারক। কিন্তু রজ্জুতে যখন সর্প দেখি, তখন এই জ্ঞান ভ্রান্ত। এখানে সর্পের অনুপস্থিতিতেই সর্প-জ্ঞান হচ্ছে বলে এই জ্ঞান মিথ্যা। নৈয়ায়িকেরা বলেন, মিথ্যাজ্ঞান 'তদ্‌ভাববতি তৎপ্রকারক'।

তদ্‌বতি তৎপ্রকারতা সত্যজ্ঞানের প্রকৃতি।

সত্যজ্ঞান এবং মিথ্যাজ্ঞানের প্রকৃতি বোঝা গেল। এবার প্রশ্ন উঠবে—সত্যজ্ঞানকে সত্যজ্ঞান বলে জানি কি করে? অর্থাৎ জ্ঞানের সত্যতার পরীক্ষা কি? নৈয়ায়িকেরা বলেন, প্রবৃত্তিসামর্থ্য বা প্রবৃত্তিসম্বাদ সত্যজ্ঞান নির্ণয়ের উপায়। বৈশেষিক, জৈন বা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরাও এই মত সমর্থন করেন। কোন জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে যখন অভীষ্টলাভ হয় তখন সেই জ্ঞান সত্য আর তা না হলে জ্ঞান মিথ্যা। সোজা কথায়, কর্মে সাফল্য বা অসাফল্যের ওপর নির্ভর করে জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নিরূপিত হয়। কোন একটি বস্তুকে টক বলে জেনে খেতে যদি সত্যিই টক লাগে, তবে সেই জ্ঞান সত্য বলে জানবো, কিন্তু কোন একটি জিনিসকে টক বলে জেনে খেয়ে যদি দেখা যায় যে তা তেতো তবে সেই জ্ঞান মিথ্যা বলে বুঝতে হবে।

প্রবৃত্তি সামর্থ্য বা প্রবৃত্তিসম্বাদ সত্যজ্ঞান নির্ণয়ের উপায়।

ন্যায় মতে যে যে কারণে জ্ঞান হয় সে সে কারণেই জ্ঞান সত্য বা মিথ্যা হয় না। অর্থাৎ জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ ভিন্ন অন্য কারণের ওপর নির্ভরশীল। জ্ঞান জানা এবং জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব জানাও এক জিনিস নয়। এমন হতে পারে যে, কোন একটি জ্ঞান হয়েছে, একথা আমরা জানি, কিন্তু জ্ঞান সত্য বা মিথ্যা হয়েছে কি-না, তা আমরা জানিনা। একেই নৈয়ায়িকদের উৎপত্তি এবং প্রতিপত্তি উভয় দিক থেকেই পরতঃ প্রামাণ্য এবং পরতঃ অপ্রামাণ্যবাদ বলা হয়।

জ্ঞান কি করে জানা যায়, এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে নৈয়ায়িকেরা বলেন, কোন একটি জ্ঞান (ব্যবসায়) পরের আর একটি জ্ঞান (অনুব্যবসায়) দিয়ে জানা

যায়। আমরা পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানে যাকে 'ইনট্রোসপেকশন (Introspection) বলি অনুব্যবসায় তার সমজাতীয়। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক জন লেয়ার্ডও অনুরূপ মত প্রচার করেছেন।[১]

নৈয়ায়িকদের জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা শেষ হল। আমরা এবার নৈয়ায়িক-স্বীকৃত বিভিন্ন প্রমাণ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো।

প্রত্যক্ষ

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে অনুমান নিয়েই বিস্তৃত আলোচনা লক্ষ্য করি। প্রত্যক্ষের এই বিশদ আলোচনা পাশ্চাত্ত্য দর্শনে নেই। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে প্রত্যক্ষেরও বিচার, বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমা ও প্রমাণ উভয়ই। নৈয়ায়িকদের মতে সমস্ত প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষই প্রধান। কারণ, প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণই হয় না; অনুমান, উপমান বা শব্দ প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করেই সম্ভব। যে জিনিস পূর্বে কখনই প্রত্যক্ষ করিনি তা অনুমান করা যায় না। উপমানজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি জিনিসের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ না করলে জ্ঞান হয় না আর শাব্দজ্ঞানে প্রথমতঃ শব্দ শুনতে (প্রত্যক্ষ) হয় এবং পরে জ্ঞান হয়। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানী মিলও বলেছেন, প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করেই অন্য সমস্ত জ্ঞান হয়।[২]

প্রত্যক্ষই প্রধান প্রমাণ। অন্যান্য প্রমাণ প্রত্যক্ষনির্ভর।

সমস্ত প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষই যে প্রধান তার দ্বিতীয় কারণ হিসেবে নৈয়ায়িকেরা বলেন, প্রত্যক্ষই সমস্ত জ্ঞানের চরম প্রমাণ। আমরা অনুমান, উপমান বা শাব্দজ্ঞান সম্বন্ধে সহজেই সংশয় করতে পারি, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণতঃ কোন সংশয় করা হয় না। আমরা একই জিনিস প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শাব্দজ্ঞানের সাহায্যে জানতে পারি। কিন্তু অনুমানলব্ধ জ্ঞান এবং শাব্দজ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, প্রত্যক্ষজ্ঞান অন্যকোন প্রমাণের অপেক্ষিত নয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞান ভুল হয় না। তবে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষও ভ্রান্ত হতে পারে। সেইজন্যই নৈয়ায়িকেরা বলেন, যখনই কোন প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্বন্ধে মনে কোন সংশয় জাগবে তখন অবশ্যই আমরা অন্যান্য জ্ঞানের মতই এই জ্ঞানের সত্যতা যাচাই করে দেখবো।

প্রত্যক্ষজ্ঞান সাধারণতঃ ভুল না হলেও কখনও কখনও ভুল হয়।

য়ুরোপীয় দর্শনে অভিজ্ঞতাবাদী[৩] এবং নব্যবস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী[৪] দার্শনিকেরা প্রত্যক্ষের

১। Prof. John Laird লিখিত প্রবন্ধ 'Contemporary British Philosophers' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

২। "The truths known by intuition are the original premises from which all others are inferred—System of Logic. p. 3.

৩। Empiricists.

৪। Modern realists.

প্রামাণ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহই পোষণ করেন না। এঁদের মতে প্রত্যক্ষ সন্দেহাতীত ও স্বতঃসিদ্ধ। মিল বলেন,[১] আমরা প্রত্যক্ষ করে যা জানি তা সমস্ত রকম প্রশ্নের অতীত। রাসেল বার বার বলেছেন, প্রত্যক্ষ স্বতঃসিদ্ধ, এর জন্য অন্য কোন প্রমাণের দরকার নেই।[২] কিন্তু নৈয়ায়িকেরা কখনই প্রত্যক্ষকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ নির্ভুল এবং অন্যান্য প্রমাণের চেয়ে এই প্রমাণ বেশী নির্ভরশীল।

প্রত্যক্ষ স্বতঃসিদ্ধ নয়, তবে অন্যান্য প্রমাণের চেয়ে এই প্রমাণ বেশী নির্ভরশীল।

কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজন্য যথার্থ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ।[৩] অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থ বা বিষয়ের সংযোগ হলে যে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকেই প্রত্যক্ষ বলা যায়। আমার সম্মুখস্থ পুস্তকের প্রত্যক্ষ আমার চক্ষুর সঙ্গে পুস্তকের সন্নিকর্ষ বা সংযোগের ফলেই সম্ভব এবং এইক্ষেত্রে আমি পুস্তকের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও নিঃসন্দিগ্ধ।

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হলেই প্রত্যক্ষ হয়।

প্রত্যক্ষের এই লক্ষণই (definition) সাধারণতঃ স্বীকৃত হয়। কিন্তু কোন কোন নৈয়ায়িক বৈদান্তিকেরা এবং অন্যান্য কেউ কেউ বলেন, ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ ভিন্নও প্রত্যক্ষ সম্ভব, সুতরাং প্রত্যক্ষের এই লক্ষণ গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা বলেন, ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় নেই, অথচ ঈশ্বর সব কিছুই সব সময়েই প্রত্যক্ষ করেন। আসলে অন্য কোন জ্ঞানের সাহায্য না নিয়ে সাক্ষাৎভাবে আমরা যা জানি, তাই প্রত্যক্ষ। আমরা যখন সম্মুখস্থ পুস্তক প্রত্যক্ষ করি তখন সাক্ষাৎভাবেই তা জানি। অন্য কোন জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে এই জ্ঞান হয় না। সুতরাং 'জ্ঞানাকরণক জ্ঞানই প্রত্যক্ষ' (জ্ঞানাকরণকমজ্ঞানম্ প্রত্যক্ষম্—বিশ্বনাথ)। প্রত্যক্ষ মানে 'সাক্ষাৎ প্রতীতি', অবশ্য একথা সবাই স্বীকার করেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষজন্যই সম্ভব।[৪] পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও হবহাউস এবং ডঃ স্টেবিং সাক্ষাৎ প্রতীতি অর্থেই প্রত্যক্ষ কথাটি ব্যবহার করেন।

সাক্ষাৎপ্রতীতিই প্রত্যক্ষ।

১। 'Whatever is known to us by consiousness (intuition), is known beyond possiblity of question'—System of Logic, p 4 (J. S. Mill).

২। Problems of Philosphy, Chapter XI: Our Knowledge of the External World. p. 72.

৩। ন্যায়সূত্র ১।১।৪ (ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নম্ জ্ঞানম্ অব্যপদেশ্যম্ অব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকম্ প্রত্যক্ষম্। অব্যপদেশ্যম বলতে শব্দ নহে, অব্যভিচারী বলতে বিপরীত নিশ্চয়রূপ ভ্রম নহে, ব্যবসায়াত্মক বলতে নিশ্চয়াত্মক বুঝতে হবে)।

৪। তর্কভাষা, ৫ পৃষ্ঠা; সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী ২৩২—৩৬ পৃঃ; তত্ত্বচিন্তামণি ৫৩৯-৪৩, ৫৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রত্যক্ষের প্রকারভেদ

বিভিন্নভাবেই প্রত্যক্ষের শ্রেণীকরণ সম্ভব। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষের দুটি প্রকার স্বীকৃত হয় : লৌকিক ও অলৌকিক। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক কিভাবে হয় তার ভিত্তিতে এই শ্রেণীকরণ হয়েছে। যখন বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক সংযোগ হয় তখন পাই লৌকিক প্রত্যক্ষ, আর বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যখন স্বাভাবিক সংযোগ হয় না অথচ প্রত্যক্ষ হয়, তখনই তাকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলা হয়ে থাকে। লৌকিক প্রত্যক্ষ আবার দু-প্রকার—বাহ্য এবং মানস। বাহ্যপ্রত্যক্ষ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্য-বস্তুর সংযোগের ফলে উৎপন্ন হয়। মানসপ্রত্যক্ষ মনের সঙ্গে মানসিক অবস্থার সংযোগের ফলেই সম্ভব হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, নৈয়ায়িকদের মতে মন একটি ইন্দ্রিয়। লৌকিক প্রত্যক্ষ সব মিলে ছয় প্রকার—চাক্ষুষ (চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ), শৌত্র (শ্রুতি বা কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ), স্পার্শন (স্পর্শদ্বারা প্রত্যক্ষ), রাসন (রসনা দ্বারা প্রত্যক্ষ), ঘ্রাণজ (ঘ্রাণ বা নাসিকা দ্বারা প্রত্যক্ষ) এবং মানস প্রত্যক্ষ। অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার—সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ এবং যোগজ।

প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ, লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিক প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার।

নৈয়ায়িকদের মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয়টি। এদের মধ্যে পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় এবং একটি অন্তরিন্দ্রিয়। চক্ষু, শ্রোত্র (কর্ণ), ঘ্রাণ (নাসিকা), ত্বক এবং রসনা (জিহ্বা) বহিরিন্দ্রিয়। এদের প্রত্যক্ষের বিষয় যথাক্রমে রূপ, শব্দ, ঘ্রাণ, স্পর্শ এবং রস। যে ভূতের গুণ যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সেই ইন্দ্রিয় সেই ভূতসৃষ্ট। এইজন্যেই বোধহয় অনেকক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় এবং তার বিষয়ের একই নাম। মন অন্তরিন্দ্রিয় এবং ইহা ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান প্রত্যক্ষ করে। বহিরিন্দ্রিয়ের মত অন্তরিন্দ্রিয় ভূতসৃষ্ট নয়। অন্তরিন্দ্রিয় কোন বিশেষ দ্রব্য বা গুণের জ্ঞানের মধ্যে সীমিত নয়, সমস্ত রকমের জ্ঞানেই অন্তরিন্দ্রিয় কার্যকর। মন অন্তরিন্দ্রিয় এই ন্যায়-মত বৈশেষিক, সাংখ্য এবং মীমাংসকেরাও গ্রহণ করেন। তবে কোন কোন বেদান্তী এই মত সমালোচনা করে পরিত্যাগ করেছেন।[১]

জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয়টি—পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ও একটি অন্তরিন্দ্রিয়।

১। ন্যায়মতে ভাব এবং অভাব পদার্থের লৌকিক প্রত্যক্ষ হতে পারে। ভাব পদার্থের প্রত্যক্ষ বলতে, (ক) দ্রব্য, (খ) গুণ, বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যে সমবেত সামান্য (গ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ বা কর্মে সমবেত সামান্য (ঘ) ইন্দ্রিয়বেদ্য নয় বা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না এমন আকাশের গুণ শব্দ (ঙ) শব্দে সমবেত শব্দত্বের প্রত্যক্ষ বোঝায়। অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষ বলতে (চ) ঘট, পটের অভাবের প্রত্যক্ষ বোঝায়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিশেষ সন্নিকর্ষ এক বিশেষ প্রকারেই সম্ভব।

নৈয়ায়িকেরা ছয় প্রকার সন্নিকর্ষের কথা বলেছেন। দ্রব্যের প্রত্যক্ষকালে সংযোগ, গুণ, কর্ম বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যে সমবেত সামান্য প্রত্যক্ষকালে সংযুক্ত সমবায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ বা কর্মে সমবেত সামান্য (যেমন রক্ত গুণে সমবেত রক্তত্ব সামান্য), প্রত্যক্ষকালে সংযুক্ত সমবেত সমবায়, আকাশের গুণ শব্দ প্রত্যক্ষকালে সমবায়, শব্দে সমবেত সামান্য শব্দত্ব প্রত্যক্ষকালে সমবেত সমবায় এবং অভাব প্রত্যক্ষকালে সংযুক্ত বিশেষণতা. সংক্ষেপে বিশেষণতা বা বিশেষণ বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষ হয়।

(বিস্তারিত আলোচনা অধ্যাপক গোপীনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত তর্কসংগ্রহ দীপিকা গ্রন্থের ১৭৯—১৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অলৌকিক প্রত্যক্ষ

নৈয়ায়িকেরা তিন প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। **প্রথম প্রকারের নাম সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ।**[১]

কোন ব্যক্তিতে কোন সামান্য ধর্মের প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে জাতির অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তির প্রত্যক্ষকে সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলা হয়। যখন আমরা কোন কিছুকে 'ঘট' বলে প্রত্যক্ষ করি তখন একে ঘটজাতির অন্তর্গত বলে মনে করি। একটি ঘটকে ঘটজাতির অন্তর্গত বলে জানা মানেই ঐ বিশেষ ঘটটি ছাড়াও অন্যান্য সমস্ত ঘটকে জানা। অর্থাৎ 'ইহা একটি ঘট' এই জ্ঞান অন্যান্য (সামান্য ভাবে) সমস্ত ঘট কি প্রকার সেই জ্ঞানও সূচনা করে। সুতরাং একটি জিনিসকে ঘট বলে প্রত্যক্ষ করার সময় আমরা অন্যান্য সমস্ত ঘটই প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু একটি বিশেষ ঘট যেভাবে চক্ষুর সম্মুখে থাকে তেমনই ভাবে সকল ঘটই ত থাকে না। তা হলে অন্যান্য ঘটের প্রত্যক্ষ কি ভাবে সম্ভব? অন্যান্য ঘটের যদি প্রত্যক্ষ হতে হয়, তবে অবশ্যই তারা কোন না কোন ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বা সন্নিকৃষ্ট হবে। নৈয়ায়িকেরা বলেন, যখন আমরা একটি বিশেষ ঘট প্রত্যক্ষ করি তখন 'ঘটত্ব' সামান্য ধর্মটিও প্রত্যক্ষ করি। এই 'ঘটত্ব' সামান্য ধর্মের প্রত্যক্ষই সমস্ত ঘট-প্রত্যক্ষের ভিত্তি। সামান্যজ্ঞানই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়-সংযোগের মাধ্যম এবং এরই ফলে আমরা একটি বিশেষ ঘট প্রত্যক্ষ করার কালে সকল ঘটই প্রত্যক্ষ করি। সোজা কথায়, সামান্য ধর্মের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করার সময় সেই ব্যক্তি যে জাতির অন্তর্গত সেই জাতির অন্তর্গত সকল ব্যক্তির প্রত্যক্ষের নামই সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ। এখানে প্রশ্ন উঠবে—সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ যদি সম্ভব হয়, তবে যে আমরা সবাই সর্বজ্ঞ হয়ে যাবো। যদি জাতির অন্তর্গত কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করলেই জাতির অন্তর্গত সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ করা হয়, তবে জ্ঞেয় জাতির অন্তর্গত কোন কিছু প্রত্যক্ষ করলেই ত সমস্ত জ্ঞেয় প্রত্যক্ষ করা হবে। নৈয়ায়িকেরা এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন—সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষকালে আমরা কোন জাতির অন্তর্গত একটি ব্যক্তির সামান্য ও বিশেষ উভয় ধর্মই জানি, কিন্তু অন্যান্য সকল ব্যক্তির মাত্র **সামান্য ধর্ম জানি, কিন্তু বিশেষ ধর্ম জানি না।**[২] সুতরাং সর্বজ্ঞ যেমন সমস্ত বিষয়ের বিশদ জ্ঞানের অধিকারী হন, আমরা কেউই সেরকম সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ জ্ঞান লাভ করি না। সুতরাং আমাদের সর্বজ্ঞত্বের সম্ভাবনা উদ্ভট কল্পনা মাত্র। সামান্যলক্ষণ সত্যই কোন প্রত্যক্ষ কি-না, এ বিষয়ে

কোন ব্যক্তিতে কোন জাতির সামান্য ধর্মের প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে সমগ্র জাতির প্রত্যক্ষকে সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে।

সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা মানুষের সর্বজ্ঞতা সূচনা করে না।

সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষের পক্ষে নৈয়ায়িকদের যুক্তি।

১। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, প্রাচীন ন্যায়ে লৌকিক এবং অলৌকিক বলে প্রত্যক্ষের প্রকারভেদ নেই। লৌকিক এবং অলৌকিক প্রত্যক্ষের পার্থক্য গঙ্গেশ যে নব্যন্যায়ের স্রষ্টা তাতেই লক্ষ্য করা যায়।

২। অর্থাৎ, সামান্যের জ্ঞান হয়।

অনেকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। নৈয়ায়িকেরা স্বমত সমর্থনের জন্য কতকগুলো যুক্তি দিয়েছেন। যুক্তিগুলো নিম্নরূপ :—

(১) ব্যাপ্তি বা সামান্য বচনের জ্ঞান না থাকলে অনুমান হয় না। ধূম দেখে আগুন অনুমান করতে হলে যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানেই আগুন এই জ্ঞান থাকা দরকার। এরই নাম ব্যাপ্তি বা সামান্য বচনের জ্ঞান। কিন্তু 'যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেইখানেই আগুন' এই ব্যাপ্তিজ্ঞান সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষভিন্ন সম্ভব নয়। যখন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ধূম ও অগ্নি একত্র দেখি, তখন ধূমত্ব ও অগ্নিত্ব এই সামান্যেরও প্রত্যক্ষ হয় এবং ফলে সকল ধূমের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক জানতে পারি। অন্য কোন প্রকারে সকল ধূমের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক জানার উপায় নেই।

(২) সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ ভিন্ন 'এটা ঘোড়া নয়,' 'ঘট পট নয়' প্রভৃতি নঞর্থক বচনের কোন সদ্ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। 'এটা ঘোড়া নয়' বলতে হলে সকল ঘোড়ার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই জ্ঞান সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ ছাড়া কি ভাবে সম্ভব?

(৩) আমরা সকলেই সুখার্থী। সুখলাভের প্রচেষ্টা আমাদের সকলের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। কোন একটি বিশেষ সুখের প্রকৃতি জানার সময় সামান্যধর্ম 'সুখত্ব' মারফৎ সকল সুখের জ্ঞান থাকলেই আমাদের জীবনের সুখলাভের প্রচেষ্টার অর্থ বোঝা যায়। সুতরাং এইক্ষেত্রেও সামান্য-লক্ষণ প্রত্যক্ষ সম্ভব, এই কথাই প্রমাণ করে।*

দ্বিতীয় প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষের নাম **জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ**। আমরা দূরে চন্দনকাঠ দেখে বলি—'সুগন্ধী চন্দন কাঠ দেখছি।' এখানে প্রশ্ন ওঠে—সুগন্ধ কি দেখা যায়? গন্ধ ত ঘ্রাণের বিষয়, দেখার বিষয় নয়। এতদূর থেকে নাসিকায় গন্ধ পাওয়া সম্ভব নয়। সাধারণভাবে চক্ষুর সঙ্গে গন্ধের ত কোন সংযোগ হতে পারে না। তবে সুগন্ধী চন্দন কাঠ দেখি কি করে? আসলে চক্ষুর সঙ্গে সুগন্ধের অলৌকিক সংযোগ হয়।

জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষের প্রকৃতি।

এইক্ষেত্রে চন্দনের সৌরভ সম্পর্কে আমাদের স্মরণ বা স্মৃতি চক্ষুর সঙ্গে সুগন্ধের সন্নিকর্ষ সম্ভব করে তোলে। বস্তুতঃ ঘ্রাণ না পেলেও আমাদের সৌরভস্মরণ বর্তমানে সৌরভের প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। এরই নাম জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ অলৌকিক, কারণ সাধারণতঃ যে ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জিনিস প্রত্যক্ষ হয় না এইক্ষেত্রে সেই ইন্দ্রিয় দিয়েই সে জিনিস প্রত্যক্ষ হয়। আমাদের প্রদত্ত দৃষ্টান্তে সাধারতঃ দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় এমন 'চন্দনের সুগন্ধ' দর্শনেরই বিষয় হয়েছে। অতীতে যখনই চন্দন দেখেছি তখনই তার ঘ্রাণও পেয়েছি। এখন চন্দন দেখেই তাই মনে হয়, চন্দন সুগন্ধীই হবে।

* বেদান্তীরা সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ মানে না। তাঁদের যুক্তি আলোচনা করতে হলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। নানা কারণে তা সম্ভব নয়। উৎসাহী পাঠক ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত The Nyaya Theory of Knowledge ২৩০-৩১ পৃষ্ঠায় দেখতে পারেন। যাঁরা মূল গ্রন্থ পাঠ করতে চান তাঁরা অদ্বৈতসিদ্ধি ১৩৭-৩৯ পৃষ্ঠা দেখবেন।

সামান্যলক্ষণ ও জ্ঞান-লক্ষণ প্রত্যক্ষক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ কিভাবে হয়?

সামান্যলক্ষণ এবং জ্ঞানলক্ষণ উভয় প্রকার প্রত্যক্ষেই বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ জ্ঞানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে সামান্য জ্ঞান এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্মরণের ভিত্তিতে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। এদের পার্থক্য এই যে, সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সামান্যের জ্ঞান সামান্যের আশ্রয় বিভিন্ন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সম্ভব করে। কিন্তু জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের স্মরণের ভিত্তিতে সেই বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হয়।

কম্পলিকেশন ও জ্ঞান-লক্ষণ প্রত্যক্ষের সম্পর্ক।

পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে ভুণ্ট, ওয়ার্ড এবং স্টাউট এই জাতীয় প্রত্যক্ষকে **কম্পলিকেশন** (complication) বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কম্পলিকেশন বলতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার এমন সংমিশ্রণ বোঝায় যাতে তাদের একই ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা বলে মনে হয়। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা বলেন, 'বরফ ঠাণ্ডা দেখায়,' 'বর্ম শক্ত, মসৃণ এবং ঠাণ্ডা দেখায়'। বরফ স্পর্শ করলেই এর শীতলতা জানা যায়, বরফের শীতলতা কখনই দেখা যায় না। কিন্তু 'বরফ ঠাণ্ডা দেখায়' এই প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে চক্ষু এবং ত্বক এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার এমন সংমিশ্রণ হয়েছে যে, দুটি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা এক ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা হয়েই দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও একাধিক ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ এক চক্ষুর অভিজ্ঞতায় রূপ নিয়েছে।

যোগাভ্যাসের ফলে উৎপন্ন প্রত্যক্ষকে যোগজ প্রত্যক্ষ বলে।

তৃতীয় প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষের নাম **যোগজ প্রত্যক্ষ**। এই জাতীয় প্রত্যক্ষ যোগাভ্যাসের ফলে উৎপন্ন হয়। ভূত-ভবিষ্যৎ, প্রচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎ প্রতীতিকে যোগজ প্রত্যক্ষ বলে। যে সমস্ত ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন অর্থাৎ যাঁরা যুক্ত, তাঁদের পক্ষে এই প্রত্যক্ষ নিত্য ও স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে এখনও পূর্ণতার সাধনায় মগ্ন অর্থাৎ যাঁরা যুঞ্জান, তাঁরা একমাত্র মনঃসংযোগ করেই এই প্রত্যক্ষের সাময়িক অধিকারী হন। মন বিক্ষিপ্ত হলেই এই প্রত্যক্ষ আর তাঁদের হয় না। শ্রুতি প্রমাণের ওপর নির্ভর করে সাধারণতঃ ভারতীয় দর্শনে যোগজ প্রত্যক্ষের সত্যতা স্বীকৃত হয়। এই প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক, বেদান্তীরা নৈয়ায়িকদের সামান্যলক্ষণ এবং জ্ঞানলক্ষণ উভয় প্রকার প্রত্যক্ষের সত্যতাই অস্বীকার করেন, কিন্তু শ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ যোগজ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন না।[১] এই জ্ঞান জৈনদের কেবলজ্ঞান, বৌদ্ধদের বোধি, সাংখ্যযোগের কৈবল্য এবং বেদান্তীদের অপরোক্ষানুভূতি সদৃশ।

১। অদ্বৈতসিদ্ধি ১৩৭—৩৯ পৃষ্ঠা এবং বেদান্ত পরিভাষা প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রত্যক্ষের স্তরভেদ

প্রত্যক্ষের বিষয়ের প্রকৃতি অনুসারে নৈয়ায়িকেরা প্রত্যক্ষকে নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন।[১] এদের সঙ্গে একটি তৃতীয় ভাগও জুড়ে দেওয়া যায়, এর নাম প্রত্যভিজ্ঞা। অলৌকিক প্রত্যক্ষ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বলে সর্বদাই সবিকল্পক।

প্রত্যক্ষের বিষয়ের প্রকৃতি অনুসারে প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ—নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক।

নৈয়ায়িকদের মতে সমস্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানই বচনাকারে প্রকাশ করা যায়। 'অশ্ব'-এর প্রত্যক্ষ বলতে অশ্বত্ব বিশিষ্ট বস্তুর প্রত্যক্ষ বোঝায়। সুতরাং সাধারণতঃ আমরা যাকে প্রত্যক্ষ বলি তা বিশিষ্টের প্রত্যক্ষ বা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। ন্যায়মতে সমস্ত অনিত্য বস্তুই পরমাণুর সৃষ্টি। সুতরাং নৈয়ায়িকেরা সবিকল্পক প্রত্যক্ষের পূর্বে অবিশিষ্টের প্রত্যক্ষ বা নিৰ্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন।[২] অর্থাৎ নৈয়ায়িকেরা বলেন, যদি আমরা কখনও 'লোহিত পুষ্প' প্রত্যক্ষ করে থাকি, তবে বুঝতে হবে পূর্বে আমরা শুধু পুষ্প এবং শুধু লোহিত নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছি। অবশ্য কোন কোন নৈয়ায়িক বলেন, শুধু বিশেষণের জ্ঞান পূর্বে হলেই বিশিষ্ট জ্ঞান হতে পারে।[৩] কিন্তু অন্যান্য অংশের প্রত্যক্ষের প্রয়োজনীয়তা ন্যায়মঞ্জরীকার স্বীকার করেছেন।[৪] সুতরাং ন্যায় মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের কথা সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিশ্লেষণ কালেই অনুমান করে জানা যায়, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান নেই। অনুব্যবসায় (Introspection) সবিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই সম্ভব, নিৰ্বিকল্পক প্রত্যক্ষের কোন অনুব্যবসায় হয় না। বৌদ্ধদের মতে নির্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় স্বলক্ষণ। এবিষয়ে বৌদ্ধমতের সঙ্গে ন্যায়মতের পার্থক্য লক্ষণীয়।

নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের নৈয়ায়িক ব্যাখ্যা।

অন্নংভট্ট বলেছেন, নিম্নলিখিত প্রকারে অনুমানের দ্বারা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের অস্তিত্ব জানা যায়।

বিশিষ্ট বস্তুর প্রত্যক্ষ বিশেষণের প্রত্যক্ষ জন্য হয়
গরুর প্রত্যক্ষ বিশিষ্ট বস্তুর প্রত্যক্ষ
∴ গরুর প্রত্যক্ষ বিশেষণ প্রত্যক্ষ (গোত্বের প্রত্যক্ষ) জন্য হয়।

বাৎস্যায়ন নামযুক্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষকে সবিকল্পক এবং নামঅযুক্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষকে নিৰ্বিকল্পক বলেছেন। জয়ন্ত ভট্টের মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য আলাদা আলাদা

১। ন্যায়দর্শনের কোন কোন ভাষ্যকার বলেন, নির্বিকল্পক এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষের পার্থক্য সূত্র, ভাষ্য এবং বার্তিক স্বীকৃত নয়; পরবর্তীকালের নৈয়ায়িকেরা এই পার্থক্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র তাঁর 'তাৎপর্যটীকার ১২৫ পৃষ্ঠায় নির্বিকল্পক এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষের পার্থক্য ন্যায় সূত্রেই (১। ।৪) আবিষ্কার করেছেন। তিনি এই সূত্রে ব্যবহৃত 'অব্যপদেশ্যম্' 'ব্যবসায়াত্মকম্' এই শব্দ দুটিকে যথাক্রমে নির্বিকল্পক এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষ অর্থে গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী নৈয়ায়িকেরা বাচস্পতির এই মত সমর্থন করেন।

২। সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী ২২৫ পৃঃ

৩। বিশিষ্টজ্ঞানম্ বিশেষণজন্যজ্ঞানম্—তর্কসংগ্রহ দীপিকা, ৩০ পৃঃ

৪। ন্যায়মঞ্জরী ৯৩ ও ৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

প্রত্যক্ষ করাকে নির্বিকল্পক এবং এদের সম্বন্ধ ও নামযুক্ত জ্ঞান সবিকল্পক বলে উল্লেখ করেছেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতে সংসর্গানবগাহী জ্ঞান নির্বিকল্পক এবং সংসর্গাবগাহী জ্ঞান সবিকল্পক। অন্নংভট্ট নিষ্প্রকারক জ্ঞানকে নির্বিকল্পক এবং সপ্রকারক জ্ঞানকে সবিকল্পক বলেছেন। সপ্রকারক জ্ঞান বলতে নামজাত্যাদিবিশেষণবিশেষ্য সম্বন্ধাবগাহী জ্ঞান বুঝতে হবে। যে জ্ঞানের বিষয়ে বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধ নেই তা-ই নিষ্প্রকারক জ্ঞান।

প্রত্যভিজ্ঞার প্রকৃতি।

কোন কিছুকে পূর্বজ্ঞাত বলে জানাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। এই প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে আমরা ভালভাবেই বুঝি যে, এখন যা প্রত্যক্ষ করেছি তা অতীতে যা প্রত্যক্ষ করেছিলাম তার সঙ্গে অভিন্ন। কোন একজন লোককে দেখে যখন বলি 'এই সেই লোক যে কাল সভায় গান করেছিল' তখন আমাদের এই অভিজ্ঞতাকেই প্রত্যভিজ্ঞা বলতে হয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই নির্বিকল্পক, সবিকল্পক এবং প্রত্যভিজ্ঞার পার্থক্য স্বীকার করে না, আবার কোন কোন সম্প্রদায় পার্থক্য স্বীকার করলেও নৈয়ায়িকদের মত এমনভাবে এদের ব্যাখ্যা করে না। বৈশেষিক, সাংখ্য এবং মীমাংসা সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা এই বিষয়ে মূলতঃ নৈয়ায়িকদের মতই গ্রহণ করেন, কিন্তু বৌদ্ধ এবং অদ্বৈত বেদান্তীরা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন।[১]

প্রত্যভিজ্ঞা সবিকল্পক প্রত্যক্ষের পর হয়।

সবিকল্পক প্রত্যক্ষ যেমন নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের পরে হয়, প্রত্যভিজ্ঞা তেমনই আবার সবিকল্পক প্রত্যক্ষেরও পরে হয়। যে জিনিসের সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়েছে, কেবলমাত্র সেই জিনিসেরই প্রত্যভিজ্ঞা হতে পারে। সুতরাং প্রত্যক্ষের তিনটি স্তর বা ধাপের কথা ভাবা যেতে পারে। প্রথম স্তর—নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয় স্তর—সবিকল্পক প্রত্যক্ষ এবং তৃতীয় ও সর্বশেষ স্তর—প্রত্যভিজ্ঞা।

অনুমান

প্রত্যক্ষলব্ধ বিষয় থেকে ব্যাপ্তি জ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন বিষয়ের জ্ঞানকে অনুমান বলে।

অনুমান শব্দের আক্ষরিক অর্থ কোন জ্ঞান-নির্ভর অন্যজ্ঞান (অনু=পশ্চাৎ, মান=জ্ঞান)। একটি উদাহরণ দিয়ে অর্থটি বোঝান যেতে পারে। আমরা দূরে ধোঁয়া দেখে বলি, ঐখানে আগুন লেগেছে। আগুন দেখিনি, অনুমান করেছি। এই জ্ঞান 'ঐখানে ধোঁয়া আছে' এবং 'যেখানে যেখানে ধোঁয়া আছে, সেখানে সেখানে আগুন আছে' এই দুটি জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। এমনি করে সমস্ত অনুমানের ক্ষেত্রেই যা প্রত্যক্ষ করেছি তার থেকে যা প্রত্যক্ষ করিনি তার জ্ঞান লাভ করি এবং এই জ্ঞান, যা প্রত্যক্ষ করেছি এবং যা প্রত্যক্ষ করিনি এদের মধ্যে একটি সার্বিক সম্পর্ক[২] বা ব্যাপ্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়। ওপরের উদাহরণে প্রত্যক্ষ

১। ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'The Nyaya theory of knowledge' গ্রন্থের নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২। Universal relation.

করেছি ধোঁয়া, প্রত্যক্ষ করিনি আগুন; ধোঁয়ার জ্ঞান থেকে আগুনের জ্ঞান পাচ্ছি। এই জ্ঞানের ভিত্তি ধোঁয়া (যা প্রত্যক্ষ করেছি) এবং আগুনের (যা প্রত্যক্ষ করিনি) মধ্যে একটি সার্বিক সম্পর্কের জ্ঞান অর্থাৎ 'যেখানে যেখানে ধোঁয়া আছে সেখানে সেখানে আগুন আছে' এই জ্ঞান। যা প্রত্যক্ষ করেছি এবং যা প্রত্যক্ষ করিনি এদের মধ্যে সার্বিক সম্পর্ককে দার্শনিক পরিভাষায় ব্যাপ্তি বলা হয়। সুতরাং অনুমান বলতে প্রতক্ষ্যজাত বিষয় থেকে, প্রত্যক্ষজাত বিষয় এবং অনুমিত বিষয়ের সার্বিক সম্পর্ক বা ব্যাপ্তির জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুমিত বিষয়ের জ্ঞান-প্রাপ্তি বোঝায়[১]।

অনুমানের অঙ্গ: আমরা অনুমানের লক্ষণ যে ভাবে নির্ণয় করেছি তা ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। একটি অনুমানের তিনটি পদ এবং অন্ততঃপক্ষে তিনটি অবয়ব থাকবে। উদাহরণ দিচ্ছি—

ঐ পাহাড়ে ধূম
যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে আগুন
∴ ঐ পাহাড়ে আগুন।

এইক্ষেত্রে অবয়ব তিনটি। প্রথমতঃ পাহাড়ে ধূমের প্রত্যক্ষ; দ্বিতীয়তঃ—ধূম এবং অগ্নির মধ্যে সার্বিক সম্পর্ক স্মরণ এবং তৃতীয়তঃ—পাহাড়ে অগ্নির অস্তিত্বের অনুমান।

সাধারণতঃ একটি অনুমানের তিনটি পদ এবং তিনটি অবয়ব থাকে।

এইক্ষেত্রে পাহাড় হচ্ছে পক্ষ। অনুমিত বিষয়ের আধারকে পক্ষ বলে। আগুন সাধ্য। যা প্রমাণ করতে চাই বা যা অনুমিত হয় তারই নাম সাধ্য এবং যার মাধ্যমে অনুমিত হয় তার নাম হেতু বা সাধন। একে লিঙ্গও বলে। এইক্ষেত্রে ধূম সাধন বা হেতু। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানে পক্ষকে Minor Term, সাধ্যকে Major Term এবং সাধনকে Middle Term বলে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, একটি অনুমানে পক্ষ, সাধ্য এবং হেতু এই তিনটি পদ থাকে।

আমরা ওপরে অনুমানের উদাহরণটি যেভাবে লিখেছি, সাধারণতঃ ভারতীয় দর্শনে অনুমান এভাবে লিখিত হয় না। অনুমানকারী বস্তুতঃ যেভাবে অনুমান করে আমাদের উদাহরণটিতে তাই প্রকাশ করা হয়েছে। অনুমান লিখবার সময় তা নিম্নরূপ হবে—

ঐ পাহাড়ে আগুন
কারণ ঐ পাহাড়ে ধূম
যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে আগুন

ভারতীয় দর্শনে অনুমান ভাষায় প্রকাশ করার রীতি

এইক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটিই প্রথমে লিখিত হয়েছে, তারপর পক্ষে হেতুর প্রত্যক্ষ এবং সর্বশেষে হেতু ও সাধ্যের সার্বিক সম্পর্ক। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানে সাধারণতঃ এর সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতি অনুসৃত হয়। সেখানে প্রথমতঃ হেতু ও সাধ্যের সার্বিক সম্পর্ক, দ্বিতীয়তঃ পক্ষের সঙ্গে হেতুর সম্পর্ক এবং সর্বশেষে সিদ্ধান্ত লেখা হয়।

১। মিতেন লিঙ্গেন লিঙ্গিনোঽর্থস্য পশ্চানমানমনুমানম্, ন্যায়ভাষ্য ১।১।৩

ভারতীয় দার্শনিকেরা মনে করেন, স্বার্থানুমান বা নিজের জ্ঞানের জন্য অনুমানের ক্ষেত্রে অনুমান বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পরার্থানুমান বা অন্যের কাছে কোন কিছু প্রমাণ করার জন্য অনুমান করলে, অনুমান বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা দরকার। কোন কোন প্রাচীন নৈয়ায়িকের মতে অনুমান বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করতে হলে দশটি অবয়বের সাহায্য নিতে হয়। যথা:—(১) জিজ্ঞাসা বা সত্য নিরূপণের আকাঙ্ক্ষা, (২) সংশয় বা বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দেহ, (৩) শক্যপ্রাপ্তি বা সত্যজ্ঞান লাভের ব্যাপারে প্রমাণের উপযুক্ততা, (৪) প্রয়োজন বা অনুমান করার উদ্দেশ্য, (৫) সংশয়ব্যুদাস বা অনুমানের সত্যতা সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় নিরসন, (৬) প্রতিজ্ঞা বা প্রমাণের বিষয়, (৭) হেতু বা কারণ, (৮) উদাহরণ, (৯) উপনয় বা উদাহরণের প্রয়োগ এবং সর্বশেষে (১০) নিগমন বা সিদ্ধান্ত।

স্বার্থানুমান ক্ষেত্রে অনুমান বিস্তারিত-ভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু পরার্থানুমান ক্ষেত্রে অনুমান বিস্তারিত-ভাবে প্রকাশ করা আবশ্যক।

কিন্তু বাৎস্যায়ন থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালের নৈয়ায়িকেরা দশাবয়ব অনুমান বর্জন করেছেন। এঁদের মতে দশাবয়বের প্রথম পাঁচটি অবয়ব অনুমানের সাহায্যে কোন কিছু প্রমাণ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। এই পাঁচটি অবয়ব অনুমান কালের কতকগুলো মানসিক সর্ত প্রকাশ করতে পারে; কিন্তু সিদ্ধান্ত টানার ব্যাপারে এগুলো কোন যুক্তিই নয়। জিজ্ঞাসা সমস্ত জ্ঞান-ব্যাপারে প্রয়োজন, কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা কারও কাছেই কোন কিছু প্রমাণ করতে পারে না। সুতরাং জিজ্ঞাসা অনুমানের কোন অঙ্গ নয়। অনুরূপভাবে সংশয় সত্যলাভের উদ্যম আরও বাড়িয়ে দিতে পারে এবং এই দিক থেকে সংশয় নিশ্চয়ই জ্ঞান-ব্যাপারে প্রয়োজনীয়; কিন্তু সংশয় করলেই ত কোন কিছু প্রমাণিত হয় না। শক্যপ্রাপ্তিও কোন সিদ্ধান্ত প্রমাণের ব্যাপারেই যুক্তি হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। সংশয়ব্যুদাস বা সংশয় নিরাস কোন অনুমানের সিদ্ধান্তের বিপরীত ধারণা দূর করে সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত ত প্রমাণ করে না। **সুতরাং অধিকাংশ নৈয়ায়িকদের মতে ওপরে লিখিত দশাবয়বের প্রথম পাঁচটি অবয়ব অনুমানের কোন অঙ্গ নয়।** তবে তাঁরা বলেন, বাকী পাঁচটি অবয়ব অনুমানের পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং অনুমান পঞ্চাবয়বী। এই অবয়বগুলো হচ্ছে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন বা সিদ্ধান্ত। একটি পঞ্চাবয়বী ন্যায় বা অনুমানের উদাহরণ দিচ্ছি—

পঞ্চাবয়বী ন্যায়।

(১) পর্বত বহ্নিমান (প্রতিজ্ঞা)

(২) কারণ, পর্বত ধূমবান (হেতু)

(৩) যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি, যেমন দেখি চুল্লিতে (উদাহরণ)

(৪) পর্বতও ধূমবান (উপনয়)

(৫) সুতরাং পর্বত বহ্নিমান (নিগমন বা সিদ্ধান্ত)

যা অনুমান করা হবে তার বিবৃতিই **প্রতিজ্ঞা**। প্রতিজ্ঞায় পক্ষ ও সাধ্যের সম্পর্ক ঘোষণা করা হয়। ওপরের উদাহরণে পর্বত পক্ষ এবং বহ্নি সাধ্য। হেতু পক্ষ ও সাধ্যের সম্পর্ক প্রকাশ করে। উদাহরণ পরিচিত দৃষ্টান্ত সহযোগে সাধ্য ও হেতুর সার্বিক সম্পর্ক প্রকাশ করে। উপনয় পক্ষে হেতুর প্রয়োগ দেখায় এবং সর্বশেষে নিগমন প্রতিজ্ঞার সত্যতা নির্দেশ করে বা প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করে। নিগমন পূর্ববর্তী চারটি অবয়ব থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে। প্রতিজ্ঞায় যা প্রমাণের বিষয় বলে উপস্থাপিত হয়, নিগমনে তা-ই প্রমাণিত বস্তুরূপে দেখা দেয়।

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন—এই পঞ্চাবয়বের তাৎপর্য নির্ণয়।

সাংখ্য[1] এবং বৈশেষিক[2] দার্শনিকেরা নৈয়ায়িকদের পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে বিশ্বাস করেন। কিন্তু মীমাংসক এবং বেদান্তীরা তিনটির বেশী অবয়ব স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁরা বলেন, সাধ্য ও হেতুর সার্বিক সম্পর্ক বা ব্যাপ্তি এবং পক্ষে হেতুর উপস্থিতি বা পক্ষধর্মতাই অনুমানের নির্ভর। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতার ওপর নির্ভর করেই অনুসৃত হয়। সুতরাং অনুমানের তিনটি অবয়ব। এই ত্রিঅবয়ব প্রতিজ্ঞা, হেতু এবং উদাহরণ বা উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন হতে পারে। এই দিক থেকে অনুমান নিম্নলিখিত দুই প্রকারই হতে পারে—

অনুমানের অবয়ব-সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ।

(১) পর্বত বহ্নিমান (প্রতিজ্ঞা)
কারণ, পর্বত ধূমবান (হেতু)
যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি, যেমন দেখি চুল্লিতে (উদাহরণ)

(২) যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি, যেমন দেখি চুল্লিতে (উদাহরণ)
পর্বত ধূমবান (উপনয়)
সুতরাং পর্বত বহ্নিমান (নিগমন)

বৌদ্ধেরা আরও অগ্রসর হয়ে বলেন, অনুমানের মাত্র দুটি অবয়ব—উদাহরণ এবং উপনয়, নিগমন বলে কোন অবয়বের প্রয়োজন নেই।

ওপরে লিখিত অনুমানের প্রথম প্রকারের উদাহরণে অনুমান সিদ্ধান্ত দিয়ে শুরু হয়েছে এবং পরে এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার জন্যই দুটি উপাত্ত বা সাধন বাক্যের ব্যবহার। কিন্তু অনুমানের দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণে উপাত্ত বা সাধন বাক্যই প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরে সিদ্ধান্ত এদের থেকেই অনুসৃত হয়েছে। অনুমানের এই দুই প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারই আমরা সাধারণতঃ যেভাবে অনুমান করি তা প্রকাশ করেছে। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানী চ্যাপমান ও হেন্‌লি

১। সাংখ্য সূত্র ৫।২৭ দ্রষ্টব্য

২। প্রশস্তপাদকৃত পদার্থ ধর্ম সংগ্রহে অনুমানের পঞ্চাবয়ব প্রতিজ্ঞা, অপদেশ, নিদর্শন, অনুসংধান এবং প্রত্যাম্নায় নামে পরিচিত।

(Chapman and Henle) বলেছেন[১], সাধারণ কথাবার্তায় আমরা অধিকাংশ সময়েই সিদ্ধান্তটি প্রথম বলি এবং পরে বলি উপাত্ত; ফলে সিদ্ধান্তে জোর পড়ে এবং আমাদের অনুমান প্রক্রিয়ার যথার্থ রূপটি প্রকাশ পায়। যদি একথা সত্য হয়, তবে বলতে হবে, নৈয়ায়িক অনুমানই (প্রমাণের বিষয় সিদ্ধান্ত যেখানে প্রতিজ্ঞারূপে প্রথমেই বলা হয়) অনুমানের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যেতে পারে যে, নৈয়ায়িকেরা প্রমাণের বিষয় সিদ্ধান্তকে প্রতিজ্ঞা বলে খুব সঙ্গত কাজই করেছেন। সিদ্ধান্ত উপাত্ত থেকে অনুসৃত হয়, সুতরাং প্রথমেই 'সিদ্ধান্ত' নামে কিছু থাকতে পারে না। **যখন প্রতিজ্ঞা উপাত্ত বা সাধন বাক্য সমর্থিত হয়, তখনই তা সিদ্ধান্ত হতে পারে।** নৈয়ায়িকেরা সেইজন্যই প্রথমে প্রতিজ্ঞা এবং সর্বশেষে সিদ্ধান্ত স্বীকার করেছেন। সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য পক্ষ ও হেতুর সম্পর্ক (হেতু) এবং সাধ্য ও হেতুর সম্পর্ক (উদাহরণ) স্বীকার যে একান্ত প্রয়োজন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আবার পর্বতের ধূম অন্যান্য সাধারণ ক্ষেত্রে যে ধূমের সঙ্গে বহ্নি সংযুক্ত সেই ধূমই একথা যদি না জানা যায়, তবে 'পর্বতে ধূম' দেখে 'পর্বতে বহ্নি' ত অনুমান করা যাবে না। যদি পর্বতের ধূম মরীচিকার মত ভ্রান্ত হয়, তবে এই ধূম দেখে পর্বতে বহ্নি আছে মনে করলেও সেখানে ত সত্যি সত্যি বহ্নি থাকবে না। সুতরাং পর্বতও ধূমবান (উপনয়) একথা জানতে হবে; তবেই পর্বতে বহ্নির অনুমান সার্থক হবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, নৈয়ায়িক-স্বীকৃত অনুমানের পঞ্চাবয়ব সিদ্ধান্ত সম্যকভাবে সমর্থনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এই দিক থেকে নৈয়ায়িকদের কৃতিত্ব না মানলে অন্যায় হবে।

পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের প্রয়োজনীয়তা।

পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানের ত্র্যবয়বী ন্যায় এবং নৈয়ায়িকদের পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা।

পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানে ত্র্যবয়বী ন্যায় বা Syllogism বলে একরূপ অনুমান আছে। এই অনুমানে দুটি উপাত্তের (Premise) ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সিদ্ধান্ত কখনই উপাত্ত থেকে অধিকতর ব্যাপক হতে পারে না। ত্র্যবয়বী অনুমানের ক্ষেত্রে উপাত্তগুলো বস্তুগত সত্য কিনা তা একেবারেই আলোচ্য নয়। উপাত্ত সত্য বলে ধরে নিয়ে উপাত্ত থেকে সিদ্ধান্ত অনুসৃত হয় কি-না তা লক্ষ্য করাই এখানে একমাত্র কাজ। সিদ্ধান্ত যদি উপাত্ত থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়, তবেই ত্র্যবয়বী অনুমান যুক্তিযুক্ত বলে গৃহীত হয়। উপাত্ত বা সিদ্ধান্ত বস্তুগতভাবে মিথ্যা হলে ক্ষতি নেই। উদাহরণ দিচ্ছি।

ত্র্যবয়বী অনুমানের প্রকৃতি।

সমস্ত মনুষ্যই চতুষ্পদ
রাম মনুষ্য
∴ রাম চতুষ্পদ

১। Chapman and Henle : The Fundamentals of Logic. P. 98.

এইক্ষেত্রে 'রাম চতুষ্পদ' এই সিদ্ধান্তটি 'সমস্ত মনুষ্যই চতুষ্পদ' এবং 'রাম মনুষ্য' এই দুটি উপাত্ত থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত উপাত্ত থেকে অধিকতর ব্যাপক হয়নি। এই ত্র্যবয়বী অনুমানটি যুক্তিযুক্ত। এইক্ষেত্রে লক্ষণীয়, প্রথম উপাত্ত 'সমস্ত মনুষ্যই চতুষ্পদ' এবং সিদ্ধান্ত 'রাম চতুষ্পদ' উভয়ই বস্তুগতভাবে অসত্য। এইক্ষেত্রে তিনটি অবয়ব, দুটি উপাত্ত এবং একটি সিদ্ধান্ত।

ত্র্যবয়বী অনুমান আকারগতভাবে সত্য, কিন্তু পঞ্চাবয়বী ন্যায় বস্তুগতভাবে সত্যও বটে।

নৈয়ায়িকদের পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে সিদ্ধান্ত শুধু যুক্তিযুক্ত হলেই চলে না। বস্তুগতভাবে সত্যও হতে হয়। পঞ্চাবয়বী ন্যায় ত্র্যবয়বী ন্যায়ের মত কেবলমাত্র আকারগতভাবে সত্য (Formally true) নয়, বস্তুগতভাবেও সত্য। পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে উদাহরণ বলে যে অবয়বটি আছে তাই এই প্রকার অনুমানের বস্তুগত সত্যতা সম্ভব করে দেয়।

ত্র্যবয়বী অনুমান এক-প্রকার অবরোহানুমান, অবরোহানুমান কেবল মাত্র আকারগতভাবে সত্য।

পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানে অবরোহ ও আরোহ বলে দু-প্রকার অনুমান স্বীকৃত হয়। অবরোহানুমানে সিদ্ধান্ত উপাত্ত থেকে কখনই অধিকতর ব্যাপক হতে পারে না, কিন্তু আরোহানুমানে সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ উপাত্ত থেকে অধিকতর ব্যাপকই হয়। বিশেষ করে আরোহানুমানের উপাত্ত অভিজ্ঞতা অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণ করেই পাওয়া যায়। আরোহানুমান বস্তুগত সত্যতা (Material truth) ও আকারগত সত্যতা বা বৈধতা (Validity) উভয়ই নির্দেশ করে। কিন্তু অবরোহানুমানে অভিজ্ঞতার স্থান নেই। সেইজন্যই অবরোহানুমান কেবলমাত্র আকারগত সত্য, বস্তুগত সত্য নয়। ত্র্যবয়বী অনুমান এক প্রকারের অবরোহানুমান।

পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে অবরোহ ও আরোহের যুগ্ম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এখানে যেমন অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে উদাহরণ সংগ্রহ করা হয়, তেমনই ব্যাপ্তি বা সাধন ও সাধ্যের অব্যভিচারী সম্পর্কের ভিত্তিতে নিগমন বা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণের ক্ষেত্রে আরোহানুমান এবং ব্যাপ্তি-নির্ভর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অবরোহানুমানের ব্যবহার হয়। আসলে অবরোহ ও আরোহ-অনুমানের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দর্শনে অনেকেই এদের বিরোধ খুব তীব্রভাবে প্রকাশ করেছেন এবং ফলে দু-দলের তর্ক-বিজ্ঞানীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। একদল অবরোহানুমানের সমর্থক, অন্যদল আরোহানুমানের। কিন্তু দার্শনিক হোয়াইটহেড বলেছেন, "আরোহানুমান এবং অবরোহানুমানের সমর্থকদের দ্বন্দ্ব বহুকালের। আমার মতে, কোন একটি বিশেষ কীটের দুই প্রান্তের বিবাদ যেমন অর্থহীন তেমনই এই দ্বন্দ্বও অর্থহীন ("There is a tradition of opposition between the adherents of Induction and of Deduction. In my view, it would be just as sensible for the two ends of a worm to quarrel")। একটু তলিয়ে দেখলে একথা মানতেই হবে যে, অবরোহানুমান আরোহানুমান ছাড়া হয় না। তর্কবিজ্ঞানীরা বলেন, অবরোহানুমানে অন্ততঃ

একটি সার্বিক বচন (universal proposition) দরকার। এই সার্বিক বচনটি যদি সংশ্লেষক (Synthetic) হয়, তবে তা আরোহানুমান ছাড়া পাওয়ার কোন উপায় নেই। সংশ্লেষক বচনের বিধেয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নতুন কথা বলে। উদাহরণ দিচ্ছি। 'সমস্ত মানুষ মরণশীল' এই সার্বিক বচনের বিধেয় "মরণশীল" উদ্দেশ্য 'মানুষ' সম্বন্ধে নতুন কথা বলে, কারণ 'মানুষ' কথাটি বিশ্লেষণ করলে 'চিন্তাশীল প্রাণী' এই অর্থ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু 'মরণশীলতা' পাওয়া যাবে না। সুতরাং এই সার্বিক বচনটি সংশ্লেষক। অনুরূপ বচন আরোহানুমান ছাড়া পাওয়া যায় না। কাজেই এই জাতীয় বচনকে উপাত্ত করে যদি অবরোহানুমান করতে হয়, তবে অবশ্যই এই জাতীয় বচন আরোহানুমান করেই পেতে হবে। সুতরাং আরোহানুমান ছাড়া অবরোহানুমান হতে পারে না। আবার আরোহানুমান অবরোহানুমান ছাড়া হয় না। আমরা জানি, আরোহানুমান করতে হলে কতকগুলো বিশেষ দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করতে হয় এবং পরে এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামান্যীকরণ (generalisation করা প্রয়োজন হয়। রাম, শ্যাম, যদুকে মরতে দেখে সামান্যীকরণ করি এবং বলি 'সমস্ত মানুষ মরণশীল'। একথা সত্য কি-না, সেই বিষয়ে মনে তখন সংশয় জাগে। তর্কবিজ্ঞানীরা বলেন, এই রকম ক্ষেত্রে অবরোহানুমান করে এই কথার সত্যতা প্রমাণ করতে হয়। অর্থাৎ দেখতে হয় সমস্ত মানুষ মরণশীল হলে, যে শ্যামলী মানুষ সে সত্যই মরণশীল কি-না। যদি শ্যামলী মরণশীল হয়, তবেই 'সমস্ত মানুষ মরণশীল' একটি সঙ্গত আরোহানুমান হবে। তা হলে আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, অবরোহানুমান ও আরোহানুমান পরস্পর পরিপূরক এবং সার্থক কোন অনুমানই এ দুটির সমন্বয় ছাড়া সম্ভব নয়। নৈয়ায়িকেরা পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে অবরোহ ও আরোহানুমান সমন্বিত করে সঙ্গত কাজই করেছেন এবং এই দিক থেকে পাশ্চাত্ত্য ত্র্যবয়বী অনুমানের চেয়ে পঞ্চাবয়বী ন্যায় অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কারণ ত্র্যবয়বী ন্যায়ত শুধুই অবরোহানুমান।

পঞ্চাবয়বী ন্যায় অবরোহ ও আরোহানুমানকে সংযুক্ত করেছে এবং ইহা পাশ্চাত্ত্য ত্র্যবয়বী অনুমান থেকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

আমরা অনুমানের অঙ্গ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, বস্তুতঃ যেভাবে আমরা অনুমান করি ঠিক সেই প্রক্রিয়া একমাত্র পঞ্চাবয়বী ন্যায়েই প্রকাশ করা সম্ভব। পাশ্চাত্ত্য ত্র্যবয়বী অনুমান আমরা ঠিক যেভাবে অনুমান করি সেই প্রক্রিয়া প্রকাশ করে না। তর্কবিজ্ঞানী মিল ত্র্যবয়বী অনুমানের বিরুদ্ধে এইজন্যই অস্বাভাবিকতার অভিযোগ এনেছেন। ত্র্যবয়বী অনুমানে প্রথমেই সার্বিক বচন বা ব্যাপ্তি ব্যবহৃত হয়, পরে বিশেষ ক্ষেত্রে এই ব্যাপ্তির প্রয়োগ হয়। যেমন সমস্ত মানুষ মরণশীল বলে রাম এই বিশেষ মানুষের ক্ষেত্রে মরণশীলতা প্রযুক্ত হতে পারে এবং আমরা বলি—

পাশ্চাত্ত্য ত্র্যবয়বী অনুমান আমরা ঠিক যেভাবে অনুমান করি, সেই প্রক্রিয়া প্রকাশ করে না। কিন্তু পঞ্চাবয়বী ন্যায় করে।

সমস্ত মানুষ মরণশীল
রাম মানুষ
∴ রাম মরণশীল।

কিন্তু সাধারণত আমরা যখন অনুমান করি তখন সার্বিক বচনটি আগে বলি না। আগে হেতু বলে পরে উদাহরণের সমর্থনের জন্য সার্বিক বচনের উল্লেখ করি। পঞ্চাবয়বী ন্যায় এই কথাই স্বীকার করেছে। এই দিক থেকে ত্র্যবয়বী ন্যায়ের অবয়ব বিন্যাসের চেয়ে পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের অবয়ব বিন্যাসই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ন্যায়ে আমরা বিশেষ থেকে বিশেষ অনুমান করি সার্বিক বচন বা ব্যাপ্তির মাধ্যমে আমরা সাধারণতঃ এইভাবেই অনুমান করি। আর একটি কথা। ত্র্যবয়বী অনুমানে পদগুলো ব্যাপনার (denotation) ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়। সিদ্ধান্তের বিধেয় পদ সব চেয়ে বেশী ব্যাপনা প্রকাশ করে বলে তাকে বড় পদ (Major Term), উদ্দেশ্যপদ সবচেয়ে কম ব্যাপনা বোঝায় বলে তার নাম ছোট পদ (Minor Term) এবং যে পদ সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে সম্বন্ধ সম্ভব করে দেয় তার ব্যাপনা বড় পদের ব্যাপনার চেয়ে কম এবং ছোটপদের ব্যাপনার চেয়ে বেশী বলে তাকে বলে মধ্যমপদ (Middle Term)। ওপরের উদাহরণে 'মরণশীল' বড় পদ, 'রাম' ছোট পদ এবং 'মানুষ' মধ্যমপদ। 'মরণশীল'-এর ব্যাপনা সবচেয়ে বেশী, রাম-এর ব্যাপনা সবচেয়ে কম এবং মানুষ-এর ব্যাপনা 'মরণশীল'-এর ব্যাপনার চেয়ে কম কিন্তু রাম-এর ব্যাপনার চেয়ে বেশী। পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে পদগুলো **ব্যাপনার ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয় না, ব্যবহৃত হয় দ্যোতনার (Connotation) ভিত্তিতে**। অর্থাৎ পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের পক্ষ, সাধ্য ও হেতু পদ কোন ব্যাপনা বোঝায় না, দ্যোতনা বা গুণ বোঝায়।

ত্র্যবয়বী অনুমানে পদগুলো ব্যাপনার ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে দ্যোতনার দিক থেকে ব্যবহৃত হয়।

পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের পরিচিত উদাহরণ দিচ্ছি—

পর্বত বহ্নিবান (প্রতিজ্ঞা)
কারণ, তা ধূমবান (হেতু)
যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি, যেমন মহানস বা উনুন (উদাহরণ)
পর্বতও ধূমবান (উপনয়)
পর্বতও বহ্নিমান (সিদ্ধান্ত)

এই অনুমানে 'পর্বত' পক্ষ, 'বহ্নি' সাধ্য এবং 'ধূম' হেতুপদ। এইক্ষেত্রে 'পর্বত' মানে 'পর্বত বিশিষ্ট', বহ্নি মানে, 'বহ্নি বিশিষ্ট' এবং ধূম মানে 'ধূম বিশিষ্ট'। অর্থাৎ প্রত্যেক পদই দ্যোতনা বা গুণ বোঝাচ্ছে। এই দিক থেকে ত্র্যবয়বী অনুমানের সঙ্গে পঞ্চাবয়বী অনুমানের পার্থক্য স্বীকার করতেই হয়।

অ্যারিস্টটলের ত্র্যবয়বী অনুমানে পক্ষপদ ও সাধ্যপদ কোন উপায়েই একত্র থাকে না, যদিও তারা মধ্যমপদ বা হেতুপদের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত হয়। পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে উপনয়ে এই তিনটি পদই একত্র থাকে।

অ্যারিস্টটলের ত্র্যবয়বী অনুমান সর্বদাই শাব্দিক (Verbalistic) বা শব্দে প্রকাশিত। কিন্তু পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের ক্ষেত্রে শব্দে প্রকাশ অপরিহার্য নয়। স্বার্থানুমানে শব্দে প্রকাশ প্রয়োজনহীন, একমাত্র পরার্থানুমানেই শব্দে প্রকাশ প্রয়োজন।

ডক্টর সতীশ বিদ্যাভূষণ এবং অধ্যাপক কীথের মত কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তির মতে ন্যায় গ্রীক চিন্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত। কিন্তু একথা সত্য নয়। অ্যারিস্টটলের অনেক আগেই ন্যায়ের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। তাছাড়া অ্যারিস্টটলের ত্র্যবয়বী অনুমান ও ন্যায়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যও রয়েছে এবং সেকথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

অনুমানের ভিত্তি

অনুমান করতে হলেই দুটি জিনিস একান্ত প্রয়োজন। একটি হচ্ছে—**পক্ষে হেতু-প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়টি—সাধ্য ও হেতুর অব্যভিচারী নিয়ত সম্পর্ক-জ্ঞান।**[১] এদেরই **অনুমানের ভিত্তি** বলা হয়। পর্বতে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করতে হলে পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করতে হবে এবং জানতে হবে যে, ধূমের সঙ্গে বহ্নির অব্যভিচারী নিয়ত সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানেই বহ্নি। এইক্ষেত্রে 'পর্বত' পক্ষ, 'ধূম' হেতু এবং 'বহ্নি' সাধ্য। সুতরাং পর্বতে ধূমের প্রত্যক্ষ কথার পারিভাষিক রূপায়ণ হল, পক্ষে হেতুর প্রত্যক্ষ এবং যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি এই পারিভাষিক প্রকাশ—হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অব্যভিচারী নিয়ত সম্পর্ক-জ্ঞান।

অনুমানের ভিত্তি দ্বিবিধ—পক্ষে হেতুর প্রত্যক্ষ এবং সাধ্য ও হেতুর অব্যভিচারী ও নিয়ত সম্পর্কের জ্ঞান।

হেতুও সাধ্যের মধ্যে যদি নিয়ত অব্যভিচারী সম্পর্ক থাকে, তবে পারিভাষিক অর্থে তাকে ব্যাপ্তি বলা হয়। ব্যাপ্তি ন্যায়দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সুতরাং ব্যাপ্তি সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনা করা দরকার। আলোচনাটি দুটিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ—ব্যাপ্তির প্রকৃতি ও প্রকার, দ্বিতীয়তঃ—ব্যাপ্তির নির্ণয়ের উপায়।

হেতু ও সাধ্যের মধ্যে নিয়ত ও অব্যভিচারী সম্পর্ককে পারিভাষিক ভাবে ব্যাপ্তি বলে।

ব্যাপ্তির প্রকৃতি ও প্রকার

ব্যাপ্তি ব্যাপ্য ও ব্যাপক বস্তুর নিয়ত সম্পর্ক বোঝায়। একটি বস্তুকে অন্য আর একটি বস্তুর ব্যাপক তখনই বলা হয় যখন বস্তুটি সব সময়েই অন্য বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং একটি বস্তু যখন অন্য আর একটি বস্তুর সঙ্গে একত্রিত হয়েই থাকে তখন তাকে বলে ব্যাপ্য। এই অর্থে ধূম অগ্নির দ্বারা ব্যাপ্য, কারণ ধূম সব সময়েই অগ্নির সঙ্গে একত্রেই থাকে।

ব্যাপ্য ও ব্যাপকের নিয়ত সম্পর্কই ব্যাপ্তি।

১। পক্ষে হেতুর অবস্থানকে পক্ষধর্মতা বলে। পক্ষে হেতুর প্রত্যক্ষকে বলে পক্ষধর্মতা জ্ঞান। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞানকে বলে পরামর্শ। পর্বতে বহ্নির সঙ্গে নিত্য যুক্ত ধূমের প্রত্যক্ষকে পরামর্শ বলে। পরামর্শর জন্য জ্ঞানই অনুমান। পর্বতে বহ্নির সঙ্গে নিত্যযুক্ত ধূমের প্রত্যক্ষ হলেই পর্বতে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। নব্যন্যায় পরামর্শকেই অনুমিতির করণ বলে। অন্নংভট্ট এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু বিশ্বনাথ ভাষাপরিচ্ছেদে ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির করণ বলেছেন এবং পরামর্শকে বলেছেন ব্যাপ্তিজ্ঞানের ব্যাপার। গঙ্গেশ—পূর্ববর্তীকালে উদয়ন প্রশস্তপাদের একটি শ্লোকেরব্যাখ্যায় লিঙ্গ বা হেতুকে অনুমিতির করণ বলেছেন। এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা অধ্যাপক গোপীনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত তর্কসংগ্রহ দীপিকা ২২২—২২৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

ব্যাপ্তি সাধ্য ও হেতুর মধ্যে সহচার সম্পর্ক প্রকাশ করে। যেমন, যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানেই বহ্নি। কিন্তু দুটি জিনিসের মধ্যে সহচার সম্পর্ক থাকলেই তাকে ব্যাপ্তি বলা যায় না। সহচার সম্পর্ক অবশ্যই নিরুপাধিক বা সর্তশূন্য হবে। আর্দ্র কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ হলে ধূম বহির্গত হয়। শুষ্ক কাষ্ঠ থেকে হয় না। এজন্য অগ্নির সঙ্গে ধূমের এই সম্পর্ক ব্যাপ্তি বোঝায় না। কারণ, এ সম্পর্ক নিরুপাধিক বা সর্তশূন্য নয়। অগ্নি, 'আর্দ্র কাষ্ঠ' এই উপাধি সংযুক্ত হলেই ধূমের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, নইলে হয় না। কিন্তু আমরা যখন বলি—'যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানেই অগ্নি,' তখন ধূমের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক কোন উপাধিযুক্ত নয়, উপাধি শূন্য। কারণ, ধূম থাকলেই সব সময়েই আগুন থাকবে। এইজন্যই ধূমের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক ব্যাপ্তি বোঝায়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যাপ্তি হেতু ও সাধ্যের মধ্যে নিত্য অনৌপাধিক সম্বন্ধ; অর্থাৎ, হেতু ও সাধ্যের সহচার সম্পর্ক যখন উপাধিহীন, নিত্য বা নিয়ত তখনই তা ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তি দ্বিবিধ—সমব্যাপ্তি ও অসমব্যাপ্তি বা বিষমব্যাপ্তি। সমব্যাপক দুটি জিনিসের ব্যাপ্তিকে বলে সমব্যাপ্তি। যেমন—সমস্ত নামযুক্ত বস্তুই জ্ঞেয়। এইক্ষেত্রে 'নামযুক্ত বস্তু' এবং জ্ঞেয় বস্তু সমব্যাপক। অর্থাৎ যা নামযুক্ত তাই জ্ঞেয়, আবার যা-ই জ্ঞেয় তাই নামযুক্ত। সমব্যাপক নয় এমন দুটি জিনিসের ব্যাপ্তিকে অসম বা বিষমব্যাপ্তি বলে। যেমন সমস্ত ধূমযুক্ত বস্তুই অগ্নিযুক্ত বস্তু। এইক্ষেত্রে ধূমযুক্ত এবং অগ্নিযুক্ত এই দুটি বস্তু সমব্যাপক নয়। অর্থাৎ যাই ধূমযুক্ত তাই অগ্নিযুক্ত বটে, কিন্তু যাই অগ্নিযুক্ত তাই ধূমযুক্ত নয়; ধূম ছাড়াও অগ্নি থাকতে পারে।

হেতু ও সাধ্যের সহচার সম্পর্ক যখন উপাধিহীন, বা নিত্য বা নিয়ত হয়, তখনই তা ব্যাপ্তি নামে পরিচিত। ব্যাপ্তি দ্বিবিধ—সমব্যাপ্তি ও বিষম ব্যাপ্তি।

ব্যাপ্তি নির্ণয়ের উপায়

এবার প্রশ্ন উঠবে—ব্যাপ্তি নির্ণয় কি উপায়ে সম্ভব? অর্থাৎ 'সমস্ত ধূমযুক্ত বস্তুই অগ্নিযুক্ত' এই সার্বিক বচন কি করে পাওয়া যায়? চার্বাকদের কাছে এই প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, তারা অনুমান বা ব্যাপ্তি কিছুই মানে না। অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকেরা বিভিন্নভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। বৌদ্ধেরা কার্যকারণ বা তাদাত্ম্য সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাপ্তি নিশ্চয় করেন। তাঁদের ধারণা, কার্যকারণ ও তাদাত্ম্যনীতি মানুষের চিন্তার পক্ষে অপরিহার্য। যদি দুটি জিনিস কার্যকারণ সম্পর্কে বদ্ধ থাকে, তবে তাদের সম্পর্ক নিয়ত ও অব্যভিচারী হয়; কার্য কারণ ছাড়া হয় না। দুটি জিনিসের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য বৌদ্ধরা পঞ্চকারণী প্রক্রিয়া অবলম্বন করার পক্ষপাতী। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ—(১) কারণ বা কার্য কোনটাই প্রত্যক্ষ হচ্ছে না, (২) কারণ প্রত্যক্ষ করা গেল, (৩) তৎক্ষণাৎ কার্যও প্রত্যক্ষ হবে, (৪) কারণ তিরোহিত হল, (৫) কার্যও নেই। অনুরূপভাবে দুটি জিনিস যদি স্বরূপতঃ এক হয়, তবে তাদের মধ্যে নিয়ত

ব্যাপ্তি নিশ্চয়ে বৌদ্ধমত।

সম্পর্ক থাকে। 'সমস্ত মানুষই প্রাণী' এইক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে প্রাণীর নিয়ত সম্পর্ক, কারণ প্রাণীত্ব উভয়েরই স্বরূপ ; প্রাণীত্ব না থাকলে মানুষ মানুষই হতে পারে না।

ব্যাপ্তি নির্ণয় ব্যাপারে বৈদান্তিক মত।

বৈদান্তিকদের মতে দুটি জিনিসের সহচার সম্পর্কের অবাধিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যাপ্তি নির্ণয়-হয়। দুটি জিনিস যদি সব সময়েই একত্র থাকতে দেখা যায় এবং এর ব্যতিক্রম না দেখা যায়, তবে এই দুটি জিনিসের সম্পর্ককেই ব্যাপ্তি বলে বুঝতে হবে (ব্যাভিচারাদর্শনে সতি সহচার দর্শনম্)।

ব্যাপ্তি নির্ণয় সম্বন্ধে ন্যায় মত।

নৈয়ায়িকেরা বৈদান্তিকদের মতই দুটি জিনিসের সহচার সম্পর্কের অবাধিত অভিজ্ঞতা থেকেই ব্যাপ্তি নিশ্চয় করেন এবং বৌদ্ধদের কার্যকারণ বা তাদাত্ম্য নীতির ভিত্তিতে ব্যাপ্তি নির্ণয়ে বিশ্বাস করেন না। নৈয়ায়িকেরা অবশ্য সহচার সম্পর্কের অবাধিত অভিজ্ঞতাকে তর্ক দিয়েও সমর্থন করেন। এইদিক থেকে তাঁরা বেদান্তীদের চেয়ে স্বতন্ত্র। **নৈয়ায়িকদের ব্যাপ্তি-নির্ণয় প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত স্তরগুলো লক্ষণীয়।**

অন্বয়।

প্রথমতঃ—দুটি জিনিস একই সঙ্গে থাকে এটা আমরা লক্ষ্য করি। যেমন —যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানেই বহ্নি। এর নাম অন্বয়।

ব্যতিরেক।

দ্বিতীয়তঃ—ঐ দুটি জিনিসের অভাব একই সঙ্গে থাকে তাও আমরা জানি। যেমন—যেখানে যেখানে বহ্নি নাই সেখানে সেখানে ধূম নাই। এর নাম ব্যতিরেক। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রক্রিয়া একত্র করলে যা হয় অনেকটা তাকেই পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানে মিল 'অন্বয়-ব্যতিরেকী প্রণালী' (Method of Agreement in Presence and Absence) নামে অভিহিত করেছেন।

ব্যভিচারাগ্রহ।

তৃতীয়তঃ—আমরা এমন দৃষ্টান্ত পাইনা যেখানে ধূম আছে অথচ অগ্নি নেই। যেমন—ধূম আছে অথচ অগ্নি নেই, এমন হতেই পারে না। একে বলে ব্যভিচারাগ্রহ। এই সমস্ত দেখে আমরা দুটি জিনিসের মধ্যে নিয়ত সম্পর্ক অনুমান করতে পারি। কিন্তু তাতেও আমাদের সংশয় যায় না। ভাবি, সম্পর্কটি উপাধিযুক্ত নয় ত? উপাধিযুক্ত হলে ত এই সম্পর্ককে ব্যাপ্তি বলা যাবে না। সেইজন্যই—

উপাধি নিরাস।

চতুর্থতঃ—আমরা সম্পর্কটি যে উপাধিযুক্ত নয় এই বিষয়ে নিশ্চিত হই। অন্বয় এবং ব্যতিরেক-প্রক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার বা অভিজ্ঞতা থেকে এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব। বার বার যদি দেখি ধূম থাকলেই অগ্নি থাকে এবং অগ্নি না থাকলে ধূম থাকেনা তখন মনে করি ধূমের সঙ্গে অগ্নির যে সম্পর্ক তা উপাধি বা শর্তশূন্য। সুতরাং ধূম ও অগ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্পর্কই আছে।

সংশয়বাদীদের সংশয় অবশ্য এতে দূর হবে না। তাঁরা ভাববেন—এতদিন পর্যন্ত যত ধূম দেখেছি সবই অগ্নি সম্পর্কিত, কিন্তু ভবিষ্যতে ত এরকম নাও হতে পারে। সংশয়বাদীদের এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যই নৈয়ায়িকেরা—

পঞ্চমতঃ—তর্ক করে ধূমের সঙ্গে অগ্নির নিয়ত সম্পর্ক সাব্যস্ত করেন। 'সমস্ত ধূমযুক্ত বস্তুই অগ্নিযুক্ত' এই বচনটিকে নিম্নলিখিত তর্কের সাহায্যে প্রকারান্তরে প্রমাণ করা যায়। এই বচনটি যদি সত্য না হয়, তবে এর বিরুদ্ধ বচন 'কতিপয় ধূমযুক্ত বস্তু অগ্নিযুক্ত নয়' নিশ্চয়ই সত্য হবে। অর্থাৎ আগুন ছাড়াও ধূম থাকতে পারবে। কিন্তু এইরূপ অনুমান সর্বজন স্বীকৃত কার্যকারণ নীতির বিরোধী বলে গ্রহণযোগ্য নয়। যদি অগ্নি ছাড়াই ধূম হয়, তবে আসলে কারণ ছাড়াই কার্য হতে পারে, কারণ, অগ্নি ভিন্ন ধূমের অন্য কোন কারণ ত জানা নেই। অবশ্য কেউ যদি তবুও বলেন যে কারণ ছাড়াই কার্য হতে পারে, তবে ব্যবহারিক জীবনে ব্যাঘাত হওয়ার জন্য তিনি এই কথা পরিত্যাগ করতে বাধ্য। কারণ ছাড়াই যদি কার্য হয়, তবে রান্না করার জন্য আগুনের প্রয়োজন কি? দধির জন্য দুধেরই বা কি দরকার? ন্যায়দার্শনিকদের তর্ক নামক পরোক্ষ প্রমাণ পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানীদের "কোনঠাসা প্রমাণ" (Reductio ad absurdum)-এর অনুরূপ।

তর্ক।

নৈয়ায়িকেরা এত করেও খুশী হন না। তাঁরা বলেন, দুটি জিনিসের নিয়ত সম্পর্কের ভিত্তি অন্য কোথাও খুঁজতে হবে। যখন আমরা বলি 'সমস্ত মানুষ মরণশীল' তখন মানুষের সঙ্গে মরণশীলতার সম্পর্কের নিশ্চয়তা কোথায় পাই? 'সমস্ত কাক কালো' এবং 'সমস্ত মানুষ মরণশীল" ত একই রকম সম্পর্ক বোঝায় না। কাক কালো না হয়ে অন্য কিছুও হতে পারে; কিন্তু মানুষ অমর, এমন কথা আমরা সঙ্গতভাবে ভাবতে পারি কি? দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রের এই পার্থক্যের কারণ কি? মনে হয়, পার্থক্যের হেতু এই যে, কাকের প্রকৃতিতে এমন কিছুই নেই যার জন্য তাকে কালো হতেই হবে; কিন্তু মানুষের প্রকৃতিতেই এমন কিছু আছে যার জন্য সে মরণশীল না হয়ে পারে না। কালো ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না বলে আমরা কাককে কালো বলি না, কাককে কালো দেখি বলেই বলি। কিন্তু আমরা 'সমস্ত মানুষ মরণশীল' বলি, কারণ তারা মানুষ; অর্থাৎ তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে এবং মনুষ্যত্বের সঙ্গেই মরণশীলতার নিয়ত সম্পর্ক। একথা যে সত্য তার প্রমাণ আমরা রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতিকে যে মরণশীল বলি তার কারণ এই নয় যে, তারা রাম, শ্যাম, যদু, মধু; আসল কারণ তারা মানুষ। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপ্তিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত দুটি জিনিসের সামন্যের প্রত্যক্ষ থেকেই হয়। সেই জন্যই নৈয়ায়িকেরা—

সর্বশেষে সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ করে ব্যাপ্তি স্থাপন করেন।[১] তাঁরা বলেন 'সমস্ত মানুষ মরণশীল' বা 'সমস্ত ধূমযুক্ত বস্তুই অগ্নিযুক্ত' এইরূপ দুটি জিনিসের নিয়ত সম্পর্ক প্রকাশক বচন অবশ্যই মনুষ্যত্ব এই সামান্যের সঙ্গে মরণশীলতার প্রত্যক্ষ বা ধূমত্ব এই সামান্যের সঙ্গে অগ্নিত্বের প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র যখন আমরা মনুষ্যত্বের সঙ্গে মরণশীলতার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করি তখনই নিশ্চিতভাবে বলতে পারি—

১। মুক্তাবলী ২৮০ পৃষ্ঠা, তত্ত্বচিন্তামণি ১৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

'সমস্ত মানুষ মরণশীল'। অনুরূপভাবে 'সমস্ত ধূমযুক্ত বস্তুই অগ্নিযুক্ত' নিশ্চিতভাবে বলতে গেলে ধূমত্বের সঙ্গে অগ্নিত্বের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করতেই হবে। সুতরাং দুটি জিনিসের অব্যভিচারী নিয়ত নিরুপাধিক সম্পর্ক বা ব্যাপ্তি নিশ্চিতভাবে স্থাপন করতে হলে দুটি জিনিসের সহচার সম্পর্কের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখলেই হবেনা, এইদৃষ্টান্তের মধ্য থেকে দুটি জিনিসের সামান্যও প্রত্যক্ষ করতে হবে। পাশ্চাত্য দর্শনে ইটন, হোয়াইটহেড প্রভৃতি কয়েকজন দার্শনিকের লেখায় তুলনীয় মতবাদ পাওয়া যায়। উৎসাহী পাঠক তা পড়ে উপকৃত হতে পারেন।[১]

সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ।

অনুমানের প্রকারভেদ

নৈয়ায়িকেরা বিভিন্ন নীতি অনুসারে অনুমানের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করেছেন। অনুমান কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে এই দিক থেকে অনুমানের একটি বিশিষ্ট বিভাগ আছে। নতুন জ্ঞান অর্জনের জন্য বা অন্যকে কোন জ্ঞানের সত্যতা প্রদর্শনের জন্য সাধারণতঃ আমরা অনুমান করি। যে অনুমান নতুন জ্ঞান দেয় এবং নিজের জন্যই করা হয়, তাকে বলে স্বার্থানুমান। আর যে অনুমানের সাহায্যে অন্যের নিকট কোন জ্ঞানের সত্যতা প্রদর্শন করা হয়, তাকে বলে পরার্থানুমান। যদি কোন লোক পাহাড়ে ধোঁয়া দেখে এবং স্মরণ করে যে 'যেখানে যেখানে ধোঁয়া সেখানে সেখানেই আগুন এরকম একটা সাধারণ নিয়ম আছে, তবে সে সিদ্ধান্ত করবে যে পাহাড়ে আগুন আছে। এরই নাম স্বার্থানুমান। আর যদি কোন লোক পাহাড়ে আগুন আছে জেনে অন্যকে তা বোঝাতে চেষ্টা করে বলে, 'পাহাড়ে নিশ্চয় আগুন আছে, কারণ সেখানে ধোঁয়া আছে এবং যেখানে যেখানে ধোঁয়া সেখানে সেখানেই আগুন' যেমন রান্নাঘরে দেখা যায়; পাহাড়ও অনুরূপ ধোঁয়াযুক্ত, সুতরাং পাহাড়ে আগুন আছে, তবে এই আনুমানই হবে পরার্থানুমান।[২] এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা ভাল যে, পরার্থানুমানের ক্ষেত্রেই পঞ্চাবয়বী ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে এই দিক থেকে বিবেচনা করে অনুমান দ্বিবিধ বলা যায়—স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান।

অন্য আর একটি নিয়ম অনুসারে অনুমান তিনপ্রকার—পূর্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট।[৩] ব্যাপ্তির প্রকৃতি অনুসারে অনুমানের এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

পূর্ববৎ এবং শেষবৎ অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি কার্যকারণ সম্পর্ক বোঝায়, কিন্তু সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের ব্যাপ্তি এই সম্পর্ক বোঝায় না। কারণ কার্যের অব্যভিচারী নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা এবং বিপরীতভাবে কার্য কারণের অব্যভিচারী নিয়ত পরবর্তী ঘটনা।[৪] পূর্ববৎ অনুমানে আমরা জ্ঞাত কারণ থেকে অজ্ঞাত

১। R. M. Eaton: General Logic, Part IV, A. N. Whitehead, Process and Reality, Part II chapter IX Section IV—VII দ্রষ্টব্য

২। তর্কসংগ্রহ ৪৬-৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য

৩। ন্যায়সূত্র ও ভাষ্য ১।১।৫

৪। তর্কভাষা ২ পৃষ্ঠা, তর্কসংগ্রহ এবং তর্কদীপিকা ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা

কার্য অনুমান করি। আকাশে ঘনকৃষ্ণ মেঘ দেখে বৃষ্টির অনুমান এই শ্রেণীর। যে অনুমানে আমরা জ্ঞাত কার্য থেকে অজ্ঞাত কারণ অনুমান করি তার নাম শেষবৎ। নদীর ঘোলা জল দেখে অতীতে বৃষ্টি হয়েছিল অনুমান করলে এই জাতীয় অনুমান হয়। এই দুই ক্ষেত্রেই ব্যাপ্তি বা সাধ্য ও হেতুর সম্পর্ক আসলে কার্য-কারণ সম্পর্ক। কিন্তু সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানে ব্যাপ্তি কার্য-কারণ সম্পর্ক বোঝায় না; অর্থাৎ সাধ্য হেতুর সঙ্গে কার্য বা কারণরূপে সম্পর্কিত হয় না। আমাদের অভিজ্ঞতায় সহচার সম্পর্কে আবদ্ধ দেখি বলে আমরা সাধ্য ও হেতুর সম্পর্ক স্থাপন করি। উদাহরণ দিচ্ছি। জ্যোৎস্না রাত্রে অনেকক্ষণ পর পর আকাশের দিকে তাকিয়ে যদি আমরা চাঁদের বিভিন্ন অবস্থান লক্ষ্য করি, তবে অনুমান করা যায় যে চাঁদ চলে; যদিও তার গতি আমরা প্রত্যক্ষ করি না। অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রে যখন আমরা অবস্থানের পরিবর্তন দেখি তখন গতিও প্রত্যক্ষ করি। এইজন্যই চাঁদের গতি প্রত্যক্ষ না করেই তার বিভিন্ন অবস্থান দেখে এর গতি অনুমান করি। এইক্ষেত্রে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, কোন জিনিসের বিভিন্ন অবস্থানের সঙ্গে তার গতির কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই; তবে অভিজ্ঞতায় আমরা অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে গতির সহচার সম্পর্কই পাই। এইরূপ ব্যাপ্তির ওপর নির্ভর করে যে অনুমান করা হয়, তারই নাম সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।[১]

ব্যাপ্তির প্রকৃতি অনুসারে অনুমান ত্রিবিধ—পূর্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট।

আর এক প্রকার বিভাগের দিক থেকে অনুমান তিনপ্রকার বলে স্বীকৃত হয়েছে—কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বয়ব্যতিরেকী।[২] ব্যাপ্তি মুখ্যতঃ কোন্ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত তার ওপর নির্ভর করেই অনুমানের এই শ্রেণীবিভাগ। যে অনুমানের ব্যাপ্তি কেবলমাত্র অন্বয়-নির্ভর তার নাম কেবলান্বয়ী অনুমান। অর্থাৎ যে অনুমানে সাধ্য ও হেতু কেবলমাত্র পরস্পর উপস্থিতির সহচার সম্পর্কে আবদ্ধ, তাকেই কেবলান্বয়ী অনুমান বলে। যেমন—

অন্য আর একটি নিয়ম অনুসারে অনুমান ত্রিবিধ—কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী।

সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুই নামযুক্ত
ঘট একটি জ্ঞেয় বস্তু
∴ ঘট নামযুক্ত।

এই অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি হেতুর (জ্ঞেয় বস্তু) সঙ্গে সাধ্যের (নামযুক্ত) শুধু উপস্থিতির সহচারই প্রকাশ করেছে, অর্থাৎ যেখানে যেখানে জ্ঞেয় বস্তু আছে সেখানে সেখানেই তার একটা নাম আছে। সুতরাং এই অনুমানটি কেবলান্বয়ী।

কেবলান্বয়ী অনুমান।

যে অনুমানের ব্যাপ্তি সাধ্য ও হেতুর অনুপস্থিতির সহচার সম্পর্কে আবদ্ধ,

---

* পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের আর একটি ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ফণীভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় লিখিত 'ন্যায় দর্শন' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

১। তর্কসংগ্রহ ৫১-৫২ পৃঃ, ভাষা পরিচ্ছেদ এবং মুক্তাবলী ১৪২-৪৩ পৃঃ।

অর্থাৎ যেখানে ব্যাপ্তি কেবলমাত্র ব্যতিরেক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত, তার নাম কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান। নৈয়ায়িকদের মতে এই জাতীয় অনুমানের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ—

কেবল ব্যতিরেকী অনুমান।

যা ক্ষিতি ভিন্ন অন্যভূত থেকে ভিন্ন নয় তার গন্ধ নেই
ক্ষিতির গন্ধ আছে
∴ ক্ষিতি অন্যভূত থেকে ভিন্ন

গন্ধ একমাত্র ক্ষিতিরই আছে। সুতরাং ক্ষিতি ভিন্ন অন্যান্য ভূতের সঙ্গে গন্ধের একমাত্র নিষেধাত্মক সম্পর্কই সম্ভব। সেইজন্যই ওপরের দৃষ্টান্তে সাধ্যের (অন্যভূত থেকে ভিন্ন) সঙ্গে হেতুর (গন্ধ) কেবলমাত্র অনুপস্থিতির সহচার সম্পর্কই বর্তমান এবং এই ব্যাপ্তি একমাত্র ব্যতিরেক প্রণালীতেই পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ, এই অনুমানটি কেবলব্যতিরেকী অনুমান। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানে নিষেধাত্মক উপাত্ত (premise) থেকে কখনই সদর্থক সিদ্ধান্ত টানা যায় না। কিন্তু ওপরের দৃষ্টান্তে নিষেধাত্মক উপাত্ত (যা অন্যভূত থেকে ভিন্ন নয়) থেকে সদর্থক সিদ্ধান্তই (ক্ষিতি অন্যভূত থেকে ভিন্ন) নৈয়ায়িকেরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং এই জাতীয় অনুমান পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানে যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকৃত হবে না। অবশ্য তর্কবিজ্ঞানী ব্রেডলী এই জাতীয় অনুমানের সত্যতাও স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে এইরূপ অনুমান নিষেধাত্মক অনুমানেরই একটি বিশেষরূপ।[১]

যে অনুমানের সিদ্ধান্ত সাধ্য ও হেতুর সদর্থক ও নিষেধাত্মক উভয় প্রকার সম্পর্ক বা ব্যাপ্তি থেকেই পাওয়া যায়, তারই নাম অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান। এই প্রকার অনুমানের ব্যাপ্তি অন্বয় এবং ব্যতিরেক দুই প্রকার প্রণালীতেই পাওয়া সম্ভব। উদাহরণ দিচ্ছি—

অন্বয় ব্যতিরেকী অনুমান।

(১) সমস্ত ধূমযুক্ত বস্তুই অগ্নিযুক্ত
পর্বত ধূমযুক্ত
∴ পর্বত অগ্নিযুক্ত

এবং (২) কোন অগ্নিশূন্য বস্তুই ধূমযুক্ত নয়
পর্বত ধূমযুক্ত
∴ পর্বত অগ্নিযুক্ত

হেত্বাভাস[২]

ন্যায়স্বীকৃত সমস্ত হেত্বাভাস বা অনুমান-সংক্রান্ত দোষই বস্তুগত দোষ। ভারতীয় দর্শনে অনুমানের অযৌক্তিকতা আসলে হেতুরই অযৌক্তিকতা। যে অনুমানের হেতু সঙ্গত নয়, অসঙ্গত, তারই নাম হেত্বাভাস। এই সমস্ত হেতু দেখতে হেতুর মত, কিন্তু আসলে কোন হেতুই নয়। সেইজন্যই ত এরা হেত্বাভাস (হেতুর আভাস, কিন্তু হেতু নয়)। নৈয়ায়িকদের মতে হেত্বাভাস

হেত্বাভাস অনুমান-সংক্রান্ত দোষ। ন্যায়মতে হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার।

১। Bradley : Principles of Logic, প্রথম খণ্ড, ২৭৪-৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
২। শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী বিরচিত তর্ক সংগ্রহ, অধ্যাপনা সহিত, গ্রন্থের ৪০৯-৪৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাঁচ প্রকার—(১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, (৩) সৎপ্রতিপক্ষ, (৪) অসিদ্ধ এবং (৫) বাধিত।

যে অনুমানের হেতু ব্যভিচার বা ব্যতিক্রমযুক্ত, সেই অনুমানই সব্যভিচার হেত্বাভাসযুক্ত। উদাহরণ দিচ্ছি।

যে অনুমানের হেতু ব্যতিক্রমযুক্ত সে অনুমান সব্যভিচার হেত্বাভাসযুক্ত।

সমস্ত দ্বিপদ প্রাণীই চিন্তাশীল
হংস দ্বিপদ প্রাণী
∴ হংস চিন্তাশীল

এই অনুমানের সিদ্ধান্ত বস্তুগতভাবে মিথ্যা। কারণ, হংস কখনই চিন্তাশীল হতে পারে না। সিদ্ধান্ত মিথ্যা হল কেন? কারণ, হেতু (দ্বিপদ) কেবলমাত্র সাধ্য (চিন্তাশীল)-এর সঙ্গেই সহচার-সম্পর্ক-যুক্ত নয়, সাধ্য ভিন্ন অচিন্তাশীল প্রাণীর সঙ্গেও সহচার-সম্পর্ক-যুক্ত। সুতরাং এইক্ষেত্রে হেতু ব্যভিচারযুক্ত, অর্থাৎ সব্যভিচার। ব্যাপ্তির নিয়ম অনুসারে হেতু সমস্ত সাধ্য সম্পর্কেই সত্য হতে বাধ্য, কিন্তু এইক্ষেত্রে হেতু সাধ্যের একটি অংশ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। সেইজন্যই হেত্বাভাসের সৃষ্টি।

যে হেতু স্থাপিত সিদ্ধান্তকে প্রমাণ না করে তার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে, তাকে বিরুদ্ধ হেতু বলে।

যে হেতুর সাহায্যে কোন সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা হয়, সেই হেতু বস্তুতঃ সেই সিদ্ধান্ত প্রমাণ না করে যদি তার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে, তবে "বিরুদ্ধ হেতু" এই হেত্বাভাসের উদ্ভব হয়। যেমন—বায়ু গুরুভার, কারণ ইহা শূন্য। এইক্ষেত্রে হেতু (শূন্য) বিরুদ্ধ, কারণ শূন্যতা বস্তুর গুরুতা প্রমাণ করে না, লঘুতাই প্রমাণ করে। হেতু সাধ্য প্রমাণ করবে, এইটাই প্রত্যাশিত। যদি তা না করে, হেতু সাধ্যের বিরুদ্ধ জিনিস প্রমাণ করে, তবে হেতুর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। ফলে হেত্বাভাসের সৃষ্টি হয়। নৈয়ায়িকেরা বিরুদ্ধ হেতুর উদাহরণ দিয়েছেন এইভাবে —শব্দ উৎপন্ন হয় বলে নিত্য। এখানে হেতু 'উৎপন্ন হয়' এবং সাধ্য 'নিত্য'। হেতু এই সাধ্য প্রমাণ না করে তার বিপরীত 'অনিত্য' তাই প্রমাণ করে। যে জিনিস উৎপন্ন হয়, সে জিনিস কখনই নিত্য হতে পারে না। একমাত্র অনিত্য জিনিসই উৎপন্ন হতে পারে। সব্যভিচার এবং বিরুদ্ধ হেতুর তফাৎ এই যে, প্রথমটি সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে না, দ্বিতীয়টি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কথা প্রমাণ করে।

একটি হেতু প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে না, একথা যদি আমরা অন্য আরেকটি অনুমান দিয়ে প্রমাণ করি, তবে এই হেতুকে সৎপ্রতিপক্ষ বলে।

একটি হেতু প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে না, একথা যদি আমরা অন্য আর একটি অনুমান দিয়ে প্রমাণ করতে পারি, তবে এই হেতুকে সৎপ্রতিপক্ষ বলা হয়। এইক্ষেত্রে প্রথম অনুমানের হেতু দ্বিতীয় অনুমানের হেতু দ্বারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। কারণ, দ্বিতীয় অনুমানের হেতু প্রথম অনুমানের সাধ্যের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে। যেমন—'শব্দ নিত্য, কারণ ইহা শ্রাব্য' এই অনুমানটি দ্বিতীয় অনুমান—'শব্দ অনিত্য, কারণ ইহা ঘটের মতই সৃষ্ট' দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। এখানে প্রথম অনুমানের সাধ্য 'নিত্যতা'র অনুপস্থিতি দ্বিতীয় অনুমানের হেতু

'সৃষ্ট' প্রমাণ করে ; কারণ যে জিনিস সৃষ্ট হয়েছে সে জিনিস নিত্য হতে পারে না। অবশ্য প্রথম অনুমানে 'শ্রাব্য' এই হেতু সাধ্য 'নিত্যতা' প্রমাণ করেছে বলে মনে হয়েছিল ; কিন্তু আসলে তা যে প্রমাণ করেনি তা আমরা দ্বিতীয় অনুমান থেকেই বুঝতে পারছি। এইক্ষেত্রে প্রথম অনুমানের হেতু আসলে হেত্বাভাস এবং এরই নাম সৎপ্রতিপক্ষ। বিরুদ্ধ এবং সৎপ্রতিপক্ষ হেতুর তফাৎ এই যে, বিরুদ্ধ হেতু প্রস্তাবিত সাধ্যের বিরুদ্ধ কথা প্রমাণ করে, কিন্তু সৎপ্রতিপক্ষ হেতুর ক্ষেত্রে সাধ্যের বিরুদ্ধ কথা অন্য আর একটি অনুমানের অন্য আর একটি হেতু প্রমাণ করে।

নৈয়ায়িকদের মতে অসিদ্ধ বা সাধ্যসম নামে আর একটি হেত্বাভাসও আছে। অসিদ্ধ হেতু নিজেই অপ্রমাণিত, সুতরাং তার পক্ষে কোন সাধ্য প্রমাণের প্রশ্নই ওঠে না। এইক্ষেত্রে হেতুর অস্তিত্বই থাকে না, এই হেতু একান্তভাবেই কল্পিত। যেমন—আকাশকুসুম সুগন্ধী, কারণ স্বাভাবিক কুসুমের মতই এর কুসুমত্ব আছে। এইক্ষেত্রে হেতু 'কুসুমত্ব' আকাশকুসুমে একান্তভাবেই কল্পিত। কারণ, আকাশকুসুম বলে বস্তুতঃ কিছুই যে নেই। সুতরাং এইক্ষেত্রে হেতু অসিদ্ধ বা অপ্রমাণিত, একথা মানতেই হবে।

যে হেতু কল্পিত, বাস্তব ব্যাপার নয়, তাকে অসিদ্ধ হেতু বলে।

পঞ্চম এবং সর্বশেষ হেত্বাভাসের নাম বাধিত। যদি কোন তথাকথিত হেতু-প্রমাণিত সাধ্য অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা নেই বলে সাব্যস্ত হয়, তবে সেই হেতুকে বাধিত বলে। যেমন—'আগুন ঠাণ্ডা, কারণ ইহা একটি দ্রব্য'। এইক্ষেত্রে 'ঠাণ্ডা' সাধ্য এবং 'দ্রব্য' হেতু। আমরা স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা অগ্নির শীতলত্ব নয়, উষ্ণত্বই প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং 'দ্রব্য' এই হেতু যে অগ্নির উষ্ণত্ব প্রত্যক্ষের দ্বারা বাধিত; একথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। অর্থাৎ 'দ্রব্য' এই হেতু 'আগুন ঠাণ্ডা' একথা যে প্রমাণ করতে পারে না তা আমাদের মেনে নিতে হবে।

যদি কোন তথাকথিত হেতু-প্রমাণিত সাধ্য অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা নাই বলে সাব্যস্ত হয়, তবে সেই হেতুকে বাধিত বলে।

সৎপ্রতিপক্ষ এবং বাধিত হেতুর তফাৎ আছে। প্রথম ক্ষেত্রে একটি অনুমানের হেতু অন্য আর একটি অনুমানের দ্বারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনুমানের হেতু প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান-ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা ভ্রান্ত সাব্যস্ত হয়।

এই পঞ্চবিধ হেত্বাভাস ছাড়া কেউ কেউ কালাতীত নামে আর একটি হেত্বাভাসেরও উল্লেখ করেছেন। আক্ষরিক অর্থে যে হেতু কালক্রমে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে তাকেই কালাতীত হেতু বলে।[১] 'শব্দ স্থায়ী, কারণ শব্দ বর্ণের মত সংযোগজন্য', এই অনুমান কালাতীত হেত্বাভাস দুষ্ট। একটি বস্তু আলোর সংস্পর্শে এলেই তাতে বর্ণ প্রকাশিত হয়, তবে সংযোগের পূর্বে ও পরে বর্ণ থাকে। অনুরূপভাবে অনুমান করা হয়েছে, যে শব্দ দুটি বস্তুর সংযোগজন্য প্রকাশিত তা সংযোগের পূর্বে ও পরেও

কালাতীত হেত্বাভাস ও তার প্রকৃতি।

১। কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ, ন্যায় সূত্র ১।২।৯

থাকবে, অর্থাৎ স্থায়ী হবে। কিন্তু এই অনুমান দোষদুষ্ট, কারণ এখানে হেতু কাল-সীমায় সীমিত। বর্ণের ক্ষেত্রে আলো ও সবর্ণ বস্তুর সংযোগ এবং বর্ণের প্রকাশ একই সঙ্গে হয়। কিন্তু শব্দ দুটি বস্তুর সংযোগের পরে উৎপন্ন হয়, কিন্তু একই সঙ্গে উৎপন্ন হয় না। সুতরাং সংযোগের অনুপস্থিতিকালে শব্দ উৎপন্ন হয় বলে সংযোগকে শব্দের কারণ বলা যায় না। অর্থাৎ এই বিশেষ ক্ষেত্রে হেতু সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে না। ন্যায়দর্শনে এই হেতুকেই কালাতীত হেতু বলে। এই অর্থে কালাতীত হেতু দুটি উপাত্তে ভিন্ন ভিন্ন সর্তাধীনে ব্যবহৃত হয়। পাশ্চাত্ত্য তর্কশাস্ত্রে অনুমানসংক্রান্ত এই দোষের নাম The fallacy of Accident বা সোপাধিকতা দোষ।

কালাতীত হেত্বাভাসের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা নৈয়ায়িকেরা গ্রহণ করেন না।

অনুমানের বিভিন্ন অবয়বের ক্রমপরিবর্তনহেতু কালাতীত দোষ হয়, এমন কথাও কোন কোন দার্শনিক বলেন। নৈয়ায়িকেরা এই অর্থে 'কালাতীত দোষ' কথাটি গ্রহণ করেন নি। তাঁরা প্রথম অর্থেই এই দোষ গ্রহণ করেন।

অনুমান সংক্রান্ত দোষ ছাড়া বিচারের ক্ষেত্রে অন্য কতকগুলো দোষ নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন। ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান এই জাতীয় দোষ। বিচারকালে কোন একটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করলে যে দোষ হয়, তার নাম ছল। পাশ্চাত্ত্য তর্কশাস্ত্রে একে The fallacy of ambiguity বা বহু অর্থজ্ঞাপক দোষ বলে উল্লেখ করা হয়। ছল ত্রিবিধ—বাক্‌ছল, সামান্যছল এবং উপচারছল। একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করলে বাক্‌ছল দোষ হয়। 'বালকটি নবকম্বল' একথা বললে বালকটির নতুন কম্বল বা নয়টি কম্বল আছে, দুইই হতে পারে। এই ক্ষেত্রে বাক্‌ছল দোষের উদ্ভব হয়েছে। সামান্যছলের ক্ষেত্রে একই শব্দ ব্যক্তি ও জাতি দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। 'ব্রাহ্মণ বিদ্বান' বলতে কোন বিশেষ ব্রাহ্মণ বিদ্বান বা সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতিই বিদ্বান, দুইই বোঝাতে পারে। কোন একটি বাক্যের আক্ষরিক অর্থ ও ব্যাঙ্গার্থের বিরোধ থেকে উপচারছলের উদ্ভব। যদি কেউ বলেন, বধ্যভূমি কেঁদে উঠলো (এখানে তিনি বাক্যটি ব্যাঙ্গার্থে গ্রহণ করেছেন), তবে বাক্যটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে অন্য কেউ বলতে পারেন, 'বধ্যভূমি কেঁদে উঠতে পারে না'। এইক্ষেত্রে দুই ব্যক্তির বিরোধের ভিত্তি—উপচারছল। অর্থাৎ একজন বাক্যটিকে ব্যাঙ্গার্থে এবং অন্যজন আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার জন্যই এই বিরোধ।

বিচারের ক্ষেত্রে ছল-দোষ হয়। ছল ত্রিবিধ—বাক্‌ছল, সামান্যছল এবং উপচারছল।

অবান্তর কথা বলে বিচার করলে জাতিদোষের উদ্ভব হয়। সিদ্ধান্ত স্থাপনের পক্ষে যা সহায়ক নয়, বরং অবান্তর, এমন কথা বলে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা থেকে যে দোষ হয়, তারই নাম জাতি। কেউ যদি বলেন, শব্দ আকাশের মত নিরাকার বলে নিত্য, তবে এই দোষ হবে। কোন জিনিস নিরাকার হলেই নিত্য হয় না। জাতি চতুর্বিংশতি প্রকার। সমস্ত প্রকার জাতির আলোচনা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার ভয়ে এখানে করা সম্ভব হচ্ছে না। উৎসাহী পাঠক ডঃ সতীশ

বিচারের সময় অবান্তর কথা বললে জাতি দোষ হয়। জাতি চতুর্বিংশতি প্রকার।

চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'The Nyaya theory of knowledge' গ্রন্থটি পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

নিগ্রহস্থানদোষ প্রতিপক্ষের বক্তব্য না বোঝা বা ভুল বোঝা থেকে উদ্ভূত হয়। নিগ্রহস্থান দ্বাবিংশতি প্রকার।

নিগ্রহস্থানদোষ প্রতিপক্ষের বক্তব্য না বোঝা বা ভুল বোঝার জন্য উদ্ভূত হয়ে থাকে। এইক্ষেত্রে বিচারককে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। এই দোষ দ্বাবিংশতি প্রকার। এ সমস্ত প্রকার দোষের আলোচনা এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। উৎসাহী পাঠক এইক্ষেত্রেও পূর্বে উল্লিখিত "The Nyaya theory of knowledge' গ্রন্থটি পাঠ করতে পারেন।

উপমান

ন্যায়মতে উপমান একটি প্রমাণ। সংজ্ঞার ভিত্তিতে সংজ্ঞীর যে জ্ঞান তারই নাম উপমিতি।

নৈয়ায়িকদের মতে উপমান একটি প্রমাণ। সংজ্ঞা-সংজ্ঞী-সম্বন্ধ-জ্ঞানকে উপমিতি বলে। সংজ্ঞার ভিত্তিতে সংজ্ঞীর (যার সম্বন্ধে সংজ্ঞা) যে জ্ঞান, তারই নাম উপমিতি। যদি কোন লোক এই রকমের এই জাতীয় বস্তু সম্বন্ধে এই শব্দ প্রযোজ্য এমন কথা বলে এবং পরে আমরা যদি সেই রকমের পূর্বে প্রত্যক্ষ করিনি বা বস্তু প্রত্যক্ষ হলেও তার নাম জানতাম না, এমন কোন বস্তু সম্বন্ধে ঐ শব্দ প্রয়োগ করতে পারি, তবে যে জ্ঞান হবে, তারই নাম উপমিতি।

উপমিতির জ্ঞান যেভাবে হয় তা উপমান প্রমাণ। উপমিতির করণ উপমান সাদৃশ্য জ্ঞান উপমিতির করণ।

উদাহরণ দিলে বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

উপমান প্রমাণের উদাহরণ।

যে লোক গবয়[১] বা বন্য গরু কি জানে না, তাকে যদি বলা হয় যে, বন্য গরু গৃহপালিত গরুর মতই একটি প্রাণী এবং পরে বনে ঐ রকমের জন্তু দেখে যদি সে তাকে গবয় শব্দবাচ্য বলে জানতে পারে, তবে এই জ্ঞান উপমান-জন্য হয়েছে বলে বুঝতে হবে।[২] এইক্ষেত্রে 'গবয়'র সংজ্ঞা বা বর্ণনার ভিত্তিতে গবয় যে গবয় শব্দবাচ্য এই জ্ঞান হয়েছে। উপমানের আরও অনেক উদাহরণই দেওয়া যেতে পারে, তবে তা দিয়ে আর লাভ কি? আশা করি জিনিসটি একটি উদাহরণেই বোঝা গেছে।

নৈয়ায়িকদের মত উপমানকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে অনেকেই স্বীকার করেন না। চার্বাকদের মতে উপমান কোন প্রমাণই নয়। কারণ, উপমান কোন প্রমা-জ্ঞানই দিতে পারে না।[৩] বৌদ্ধ দার্শনিকেরা উপমানকে প্রত্যক্ষ এবং শব্দ প্রমাণে

১। ভারতের কোন কোন অংশে 'গবয়' বলতে 'নীলগাই' বোঝায়।

২। তর্ক সংগ্রহ ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। ন্যায়সূত্র ও ভাষ্য ২।১।৪২

পর্যবসিত করেন। তাঁদের ধারণা, উপমান কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়।[১] বৈশেষিক[২] এবং সাংখ্য[৩] মতাবলম্বীরাও উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে মানেন না। এঁদের মতে উপমান অনুমানেরই একটি বিশেষ রূপ। জৈনেরা[৪] উপমানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে মনে করেন। মীমাংসক[৫] ও বেদান্তীরা[৬] উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এঁদের এই প্রমাণের ব্যাখ্যা নৈয়ায়িকদের ব্যাখ্যার সঙ্গে মেলে না। মীমাংসকদের উপমান প্রমাণের ব্যাখ্যা আমরা সংক্ষিপ্তাকারে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মীমাংসা দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গেই করেছি। সুতরাং পুনরুক্তি পরিহারের জন্য সে আলোচনা আর করছি না

উপমান সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকদের মত।

শব্দ প্রমাণ

নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ একটি স্বতন্ত্রপ্রমাণ। শব্দ বা বাক্য শুনে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তারই নাম শাব্দজ্ঞান। সমস্ত শাব্দজ্ঞানই সত্য নয়। সেইজন্যই নৈয়ায়িকেরা শব্দ প্রমাণকে অভ্রান্ত শব্দজন্য জ্ঞানের উৎস বলে উল্লেখ করেছেন। আপ্তবাক্য[৭] বা বিশ্বস্ত লোকের কথা থেকেই এই জ্ঞান জন্মে। সত্যজ্ঞ ব্যক্তি যখন অন্যকে পরিচালিত করার জন্য সত্য ভাষণ করেন তখনই তাঁর বাক্য প্রামাণ্য হয়।[৮] অবশ্য কেউ সত্য বাক্য উচ্চারণ করলেই তার থেকে অন্যলোক প্রমাজ্ঞান লাভ করতে পারে না। বাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারলেই সত্যজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য থেকে সত্যজ্ঞান লাভ করা যায়, সুতরাং শাব্দজ্ঞান আপ্ত বা বিশ্বস্ত লোকের বাক্যের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি থেকে জন্মে।[৯]

শাব্দজ্ঞান বিশ্বস্ত লোকের বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি থেকেই জন্মে।

জ্ঞানের বিষয় অনুসারে শব্দ দ্বিবিধ—দৃষ্টার্থ এবং অদৃষ্টার্থ। কোন বিশ্বস্ত লোকের দৃষ্টার্থ বা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বিষয় সম্পর্কে কোন কথা থেকে যে জ্ঞান হয়, তারই নাম দৃষ্টার্থজ্ঞান। আদালতের সাক্ষীদের কথা থেকে যে জ্ঞান হয়, উদ্ভিদবিদ উদ্ভিদ সম্পর্কে যে সব বক্তব্য পেশ করেন তার ভিত্তিতে যে জ্ঞান হয়, আবহাওয়াবিদদের বৃষ্টি সম্পর্কে ঘোষণা থেকে যে জ্ঞান হয়, তা এই জাতীয় জ্ঞান। অদৃষ্টার্থ বা অপ্রত্যক্ষ বিষয় সম্পর্কে আপ্তবাক্য থেকে যে জ্ঞান হয়, তাকে বলে অদৃষ্টার্থ শাব্দজ্ঞান। বিজ্ঞানীদের পরমাণুবাদ থেকে লব্ধ জ্ঞান, পাপপুণ্য সম্পর্কে ঋষিদের বাক্য-জন্য-জ্ঞান প্রভৃতি এই জাতীয়।

জ্ঞানের বিষয় অনুসারে শব্দ দ্বিবিধ —দৃষ্টার্থ এবং অদৃষ্টার্থ।

১। ন্যায় বার্তিক ১।১।৬
২। তর্ক সংগ্রহ এবং দীপিকা ৬৩ পৃষ্ঠা
৩। তত্ত্বকৌমুদী ৫ পৃষ্ঠা
৪। প্রমেয় কমল মার্তণ্ড ; তৃতীয় অধ্যায়
৫। শাস্ত্র দীপিকা ৭৪-৭৬ পৃষ্ঠা
৬। বেদান্ত পরিভাষা, তৃতীয় অধ্যায়
৭। ন্যায়সূত্র ১।১।৭
৮। তার্কিক রক্ষা ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা।
৯। তর্ক সংগ্রহ ৭৩ পৃষ্ঠা ; ভাষা পরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলী ৮১ পৃষ্ঠা।

শব্দকে অন্য আর একটি দিক থেকেও বিভাগ করা হয়। কার বাক্যের ভিত্তিতে জ্ঞান—এই প্রশ্নের উত্তর নিয়েই এই বিভাগ। সাধারণ বিশ্বস্ত লোকের বাক্য থেকে যে জ্ঞান হয়, তার নাম লৌকিক শাব্দজ্ঞান, আর বেদ থেকে যে জ্ঞান হয় তার নাম বৈদিক শাব্দজ্ঞান। লৌকিক জ্ঞান সব সময়েই অভ্রান্ত হয় না। সাধারণ লোকের কথা মাঝে মাঝে ভুল হয়। কারণ ভুল করাই যে মানুষের স্বভাব। অবশ্য বিশ্বস্ত জ্ঞানী লোকের কথা থেকে যে লৌকিক শাব্দজ্ঞান হয়, তা সত্য ও নির্ভরযোগ্য। বৈদিক শাব্দজ্ঞানে আমরা ঈশ্বরের বাক্য পাই। কারণ, বেদ ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও পূর্ণ বলে তাঁর বাক্য-নির্ভর বৈদিক শাব্দজ্ঞান অভ্রান্ত ও বিশ্বাসযোগ্য। নৈয়ায়িকেরা অবশ্য বলেন, ঈশ্বর-বাক্য-নির্ভর জ্ঞান বা বিশ্বস্ত সাধারণ লোকের বাক্য থেকে লব্ধ জ্ঞান উভয়ই সমান প্রামাণ্য।

সাধারণ বিশ্বস্ত লোকের বাক্য থেকে যে জ্ঞান হয়, তার নাম লৌকিক শাব্দজ্ঞান, আর বেদ থেকে যে জ্ঞান হয়, তার নাম বৈদিক শাব্দজ্ঞান।

শব্দপ্রমাণে বাক্যের অর্থ থেকে জ্ঞান হয়। সুতরাং এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—বাক্যই বা কি? আর তার অর্থই বা কিভাবে বোঝা যায়? বাক্য কতকগুলো পদের বিশেষ সমাহার বোঝায়। পদ আবার কতকগুলো বর্ণের বিশেষ সমাহার প্রকাশ করে। পদের স্বরূপ বা তাৎপর্য তার অর্থেই নিহিত। পদ অর্থ বা বিষয় জানিয়ে দেয়। পদের এই বিষয় জানিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাকে 'শক্তি' বলে। এই শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ একটি পদ যে একটি নির্দিষ্ট বস্তুই বোঝায়, অন্য বস্তু বোঝায় না, তা শেষ পর্যন্ত সমস্ত রচনা ও পারিপাট্যের বিধাতা ঈশ্বরের জন্যই হয়।

একটি পদ যে একটি নির্দিষ্ট বস্তু বোঝায়, অন্য বস্তু বোঝায় না, তা শেষ পর্যন্ত সমস্ত রচনা ও পারিপাট্যের বিধাতা ঈশ্বরের জন্যই হয়।

অর্থযুক্ত পদসমষ্টিই বাক্য। অবশ্য যে কোন পদ-সমাহারই অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করে না। অর্থপূর্ণ বাক্য চারটি সর্তসাপেক্ষ—আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, সন্নিধি এবং তাৎপর্য।[১] একটি বাক্যের বিভিন্ন পদগুলো পরস্পর সম্পর্কশূন্য হতে পারে না। প্রত্যেকটি পদ অন্য পদের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে অর্থাৎ প্রত্যেকটি পদই প্রত্যেকটি পদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। বাক্যস্থিত পদগুলোর এই পারস্পরিক প্রয়োজনের নামই আকাঙ্ক্ষা। যে বাক্যের পদগুলোর অনুরূপ প্রয়োজনীয়তা নেই, সে বাক্য কখনই অর্থপূর্ণ হতে পারে না। যদি বলি খাও, তাহলে প্রশ্ন উঠবে—কি খাও? অর্থাৎ 'খাও' পদের অন্য পদের জন্য আকাঙ্ক্ষা আছে। যদি বলি ভাত খাও, তবে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় এবং অর্থপূর্ণ বাক্যও গঠিত হয়।

অর্থপূর্ণবাক্য চারটি সর্তসাপেক্ষ—আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, সন্নিধি, এবং তাৎপর্য। একটি বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ পরস্পর নির্ভরশীল। একটি ছাড়া অন্যটির অর্থ স্পষ্ট নয়। ব্যবহৃত শব্দের এই বৈশিষ্ট্যকেই আকাঙ্ক্ষা বলে।

১। তর্ক সংগ্রহ ৭২ পৃষ্ঠা, ভাষাপরিচ্ছেদ ৮২ পৃষ্ঠা

যখন বাক্যস্থিত পদগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধিতা থাকেনা এবং পদগুলো পরস্পর সুসংগত হয় তখন পদগুলোর যোগ্যতা প্রতিপন্ন হয়। বাক্যস্থিত পদের যোগ্যতা না থাকলে বাক্য কখনই অর্থপূর্ণ হয় না। যদি বলি 'অগ্নির শীতলতা উপভোগ্য, তবে বাক্যটি অর্থহীন হবে, কারণ 'অগ্নি' এবং 'শীতলতা' এই দুটো পদের যোগ্যতা নেই, অর্থাৎ অগ্নির শীতলতা সম্ভব নয়।

বাক্যস্থিত পদগুলো সুসংগত হলে পদগুলোর যোগ্যতা প্রতিপন্ন হয়।

বাক্যের পদগুলো অবশ্যই পাশাপাশি বসবে, নইলে বাক্যই হবে না। তিনটি পৃষ্ঠায়—আমি ভাত খাই, এই তিনটি শব্দ লিখলে শব্দগুলো বাক্য সৃষ্টি করতে পারে না। বাক্যের পক্ষে অপরিহার্য পদগুলোর পাশাপাশি থাকাকেই সন্নিধি বলে। অর্থপূর্ণ বাক্য সন্নিধি ভিন্ন সম্ভবই নয়।

ব্যক্যের পক্ষে অপরিহার্য পদগুলোর পাশাপাশি থাকাকে সন্নিধি বলে।

বাক্য যে অর্থ প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকেই বাক্যের তাৎপর্য বলে। একটি শব্দ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে। কোথায় শব্দটি কি অর্থ প্রকাশ করবে তা একান্তভাবেই বক্তার অভিপ্রায়ের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং বাক্যের অর্থ বোঝার জন্য বক্তা কোন্ শব্দটি কি অভিপ্রায়ে ব্যবহার করেছে, তা জানা দরকার। যদি বলা যায়—'দণ্ড গ্রহণ কর', তবে বাক্যটির অর্থ বুঝতে হলে বক্তা 'দণ্ড' বলতে 'লাঠি' না শাস্তি বুঝিয়েছেন তা জানতে হবে। সুতরাং বাক্যের অর্থ বক্তার অভিপ্রায়ের ওপরই নির্ভর করে। কাজেই বাক্যের অর্থ বুঝতে হলে বক্তার অভিপ্রায় বুঝে তার তাৎপর্য জানা একান্ত আবশ্যক। সাধারণ বাক্যের ক্ষেত্রে প্রকরণ বা প্রসঙ্গ আলোচনা করেই তার তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়। কিন্তু বৈদিক বাক্যের অর্থ উপলব্ধির জন্য মীমাংসা-নির্দিষ্ট তাৎপর্য-রীতি জানা আবশ্যক। অর্থাৎ মীমাংসা দর্শনে বেদবাক্যের তাৎপর্য উপলব্ধির যে সমস্ত রীতি বা নীতি নির্দেশ করা হয়েছে তা জানলেই বেদবাক্যের তাৎপর্য বোঝা যায়, নইলে নয়।

বাক্যের অর্থ বক্তার অভিপ্রায় বা তাৎপর্যের ওপর নির্ভর করে।

জ্ঞানের জ্ঞান এবং খ্যাতিবাদ

আমরা ন্যায়মতে প্রমা ও প্রমাণের প্রকৃতি আলোচনা করেছি। এইক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক দুটি সমস্যা আলোচনা করা দরকার। আমরা দেখেছি, ন্যায়মতে বস্তুর প্রকাশই জ্ঞানের কাজ এবং বিষয় ছাড়া জ্ঞান হয় না। এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে– জ্ঞান ত বিষয় জানে, কিন্তু জ্ঞান কি ভাবে জানা যায়? যে জ্ঞান বিষয় জানে সে জ্ঞানও কি জ্ঞানের বিষয় হয়? এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন—বিষয় ছাড়া ত জ্ঞান হয়না, কিন্তু আমাদের যে ভ্রান্তজ্ঞান হয় তার বিষয় কি? ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়ও কি প্রমাজ্ঞানের বিষয়ের মতই সাধারণ বিষয়? এই দুটি সমস্যার নৈয়ায়িক-সমাধান আমরা এখানে উপস্থাপিত করবো।

জ্ঞানের জ্ঞান কিভাবে হয় এবং ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়ের প্রকৃতি কি, এ দুটি সমস্যার আলোচনা।

ন্যায়মতে জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন, জ্ঞান বিষয় প্রকাশ করে, কিন্তু বিষয় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও প্রকাশ করে না। অর্থাৎ ন্যায়মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ নয়। কিন্তু জ্ঞান জানাই যায় না, একথাও নৈয়ায়িকেরা বলেন না। যেমন কোন বিষয় তার জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তেমনি একটি জ্ঞান তারপরে উৎপন্ন আর একটি জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়। ন্যায়মতে দ্বিতীয় জ্ঞান প্রথম জ্ঞানটিকে তার বিষয় হিসেবেই প্রকাশ করে।[১] প্রথমতঃ কোন বিষয়ের জ্ঞান বা ব্যবসায় হয় এবং পরে উৎপন্ন আর একটি জ্ঞান বা অনুব্যবসায় প্রথম জ্ঞান বা ব্যবসায়কে বিষয়রূপে জানে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে স্টাউট, লেয়ার্ড প্রভৃতি দার্শনিকেরা জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ে ন্যায়ের অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।[২] ভাট্টমীমাংসক, প্রাভাকর মীমাংসক এবং অদ্বৈতবেদান্তীরা জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ে ন্যায়মত গ্রহণ করেন না। আমরা এই সমস্ত দর্শন সম্প্রদায়ের বক্তব্য আলোচনাকালে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাদের মত আলোচনা করবো।

ন্যায়মতে জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয়। একটি জ্ঞান পরবর্তী আর একটি জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়।

ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়ের প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে নৈয়ায়িকেরা অন্যথা-খ্যাতিবাদ প্রচার করেছেন। তাঁরা বলেন, রজ্জুকে আমরা যখন ভুল করে সর্প জেনে বলি 'এই সর্প' তখন 'এই' অংশের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় এবং 'সর্পের' সঙ্গে জ্ঞানলক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ হয়। অন্য সময় অন্যত্র যে সাপ জেনেছি, সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে এখানে 'এই' অংশে সর্পের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয় এবং ফলে 'এই সর্প' এই জ্ঞান হয়। এই মতে ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় অন্যত্রস্থিত এবং অলৌকিক প্রত্যক্ষে তা ইন্দ্রিয় গোচর হয়। এই মতের নাম অন্যথাখ্যাতিবাদ। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সেমুয়েল আলেকজেণ্ডার কাছাকাছি একটি মতবাদ প্রচার করেছেন।

ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়ের প্রকৃতি প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকেরা অন্যথা-খ্যাতিবাদ প্রচার করেছেন।

জ্ঞানের পরতঃ প্রামাণ্য ও পরতঃ অপ্রামাণ্য

ন্যায়মতে জ্ঞান হলেই তা সত্য বা মিথ্যা বলে জানা যায় না এবং জানা যায় না বলেই কখনও কখনও জ্ঞান সম্বন্ধে সংশয় জাগে। যে সমস্ত কারণে জ্ঞান হয়, সে সমস্ত কারণের জন্যই জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব হয় না। এমন কি যে প্রক্রিয়া

১। তত্ত্বদীপিকা, ৩২ পৃষ্ঠা।

২। স্টাউট বলেন, 'Psychical states as such become objects only when we attend to them in an introspective way'—('A Manual of Psychology ১০৪ পৃষ্ঠা)।

লেয়ার্ড বলেন, 'Certainly our Cognitive processes are, in their usual exercise, processes with which (not at which) we look; and none of them, perhaps can look at itself. It does not follow, however, that another (introspective) look cannot be directed towards this process of looking' Contemporary British Philosophy, First Series P 229.

জ্ঞানের বস্তু-প্রকাশক প্রকৃত নির্ণয় করে তা যে প্রক্রিয়া জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করে তার থেকে ভিন্ন। সুতরাং জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব উৎপত্তি এবং প্রতিপত্তি বা উপলব্ধি উভয় দিক থেকেই পরতঃ বলে স্বীকার করতে হবে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারে। নীলবর্ণের প্রত্যক্ষরূপ ঘটনা এই প্রত্যক্ষকে সত্যে পরিণত করে না। যদি প্রত্যক্ষের মাধ্যম ইন্দ্রিয়ে কোন দোষ না থাকে, যদি সত্যতা ধর্ম বিশিষ্ট জ্ঞান সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ইন্দ্রিয়ে থাকে, তবেই উৎপন্ন প্রত্যক্ষ সত্য হয়। নীলবর্ণের প্রত্যক্ষ হলেই এই প্রত্যক্ষ নিজেকে নীলবর্ণের প্রত্যক্ষ বলেই জানে না, সুতরাং সত্য বা মিথ্যা প্রত্যক্ষরূপে নিজেকে জানার প্রশ্নই ওঠে না। এমন কথাও বলা যাবে না যে, নীলবর্ণের প্রত্যক্ষের পরে উৎপন্ন অনুব্যবসায় যেমন প্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ বলে জানে, তেমনি অনুব্যবসায় প্রত্যক্ষকে সত্য বা মিথ্যা বলেও জানে, কারণ আমাদের মানস প্রত্যক্ষ এমন কথার প্রমাণ দেয় না। নীলবর্ণের প্রত্যক্ষ কেবলমাত্র নীলবর্ণকে প্রকাশিত করতে পারে, আর কিছুই পারে না। এই প্রকাশের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করতে হলে এই প্রকাশের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় কি-না (সম্বাদী প্রবৃত্তি), তাই দেখতে হবে। যদি প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়, তবে জ্ঞান সত্য হবে, আর যদি না পাওয়া যায়, তবে জ্ঞান হবে মিথ্যা। এই আলোচনার ভিত্তিতে নৈয়ায়িকেরা বলেন, জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব উৎপত্তি ও প্রতিপত্তি উভয় দিক থেকেই পরতঃ নিষ্পন্ন।

ন্যায়মতে জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব উৎপত্তি ও প্রতিপত্তি উভয় দিক থেকেই পরতঃ নিষ্পন্ন।

প্রমেয়

এতক্ষণ ধরে আমরা ন্যায়সম্মত প্রমাণ ও প্রমা নিয়ে আলোচনা করেছি। এইবার প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয় ও তাদের বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ (মানসিক ত্রুটি), প্রেত্য ভাব (পুনর্জন্ম), ফল (সুখ-দুঃখের অনুভব), দুঃখ এবং অপবর্গই প্রমেয়। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সপ্ত পদার্থের স্বীকৃতিও ন্যায়দর্শনে পাওয়া যায়। এরা সবাই প্রমেয়ের অন্তর্গত।

আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয় ও তাদের বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্য ভাব, ফল, দুঃখ এবং অপবর্গই প্রমেয়।

ওপরে আলোচিত সমস্ত প্রমেয়ই ভৌতিকজগতের অংশ নয়। আত্মা, বুদ্ধি, মন প্রভৃতি ভৌতিক প্রকৃতির অন্তর্গত হয়। চতুর্ভূত, কাল, দেশ[১] ও আকাশ ভৌতিকজগৎ সৃষ্টি করে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ চতুর্ভূত নামে পরিচিত। দেশ ও কাল দুটি দ্রব্য, কিন্তু এরা ভৌতিক দ্রব্য নয়। তবে দেশ ও কাল ভৌতিক প্রকৃতিরই অন্তর্গত। আকাশ একটি ভৌতিকদ্রব্য।

সমস্ত প্রমেয়ই জড় নয়।

১। ভারতীয় দর্শনে 'দেশ'কে 'দিক' বলা হয়।

চতুর্ভূত ভৌতিক জগতের উপাদান কারণ। এই ভূতগুলো আবার ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুতের নিত্য ও অবিভাজ্য পরমাণুর সৃষ্টি। আকাশ, কাল, দিক্ বা দেশ নিত্য দ্রব্য। ভৌতিকজগৎ ক্ষিতি, অপ্ তেজ ও মরুৎ পরমাণুর সৃষ্টি। এই সব পরমাণুর গুণাবলী, পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি সবই জগতে বর্তমান। আকাশ ভৌতিকজগতের সঙ্গেই যুক্ত। কাল এবং দেশ যথাক্রমে ভৌতিকজগতের ঘটনা ও বস্তু ধারণ করে এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্ভব করে দেয়। এই সমস্ত ব্যাপারে নৈয়ায়িকেরা বৈশেষিক মতই গ্রহণকরেন। আমরা বৈশেষিক দর্শন আলোচনা করার সময় এই প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো।

চতুর্ভূত ভৌতিকজগতের উপাদান কারণ। এই ভূতগুলো আবার ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুতের নিত্য ও অবিভাজ্য পরমাণুর সৃষ্টি।

জীবাত্মা ও তার মুক্তি

অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতই নৈয়ায়িকেরা জীবাত্মার মুক্তিবিধানের জন্যই দর্শন চর্চা করেন। সুতরাং জীবাত্মার প্রকৃতি ও তার মুক্তি সম্বন্ধে ন্যায়মত আলোচনা করা খুবই প্রাসঙ্গিক। আমরা এখন তাই করবো।

ভারতীয় দর্শনে আত্মা সম্বন্ধে মোট চারটি বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত। চার্বাকদের মতে চৈতন্যগুণবিশিষ্ট সজীব দেহই আত্মা। চার্বাক দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে এই মত আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আত্মা সম্বন্ধে এই মতকে জড়বাদী মত বলা যায়। বৌদ্ধদের মতে আত্মা জ্ঞানপ্রবাহ বিশেষ। আত্মা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষবাদী পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক হিউমের বক্তব্যের সঙ্গে এই মতের খুবই মিল। হিউম পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতাগুলোকেই আত্মা বলেছেন। আত্মা সম্বন্ধে এই মতকে প্রত্যক্ষবাদী মত বলা যেতে পারে। অদ্বৈত বেদান্তে আত্মা অবিষয় স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ। অর্থাৎ এই মতে আত্মা জ্ঞাতা নয়, জ্ঞেয়ও নয়, জ্ঞান-স্বরূপ। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে আত্মা চৈতন্য স্বরূপ নয়, চৈতন্যগুণযুক্ত জ্ঞাতা অহমর্থপ্রকাশক (জ্ঞাতা অহমর্থ এবাত্মা)। আত্মা সম্বন্ধে বৌদ্ধ এবং অদ্বৈত এই দুটি মতকেই ব্যাপক অর্থে আধ্যাত্মিক মত বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতই নৈয়ায়িকেরা জীবাত্মার মুক্তি বিধানের জন্য দর্শন চর্চা করেন।

আত্মা সম্বন্ধে ন্যায়বৈশেষিক মতকে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ভাষায় রিয়েলিস্টিক বা বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী মত বলে অভিহিত করা যায়। নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা একটি দ্রব্য বিশেষ। চৈতন্য তার একটি আগন্তুক গুণ। আত্মা যখন দেহের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয় যখন বিষয়সংশ্লিষ্ট হয়, তখনই চৈতন্যগুণ আত্মায় আবির্ভূত হয়ে থাকে। আত্মা যখন দেহবিযুক্ত হয় তখন তাতে চৈতন্যগুণ থাকে না। বিভিন্ন দেহের বিভিন্ন আত্মা, কারণ এদের অভিজ্ঞতা এক নয়, বরং ভিন্ন। আত্মা নিত্য ও অমর। আত্মা দেশ-কালের দ্বারা সীমিতও নয়। সুতরাং তাকে বিভু বলা যেতে পারে।[১]

ভারতীয় দর্শনে আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।

ন্যায়মতে আত্মা একটি নিত্য ও বিভু দ্রব্য। চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ।

১ ন্যায় ভাষ্য ১।১।১০, পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ ৩০ পৃষ্ঠার পাদটীকা, তর্কভাষা ১৮-১৯ পৃষ্ঠা।

আত্মা ও দেহ কখনও অভিন্ন হতে পারে না। আত্মা চেতন, দেহ অচেতন। চেতন ও অচেতন কি কখনও এক হতে পারে? বাহ্যেন্দ্রিয় স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তা প্রভৃতির কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না। সুতরাং বাহ্যেন্দ্রিয় আত্মা নয়। অন্তরিন্দ্রিয় বা মনও আত্মা হতে পারে না। ন্যায়বৈশেষিক মতে মন অণুপরিমাণ, সুতরাং প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। তা হলে সুখ, দুঃখ প্রভৃতি তথাকথিত মানসিক অবস্থাও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হবে না। কিন্তু সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা ত আমাদের হামেশাই হয়। বৌদ্ধদের মত আত্মাকে জ্ঞানপ্রবাহ মনে করলে স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞার কোন ব্যাখ্যা মেলে না। অপরিবর্তিত আত্মা বলে যদি কিছু না থাকে তা হলে পূর্বপ্রত্যক্ষীকৃত বস্তুর স্মরণ হবে কি করে? অথবা পূর্বে যে জিনিস জেনেছি তা আবার দেখলে তাকে পূর্বজ্ঞাত বলে (প্রত্যভিজ্ঞ) চিনবো কি করে? সুতরাং আত্মা সম্বন্ধে বৌদ্ধমত গ্রাহ্য নয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন, অদ্বৈতবেদান্তীদের অবিষয় ও অবিষয়ী চৈতন্যস্বরূপ আত্মাও অবোধ্য ব্যাপার। কোন বিষয়ী এবং বিষয়-এর সঙ্গে যুক্ত না হয়ে চৈতন্য কি করে থাকতে পারে, তা বোঝা যায় না। চৈতন্য সবসময়েই কোন না কোন জ্ঞাতার (বিষয়ীর) কোন না কোন বিষয় সম্বন্ধে চৈতন্য। অধিষ্ঠান বা আধার ছাড়া চৈতন্য থাকতে পারে না। সেইজন্যই নৈয়ায়িকেরা আত্মা বলতে চৈতন্যগুণবিশিষ্ট একটি দ্রব্য বোঝেন। আত্মা জ্ঞাতা, অহংবোধের আশ্রয় এবং ভোক্তা।[১]

আত্মা দেহ, বাহ্যেন্দ্রিয় বা মন নয়। আত্মা জ্ঞাতা, অহঙ্কারের আশ্রয় ও ভোক্তা।

চৈতন্য আত্মার গুণ হলেও অপরিহার্য বা স্বরূপগত গুণ নয়, আগুন্তক গুণ। পূর্বেই বলেছি, আত্মা যখন দেহের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং দেহের ইন্দ্রিয়গুলো যখন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় তখনই আত্মাতে চৈতন্য-গুণের আবির্ভাব ঘটে[২]; নইলে আত্মাতে চৈতন্য থাকে না। দেহবিযুক্ত আত্মার চৈতন্য নেই।

চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ।

এখানে প্রশ্ন উঠবে—দেহ, মন ও বাহ্যেন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন জীবাত্মার অস্তিত্ব আমরা জানি কি করে? কোন কোন প্রাচীন নৈয়ায়িক বলেন[৩] আত্মার কোন প্রত্যক্ষজ্ঞানই সম্ভব নয়। এঁদের মতে আত্মার অস্তিত্ব হয় শাস্ত্র প্রমাণ থেকে নয়ত রাগ, দ্বেষ, সুখ-দুঃখের অনুভূতি বা জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুমান করে জানা যায়। আমাদের যে রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি রয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করলে এদের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কোন বস্তু উপাদেয় বলে মনে করলেই সেই বস্তু সম্বন্ধে আকর্ষণ (রাগ) স্বাভাবিক। কিন্তু বস্তুটি যে উপাদেয় তা আমরা জানি কি করে? বস্তুর ভোগ না হলে ত তাকে উপাদেয় বলে জানা যায় না। সুতরাং এইক্ষেত্রে অতীতে আমরা যে সমস্ত জিনিস ভোগ করে খুশী হয়েছি তাদেরই অনুরূপ বলে এই

১। ভাষা পরিচ্ছেদ এবং মুক্তাবলী ৪৮-৫০ পৃষ্ঠা।

২। বার্তিক ২।১।২২ ; ন্যায় মঞ্জরী ৪৩২ পৃষ্ঠা।

৩। ন্যায় ভাষ্য ১।১।৯-১০

বস্তু উপাদেয় হবে, এরকম ভাবছি। তাহলে স্থায়ী আত্মা স্বীকার না করলে অতীতে যে সমস্ত জিনিস ভোগ করেছি তা স্মরণ করে বর্তমানের জিনিসটি তাদেরই অনুরূপ একথা মনে করবে কে? সুতরাং বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বা রাগ ত স্থায়ী আত্মা স্বীকার না করলে বোঝাই যাবে না। অনুরূপভাবে দ্বেষ বা বিরাগ ব্যাখ্যা করতে হলেও স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব মেনে নিতে হবে। অতীতে যে বস্তু সুখ বা দুঃখ দিয়েছে তার স্মরণ হলেই ত বর্তমানে সুখ বা দুঃখের অনুভব হয়। অতীতের কোন জ্যোৎস্নারাত্রে জীবনের কোন স্মরণীয় আনন্দোৎসব যদি হয়ে থাকে, তবে আজকের কোন জ্যোৎস্না রাত্রি সেই স্মৃতির জন্যই কি সুখ দেবে না? এইক্ষেত্রে মধুস্মৃতির জন্যই ত সুখানুভব। দুঃখানুভূতি বিপরীতভাবে ব্যথার স্মৃতি থেকে হতে পারে। স্মৃতি ত স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব না মানলে ব্যাখ্যা করা যায় না। একথা আমরা আগেই বলেছি। সুতরাং সুখদুঃখানুভবের ব্যাখ্যার জন্যও স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করতে হয়। চিন্তাও স্থায়ী আত্মা ভিন্ন সম্ভব নয়। কারণ চিন্তা করতে হলে প্রথমতঃ কিছু জানবার আকাজ্ক্ষা পোষণ করতে হবে, তারপর সেই বিষয় সম্বন্ধে ভাবতে হবে এবং সর্বশেষে সেই বিষয়ে জ্ঞান হবে। স্থায়ী আত্মা না থাকলে এসব করবে কে? দেহ, ইন্দ্রিয় বা মন রাগ, দ্বেষ, সুখদুঃখানুভূতি, চিন্তা প্রভৃতি কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারে না। যেমন একজন মানুষের অভিজ্ঞতা অন্য আর একজন মানুষ স্মরণ করতে পারে না, তেমনি দেহ, ইন্দ্রিয় বা মনের বর্তমান অবস্থা তাদের অতীতের অবস্থা স্মরণ করতে পারে না, কিন্তু এই স্মরণ ভিন্ন আমরা পূর্বেই দেখেছি রাগ, দ্বেষ, সুখ-দুঃখ এবং চিন্তা ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন ভিন্ন স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই।[১]

প্রাচীন ন্যায়মতে আত্মার অস্তিত্ব হয় শাস্ত্র প্রমাণ থেকে, নয়ত রাগ, দ্বেষ, সুখ-দুঃখের অনুভূতি বা জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে অনুমান করে জানা যায়।

নব্যনৈয়ায়িকেরা বলেন, মানস প্রত্যক্ষেই আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়। অবশ্য কেউ যদি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে বা এই বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে, তবে প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা যে ভাবে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করে প্রমাণ করেছেন সেইরূপই করতে হবে। মনের সঙ্গে শুদ্ধ আত্মার[২] সন্নিকর্ষ হলেই আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হতে পারে এবং এই জ্ঞান 'অহম্ অস্মি' (আমি আছি) এই বাক্যে আমরা প্রকাশ করি। অনেক নৈয়ায়িক অবশ্য এরকম প্রত্যক্ষে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন, শুদ্ধ আত্মা কখনই জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। কোন না কোন চেতন অবস্থার ভিত্তিতে চৈতন্যের অধিষ্ঠান বা আধার আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। রঙ, আকার প্রভৃতি গুণ প্রত্যক্ষ করলেই যেমন এদের আধার আপেল বা এই

নব্যন্যায় মতে মানস প্রত্যক্ষে আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়। তবে কেউ যদি আত্মার অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করে তবে প্রাচীন ন্যায় আত্মার অস্তিত্ব যেভাবে অনুমান করে প্রমাণ করেছেন, সেভাবেই করতে হবে।

১। ভাষ্য ১।১।১০

২। শুদ্ধ আত্মা বলতে চৈতন্যগুণ রহিত আত্মাকে বুঝতে হবে।

জাতীয় জিনিস প্রত্যক্ষ করা হয়, তেমনই সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেই এদের আধার আত্মার প্রত্যক্ষ হয় এবং এই প্রত্যক্ষজ্ঞান আমরা 'আমি সুখী,' 'আমি দুঃখী' প্রভৃতি বাক্যাকারে প্রকাশ করি। নিজের আত্মা প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু অন্যের আত্মা ত প্রত্যক্ষ করা যায় না। তবে আমরা অন্যের আত্মার অস্তিত্ব জানি কি করে? এই প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকেরা বলেন, অন্যদের বুদ্ধিমানের মত দৈহিক ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে তাদের আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। নির্বোধ জড়দেহ ত এই জাতীয় ক্রিয়া করতে পারে না। একমাত্র সচেতন আত্মার পক্ষেই বুদ্ধিমানের মত দৈহিক ক্রিয়া করা সম্ভব।[১]

জীবাত্মার মুক্তির জন্যই ত দর্শন। সুতরাং এইবার প্রশ্ন উঠবে—ন্যায়দর্শনে জীবাত্মার মুক্তি বলতে কি বোঝায়? নৈয়ায়িকেরা বলেন, জীবনের সমস্ত দুঃখ-দুর্গতি থেকে অব্যাহতি প্রাপ্তিই মুক্তি; দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই অপবর্গ। এই অবস্থায় আত্মা দেহ এবং ইন্দ্রিয় থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে পড়ে। যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণ আত্মার পক্ষে দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ অসম্ভব। দেহ থাকলেই ইন্দ্রিয় বিভিন্ন বিষয়াভিমুখে ধাবিত হবেই এবং ফলে নানা রকমের দুঃখ অনিবার্য। সুতরাং দেহ[২] ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলেই আত্মার মুক্তি সম্ভব। আত্মা যখন দেহ থেকে বিচ্যুত হয় তখন তার যে শুধু দুঃখ থাকে না তা নয়, সুখও থাকে না, এমন কি কোন প্রকারের চৈতন্যই থাকে না।[৩] কারণ আমরা পূর্বেই দেখেছি নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা দেহযুক্ত হলেই তাতে চৈতন্যগুণের আবির্ভাব ঘটে, দেহবিযুক্ত আত্মার চৈতন্য নেই। সুতরাং মুক্ত অবস্থায় আত্মার সুখ, দুঃখ এমন কি চৈতন্য পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায় এবং আত্মা তখন হৃতগুণ একটি দ্রব্যরূপে অবস্থিত থাকে। এই অবস্থাকেই শাস্ত্রকারেরা 'অভয়ম্, অজরম্, অমৃত্যুপদম্' প্রভৃতি বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই অপবর্গ। মুক্ত অবস্থায় আত্মা অচেতন হয়ে যায়। তার সুখ-দুঃখ কিছুই থাকে না।

এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে—মুক্ত অবস্থায় আত্মা যদি সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য হারিয়ে ফেলে, তবে মুক্ত হয়ে এই অচেতন[৫] অবস্থা পেতে চাইবে কে? লোকের মুক্তিলাভের জন্য আদৌ কোন প্রচেষ্টা হবে কেন? এই সমস্যার উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন, প্রচণ্ড ব্যথায় কাতর রোগী যেমন ঔষধ সেবনে অচেতন হয়ে থাকাকেই ব্যথার চেয়ে শ্রেয় মনে করে, তেমনই সংসারের দারুণ দহন জ্বালায় কাতর মানুষ দুঃখভোগের চেয়ে মুক্তি পেয়ে অচেতন হয়ে থাকাকেই অভিপ্রেত বলে মনে করে। সুতরাং মুক্তির প্রতি লোকের ঐকান্তিকতা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়, একান্ত স্বাভাবিক ও সম্ভব।

মুক্ত আত্মা যদি চৈতন্য হারায়, তবে এ অচেতন অবস্থা চাইবে কে? এই শঙ্কার নিরসন।

১। তর্কভাষা ৬ পৃষ্ঠা, তর্ক কৌমুদী ৮ পৃষ্ঠা, ভাষা পরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলী ৪৭-৫০।

২। দেহ বলতে স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই দেহই বুঝতে হবে।

৩। পরবর্তীকালের কোন কোন নৈয়ায়িক মুক্ত অবস্থা শুধু যে দুঃখহীন অবস্থা নয়, পরম আনন্দের অবস্থা তাও উল্লেখ করেছেন। তবে এই মত অধিকাংশ নৈয়ায়িকই স্বীকার করেন না।

৪। ভাষ্য ১।১।২২

৫। অচেতন বলতে সম্পূর্ণ অচেতন বোঝান হচ্ছে না। আত্মার চেতন যোগ্যতা আছে।

মুক্তিলাভের জন্য তত্ত্বজ্ঞান অর্জন প্রয়োজন। আত্মা এবং অন্যান্য প্রমেয় সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। মুমুক্ষু ব্যক্তিকে আত্মা যে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন থেকে ভিন্ন, একথা জানতে হবে। এই জ্ঞান লাভের জন্য সর্বপ্রথম শাস্ত্রের নির্দেশ **শ্রবণ** করতে হয়। তারপর **মনন** করে শাস্ত্রের নির্দেশের যৌক্তিকতা নির্ণয় করা দরকার এবং সর্বশেষে কোন সাধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মার নিবিষ্টচিত্ত হওয়া বা আত্মার **নিদিধ্যাসন** করা প্রয়োজন। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মুমুক্ষুকে যথার্থ আত্মজ্ঞানলাভে সাহায্য করে। আত্মসাক্ষাৎকারের সঙ্গেই 'আত্মা দেহ, মন বা ইন্দ্রিয়' এই মিথ্যা জ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আর কখনই প্রবৃত্তির দাস হন না। এইরূপে কোন মানুষ যখন প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয় তখন তৎকালে কৃত নিষ্কাম কর্মের ফলভোগ আর তাকে করতে হয় না। তার প্রাক্তন কর্ম সমস্ত ফলপ্রদান সম্পন্ন করলেই তাকে আর জন্ম পরিগ্রহও করতে হয় না। পুনর্জন্ম নাশ হলেই দেহের সঙ্গে আত্মার আর সংযোগের প্রশ্ন ওঠে না, ফলে সমস্ত দুঃখ দূর হয় এবং জীব মুক্তিলাভ করে। এই মুক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ।

আত্মা এবং অন্যান্য প্রমেয় সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান হলে মুক্তি লাভ হয়।

ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরবাদ

গৌতমের ন্যায়সূত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।[১] বৈশেষিক সূত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুরূপ সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে ভাষ্যকারেরা কোন কোন বৈশেষিক সূত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্দেশ করে বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[২] কিন্তু পরবর্তীকালের ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকেরা ঈশ্বর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কৃপালাভ অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছেন। এঁদের মতে জীব ঈশ্বরের অনুগ্রহেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে মুক্ত হতে পারে। ঈশ্বর কৃপা না করলে তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব। আমরা মুক্তি সম্বন্ধে ন্যায়মত পূর্বেই আলোচনা করেছি, এইবার ঈশ্বর সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদের বক্তব্য আলোচনা করবো। এই আলোচনা দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ। আমরা এখন ঈশ্বরের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করছি, পরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করবো।

নৈয়ায়িকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে ন্যায়মত ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ, এই দু'ভাগে আলোচনা করা যায়।

ঈশ্বরের প্রকৃতি

ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক। তিনি শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি করেন না। নিত্য পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ, মন ও আত্মার সাহায্যেই করেন। ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ ন'ন, তিনি নিমিত্ত কারণ। নিত্য দ্রব্যগুলোকে বিন্যস্ত করাই তাঁর

১। ন্যায়সূত্র ৪।১।১৯—২১ দ্রষ্টব্য।

২। বৈশেষিক সূত্র ২।১।১৭-১৯ দ্রষ্টব্য

কাজ। জগতের বিন্যাস এমনভাবে করা হয় যাতে প্রত্যেক আত্মা কর্মানুসারে ফল পেতে পারে এবং জীবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ সম্যকভাবে রূপায়িত হয়। ঈশ্বর জগতের নিয়ামক, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জগতের স্থিতি। নৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন হলেই তিনি জগতের সংহারের ব্যবস্থা করেন। সুতরাং তিনি জগতের শুধু স্রষ্টা ও রক্ষকই ন'ন, সংহারকও।

ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক।

ঈশ্বর এক, নিত্য ও অসীম। দেশ, কাল, মন ও আত্মা নিয়ে যে জগৎ তা ঈশ্বরকে সীমিত করে না। এই জগৎ তাঁর দেহ এবং তিনি এই দেহস্থিত আত্মাস্বরূপ। তিনি সর্বক্ষম, তবে মানুষের কর্মানুসারে যথাযথ ফলপ্রাপ্তি সঙ্গত বলেই তিনি কর্মের নিয়ম লঙ্ঘন করেন না। অর্থাৎ কর্মানুসারে পাপীর শাস্তির ব্যবস্থা করেন এবং পুণ্যবানের সুখবিধান করেন। সমস্ত কিছুরই যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী বলে তিনি সর্বজ্ঞ। সমস্ত কিছুই তিনি সব সময়ই জানেন বলে তাঁকে নিত্য চৈতন্যের অধিকারী বলা হয়। নিত্য চৈতন্য ঈশ্বরের স্বরূপ নয়, অপরিহার্য গুণ। তিনি মহিমা, গরিমা প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্যের অধিকারী।[১]

ঈশ্বর এক, নিত্য ও অসীম।

ঈশ্বর জগতের যেমন নিমিত্ত কারণ তেমনি জীবের সমস্ত কর্মের প্রযোজক কর্তা। কোন প্রাণীই তাঁর কাজ-কারবারে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। সে ঈশ্বরের নির্দেশে ও নিয়ন্ত্রণাধীনেই কাজ করে থাকে। সুতরাং কর্মে জীবের আংশিক স্বাধীনতা মাত্র স্বীকৃত। বিজ্ঞ, বিবেচক ও স্নেহশীল পিতা যেমন পুত্রের ক্ষমতা এবং কৃতকর্মের দক্ষতা অনুসারে তাকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দেন তেমনই ঈশ্বর জীবের অতীত কর্মানুসারে তাকে বর্তমান কর্মে নিযুক্ত করেন এবং তার প্রাপ্য কর্মফল প্রদান করেন। মানুষ তার কর্মের নিমিত্ত কারণ আর ঈশ্বর তার সমস্ত কর্মেরই প্রযোজক কর্তা। সুতরাং ঈশ্বরই আমাদের কর্মফলদাতা এবং সুখ-দুঃখের একমাত্র বিধাতা।[২]

ঈশ্বর জগতের যেমন নিমিত্ত কারণ তেমনি জীবের সমস্ত কর্মের প্রযোজক কর্তা।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ

ঈশ্বরের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হল। এইবার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যাঁরা নিরীশ্বরবাদী তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণই নেই বলে মনে করেন। ঈশ্বরবাদীদের পক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এইদিক থেকে ঈশ্বরবাদী নৈয়ায়িকদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ নিশ্চয়ই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

নিরীশ্বরবাদীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই বলে মনে করেন। ঈশ্বরবাদীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন।

১। ষড়দর্শন প্রথম পরিচ্ছেদ, কুসুমাঞ্জলি ৫

২। ন্যায় ভাষ্য ৪।১।২১

ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের দশটি প্রমাণ দাখিল করেছেন। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা ঈশ্বরের যে সমস্ত প্রমাণ দিয়েছেন তার সবগুলোই এই দশটি প্রমাণের অন্তর্ভূত হয়েছে। নৈয়ায়িকদের পক্ষে এটা গর্বের কথাই বটে। আমরা এখানে দশটি প্রমাণই আলোচনা না করে মুখ্য প্রমাণ গুলোই শুধু আলোচনা করবো।

(১) কার্যকারণ সম্পর্কিত প্রমাণ

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কার্যকারণ সম্পর্কিত প্রমাণ আলোচনার পূর্বে ন্যায় দর্শনে কারণ ও কার্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা আলোচনা করা যেতে পারে। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে কারণ সম্বন্ধে বলেছেন—'কার্যনিয়তপূর্ববৃত্তি কারণম্'। কার্যের যা নিয়ত পূর্ববৃত্তি, অর্থাৎ, যা নিয়ত কার্যের পূর্বে ঘটে, তাই কারণ। যে কোন নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ বললে দিনকে রাত্রির কারণ বলতে হয়। সেইজন্যই তর্কসংগ্রহের ভাষ্য দীপিকায় 'অনন্যথাসিদ্ধ' কথাটি কারণের সংজ্ঞার্থে উহ্য আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে পূর্ববর্তী ঘটনা ছাড়া পরবর্তী ঘটনা কখনই সিদ্ধ হয় না সেরূপ পূর্ববর্তী ঘটনা, পরবর্তী ঘটনার কারণ। কার্যকে তর্কসংগ্রহে 'প্রাগভাব প্রতিযোগী' বলা হয়েছে। কথাটার অর্থ এই যে, যে জিনিস পূর্বে ছিল না, পরে উৎপন্ন হয়েছে তাই কার্য। পট উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে পটের প্রাগভাব থাকে। এই প্রাগভাবের প্রতিযোগী পট। সুতরাং নতুন উৎপন্ন পট পটের প্রাগভাবের প্রতিযোগী। এই পটই কার্য। ন্যায়মতে কার্য নতুন উৎপন্ন জিনিস এবং কারণে কার্যের কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই মতকে অসৎকার্যবাদ বা আরম্ভবাদ বলা হয়। আমরা এই মতবাদ বৈশেষিক দর্শনে জগৎ-সৃষ্টি ও প্রলয় আলোচনাকালে এবং সাংখ্য দর্শনে কার্য-কারণ সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করবো।

অনন্যথা সিদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা।

ন্যায়মতে কারণ ত্রিবিধ—সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত। সমবায়ী কারণ সম্বন্ধে তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে—'যৎ সমবেতং কার্যমুৎপদ্যতে তৎ সমবায়ী কারণম্'। সমবায়ী কারণ তাকেই বলে যাতে সমবেত হয়ে কার্য উৎপন্ন হয়। বস্ত্রের সমবায়ী কারণ সূত্র, আবার বর্ণ প্রভৃতি বস্ত্রে সমবেত গুণের সমবায়ী কারণ বস্ত্র। অসমবায়ী কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন—'কার্যেন কারণেন বা সহৈকস্মিন্নর্থে সমবেতত্বে সতি যৎ কারণম্ তদসমবায়ী কারণম্'। সমবায়ী কারণে অবস্থিত থেকে যা কার্য উৎপন্ন করে তা-ই অসমবায়ী কারণ। এই অসমবায়ী কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যের সঙ্গে একই অধিকরণে অবস্থান করে। যেমন, দুটি কপালের সংযোগ ঘটের অসমবায়ী কারণ। এখানে সংযোগ ও ঘট উভয়ই কপালরূপ একটি অধিকরণে অবস্থিত। আর এক প্রকার অসমবায়ী কারণ কার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে একই অধিকরণে থাকে না, কিন্তু কার্যের যা সমবায়ী কারণ তার সঙ্গে একই অধিকরণে থাকে। যেমন সুতোর রঙ কাপড়ের রঙের অসমবায়ী কারণ। এখানে সুতোর রঙ সুতোতে আছে কিন্তু তার কার্য কাপড়ের রঙ সুতোতে নেই, কাপড়ে আছে। কাপড়ের রঙের সমবায়ী কারণ কাপড় সুতোতে আছে, সুতোর রঙও সুতোতে আছে। সমবায়ী ও অসমবায়ী ভিন্ন

কারণকে তর্ক সংগ্রহে নিমিত্ত কারণ বলা হয়েছে (তদুভয়ভিন্নং কারণং নিমিত্ত কারণম্)। এই অর্থে তাঁতির যন্ত্রপাতি বস্ত্রের নিমিত্ত কারণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেযোগ্য, ন্যায়-বৈশেষিক মতে পদার্থ দ্বিবিধ—ভাব ও অভাব। ভাবপদার্থের উৎপত্তি প্রসঙ্গে সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণের আবশ্যকতা। বস্ত্র ভাবপদার্থ। এর ত্রিবিধ কারণের কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু অভাব পদার্থের ক্ষেত্রে একমাত্র নিমিত্ত কারণই যথেষ্ট। একমাত্র লগুড়ের দ্বারাই ঘটধ্বংস সম্ভব।

অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকেরা উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ—এই দ্বিবিধ কারণমাত্র স্বীকার করেছেন। সমস্ত উপাদান কারণ সমবায়ী কারণ, কিন্তু সমস্ত সমবায়ী কারণ উপাদান কারণ নয়। অর্থাৎ সমবায়ী কারণ উপাদান কারণ থেকে ব্যাপকতর তাৎপর্য প্রকাশ করে। ন্যায়মতে দ্রব্য গুণের সমবায়ী কারণ, কিন্তু দ্রব্য গুণের উপাদান কারণ হতে পারে না।

এবার আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কার্য-কারণ সম্পর্কিত প্রমাণ আলোচনা করবো। নৈয়ায়িকেরা বলেন, জগতে অসংখ্য সাবয়ব দ্রব্য রয়েছে। এরা সকলেই ঘটের মত কার্যস্বভাব। সুতরাং এসমস্ত দ্রব্যের নিশ্চয়ই কোন নিমিত্ত কারণ থাকবে।

নৈয়ায়িকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দশটি প্রমাণ দিয়েছেন। মুখ্য প্রমাণগুলো আমরা আলোচনা করবো।

জগতের এই সমস্ত দ্রব্যই যে কার্য তার প্রমাণ, প্রথমতঃ এরা সাবয়ব (অবয়ব যুক্ত) এবং দ্বিতীয়তঃ এরা অবান্তর মহত্ত্বযুক্ত (সীমিত পরিমাপ বিশিষ্ট)। দেশ, কাল, আকাশ, আত্মা সাবয়ব নয়, সেইজন্য কার্যও নয়। এরা নিত্য দ্রব্য ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ ও মরুৎ পরমাণু এবং মন কার্য নয়, কারণ এরা অবিভাজ্য এবং অণু-পরিমাণ। এ ছাড়া, সমুদ্র, পর্বত, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি জগতের সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যই কার্য। কতকগুলো উপাদান কারণের একত্র সমাবেশের ফলেই এই সমস্ত কার্যের উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং এই সমস্ত কার্যের কারণ সমবায়ের জন্য নিশ্চয়ই একজন কর্তা আছেন। এই কর্তা ভিন্ন উপাদান কারণগুলোকে একত্র করে এই সমস্ত সুশৃঙ্খল সুন্দর দ্রব্যগুলো তৈরি করবে কে ?

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ।

এই কর্তার উপাদান কারণ পরমাণুর জ্ঞান, কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইচ্ছা (বিকীর্ষা) এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্ষমতা (কৃতি) নিশ্চয়ই থাকবে। তিনি সর্বজ্ঞও হবেন, কারণ তা না হলে পরমাণুর মত সূক্ষ্মবস্তুর জ্ঞান কিছুতেই তিনি পাবেন না। সুতরাং এই কর্তা ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউই হতে পারেন না।[১]

এই বিষয়ে ন্যায়মত এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মত পার্থক্য।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কার্যকারণ সম্পর্কিত প্রমাণ পাশ্চাত্য দর্শনেও পাওয়া যায়। পল জেনেট[২], হারমান লোটজা[৩], জেমস্ মার্টিনিউ[৪] প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা অনেকটা এই প্রমাণ ব্যবহার করেছেন। তবে এই বিষয়ে নৈয়ায়িকদের সঙ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের তফাৎ

১। কুসুমাঞ্জলি ৫ ; তর্ক সংগ্রহ এবং দীপিকা ২১-২২

২। Final Cause, Book I. Chapter I.

৩। Outlines of Philosophy of Religion প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়

৪। A Study of Religion, Book II, Chapter I.

এই যে, ন্যায়মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নন ; কিন্তু অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত এবং শঙ্কর প্রভৃতি ভারতীয় দার্শনিকের মতেই ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ দুইই।

(২) 'অদৃষ্ট' ভিত্তিক প্রমাণ

জগতে সবাই এক রকম অবস্থার অধিকারী নয়। কেউ ধনী, কেউ নির্ধন ; কেউ পণ্ডিত, কেউ মূর্খ ; কেউ সুখী, কেউ দুঃখী। কিন্তু এই পার্থক্যের কারণ কি ? কোন কার্যই ত কারণ ছাড়া হয় না। সর্বজন স্বীকৃত কার্যকারণ নীতির এই ত নির্দেশ। সুতরাং এই পার্থক্যেরও কারণ আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থাই তার হয় এই জন্মকৃত অথবা পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল। আমরা এই জীবনের সুখ বা দুঃখ আমাদের সুকর্ম বা দুষ্কর্মের ফল হিসেবেই পাই। যে নৈতিক নিয়ম আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, তার নাম কর্মনীতি। এই নীতি অনুসারে শুভ-কর্মের জন্য পুরস্কার এবং অশুভ কর্মের জন্য তিরস্কার অবশ্যই পেতে হয়।

যে নৈতিক নিয়ম আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম কর্মনীতি। এই নীতি অনুসারে কর্ম-ফল অবশ্যম্ভাবী।

এখন প্রশ্ন হল—আমাদের কর্ম বহুবৎসর ব্যবধানে কি করে ফল দেয়। পূর্বজন্মে যে কাজ করেছি, এতদিন বাদে এই জন্মে তার ফল পাব কি করে ? এই জন্মেও যে কাজ করি, তার ফল ত সঙ্গে সঙ্গে পাই না। যৌবনের অপকর্মের ফল হয়ত বার্দ্ধক্যে নানাবিধ জ্বালায় মেলে। সেইজন্যই বলা হয়, শুভকর্ম এবং অশুভকর্ম যথাক্রমে পুণ্য এবং পাপের সংস্কার সৃষ্টি করে ; কর্ম শেষ হয়ে গেলেও সংস্কার শেষ হয় না। শুভ এবং অশুভ কর্মজাত পাপ এবং পুণ্যের সংস্কার সমষ্টিকে দার্শনিক পরিভাষায় 'অদৃষ্ট' বলা হয়। পাপ এবং পুণ্যের ধারণা যেমন সহজবোধ্য, পাপ-পুণ্যের সংস্কার-সমষ্টি 'অদৃষ্ট'-এর ধারণাও তেমনই দুর্বোধ্য নয়। সাধারণ লোক 'অদৃষ্ট' কথাটির তাৎপর্য বোঝেনা বলেই এটা একটা অযৌক্তিক ব্যাপার, এমন ধারণা অনেকের জন্মেছে। কথাটির নিহিতার্থ সম্যক প্রচারিত হলেই এসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে। কল্যাণকর্ম মানুষকে যেমন উন্নত করে, অকল্যাণকর্ম তেমনি তাকে অবনত করে। মানুষের অদৃষ্ট মানুষেরই কর্মসৃষ্ট। আমাদের কর্মের জন্যই আমরা জীবনের সুখঃদুঃখের নাগর দোলায় দুলি।

আমাদের কর্ম-ফল অদৃষ্টরূপে সঞ্চিত থাকে।

এখানে আবার প্রশ্ন উঠবে—অদৃষ্ট কর্মের যথাযথ ফল কিভাবে প্রদান করে ? অদৃষ্ট অচেতন। অচেতনের পক্ষে বুদ্ধিমানের মত যার যতটুকু প্রাপ্য তাকে ঠিক ততটুকুই দেওয়া কি সম্ভব ? সেইজন্যই বলা হয়েছে, অচেতন অদৃষ্টকে নিশ্চয়ই কোন সচেতন কর্তা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং ফলে সবাই সকলের প্রাপ্য যথানির্দিষ্টভাবে পায়। কে এই সচেতন কর্তা ? নিশ্চয়ই জীবাত্মা নয়, কারণ জীব নিজের অদৃষ্ট জানে না এবং স্বেচ্ছায় সে তার অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণও করতে পারে না। খারাপ কাজ করে ভাল ফল পাওয়ার প্রত্যাশায় অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করা কি সম্ভব ? সেইজন্যই বলা হয়েছে, অদৃষ্টের নিয়ন্তা সর্বজ্ঞ ও সর্ব-শক্তিমান পরমাত্মা বা ঈশ্বর। ঈশ্বর আমাদের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করে যার যা প্রাপ্য তাকে

অদৃষ্ট অচেতন। তা হলে অদৃষ্ট কর্মের যথাযথ ফল কি ভাবে প্রদান করে ? অদৃষ্টের নিয়ন্তা সর্বজ্ঞ ও সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর। ঈশ্বরই অদৃষ্টানুসারে জীবকে কর্মফল দান করেন।

তা মিটিয়ে দেন; পুণ্যাত্মাকে দেন সুখ, পাপীকে দেন দুঃখ। পাশ্চাত্য দর্শনে কাণ্ট অনুরূপভাবেই বলেন, ঈশ্বর পুণ্যের সঙ্গে সুখ এবং পাপের সঙ্গে দুঃখ অনিবার্যভাবে মিলিয়ে দেন। রাজা যেমন কর্মানুসারে প্রজাদের পুরস্কার বা শাস্তি দেন, রাজার রাজা ঈশ্বর তেমনই সুকর্মের জন্য জীবকে দেন শান্তি ও সুখভোগ, দুষ্কর্মের জন্য অশান্তি ও দুর্ভোগ।[১]

(৩) বেদের ভিত্তি হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ

বেদ প্রামাণ্য । কিন্তু কেন? বেদ রচয়িতার প্রামাণ্যের জন্যই বেদের প্রামাণ্য। বেদ রচয়িতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

বেদ প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু বেদপ্রামাণ্যের ভিত্তি কি? অর্থাৎ বেদ প্রমাণ হল কেন? নৈয়ায়িকদের মতে রচয়িতার প্রামাণ্যের জন্যই (আপ্ত প্রামাণ্য) বেদ প্রামাণ্য। যে কোন বিজ্ঞানই বিজ্ঞানীদের প্রামাণ্যের জন্যই প্রমাণ। অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের আমরা বিশ্বাস করি বলেই তাঁদের বিজ্ঞানকেও বিশ্বাস করি। তেমনই বেদকে যে বিশ্বাস করি তার কারণ বেদের রচয়িতা অত্যন্ত প্রামাণ্য এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি। কোন বিজ্ঞানের কতকগুলো অংশ পরীক্ষা করেই আমরা সমগ্র বিজ্ঞানের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করি। অনুরূপভাবে জাগতিকবস্তু ও ব্যবহার সম্পর্কে বৈদিক নির্দেশের সত্যতা প্রত্যক্ষ করে আমরা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার সম্পর্কেও বেদের বক্তব্য প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করি। এখন প্রশ্ন হল—বেদের রচয়িতা কে? কে সেই পুরুষ যার জন্য বেদ এমন বিশ্বাসযোগ্য ও প্রামাণ্য? জীব ত বেদের স্রষ্টা হতে পারেন না। কারণ, অতীন্দ্রিয় অপার্থিব বিভিন্ন ব্যাপারে বেদের যে সমস্ত নির্দেশ আছে তা ত সসীম সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে পারে না। সুতরাং বেদস্রষ্টা ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, সসীম-অসীম অণুপরিমাণ, ইন্দ্রিয়লব্ধ এবং অতীন্দ্রিয় সমস্ত কিছুরই সুস্পষ্ট সাক্ষাৎ জ্ঞানের অধিকারী হবেন। এই অধিকারী ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। সুতরাং বেদস্রষ্টা ঈশ্বর।[২] বেদের প্রামাণ্যের উৎস হিসেবে ঈশ্বরেরও প্রামাণ্য স্বীকার করতে আমরা বাধ্য।

(৪) ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বেদপ্রমাণ

বেদ প্রামাণ্য। বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত, সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

বেদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। বেদ প্রামাণ্য। সুতরাং ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪।৪।২২, ৪।৪।২৪), শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ (৬।১১), কৌষীতকি উপনিষদ (৪।১৮) প্রভৃতি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন বাক্য ব্যবহার করেছেন। ভগবদ্গীতায় (৯।১৭-১৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ, বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেবচ। গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী

১। কুসুমাঞ্জলি ১

২। ন্যায়ভাষ্য ২।১।৬৮; কুসুমাঞ্জলি ৫, ৬২ পৃষ্ঠা।

নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্' (আমি এই জগতের পিতা, বিধাতা, পিতামহ ; যা কিছু জ্ঞেয় এবং পবিত্র বস্তু তা সবই আমি। আমি ব্রহ্মবাচক ওঙ্কার, আমিই ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ স্বরূপ। আমি গতি, আমি ভর্তা, আমি প্রভু, আমি শুভাশুভ দ্রষ্টা, আমি স্থিতিস্থান, আমি রক্ষক, আমি সুহৃৎ, আমি স্রষ্টা, আমি সংহর্তা, আমি আধার, আমি লয়স্থান এবং অবিনাশী বীজস্বরূপ)।

শাস্ত্রের সাক্ষীর ওপর নির্ভর করে আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, শ্রুতি (বেদ) এবং স্মৃতি (ভগবদ্গীতা) শাস্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা পুনঃ পুনঃ-ই উল্লেখ করেছেন। নৈয়ায়িকেরা বলেন, শাস্ত্র ত শব্দপ্রমাণ বলে স্বীকৃত। সুতরাং শাস্ত্রের সাক্ষীর ওপর নির্ভর করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে আমরা বাধ্য।

এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে—শাস্ত্রকে আমরা প্রমাণ বলবো কেন? সাধারণ লোক শাস্ত্রকে প্রমাণ বললেও যুক্তিতে বিশ্বাসী দার্শনিকের এই কথা মানা উচিত কি? এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সহজেই চোখে কোন রঙ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে পারে। কিন্তু অন্ধ যতই যুক্তি করুক না কেন, সে চক্ষুষ্মানের মত কখনই রঙের জ্ঞান পাবে না। ঈশ্বর সম্বন্ধেও একই কথা। যুক্তি নয়, প্রত্যক্ষই এইক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সমস্ত সংশয়ের নিরসন হয়; পাশ্চাত্ত্য দর্শনে কাণ্ট[১] এবং তারপরে লোটজা[২] ঈশ্বর প্রসঙ্গে যুক্তির অসারতা প্রদর্শন করেছেন। কাণ্ট বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তথাকথিত কোন যুক্তিই ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করতে পারে না। লোটজা বলেন[৩]—"ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন প্রমাণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস এবং যে বিশেষ উপায়ে চরম সত্তাকে উপলব্ধি করার অনুভূতি আমাদের হয়, তারই সমর্থনে কতকগুলো ওজর মাত্র" (All proofs that God exists are pleas put forward in justification of our faith and the particular way in which we feel that we must apprehend this highest principle.)। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যুক্তির চেয়ে প্রত্যক্ষই অধিকতর নির্ভরযোগ্য)।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তির চেয়ে প্রত্যক্ষই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

শাস্ত্রপ্রবক্তা এবং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের কথা আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে যা বলেন তা কি আমরা

১। Edward Caird রচিত The Critical Philosophy of Kant দ্বিতীয় খণ্ড ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২। Outlines of Philosphy of Religion প্রথম অধ্যায়

৩। পূর্ববৎ ৯ পৃষ্ঠা।

মানি না? আমরা ত সাধারণতঃ বিজ্ঞানীদের কথা আবার পরীক্ষা করে দেখতে বসি না। অবশ্য যদি দেখতে চাই, তবে তা সম্ভব এবং তাতে বিজ্ঞানীদের কথার সত্যতাই শেষপর্যন্ত প্রমাণিত হতে দেখা যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধেও একই কথা। শাস্ত্রকারেরা তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আমরা তাঁদের কথা (শাস্ত্র বাক্য) সত্য বলেই মেনে নেব। সাধারণভাবে শাস্ত্র নিশ্চয়ই প্রামাণ্য। তবে এই বিষয়ে যদি আমাদের সংশয় জাগে, তবে আমরাও বিভিন্ন যোগপ্রক্রিয়ায় চিত্তশুদ্ধ করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকেরা ত ঈশ্বর প্রত্যক্ষই করেছিলেন। তবে সাধারণতঃ বিজ্ঞানের গ্রন্থ পাঠ করে প্রমাণ না করেই যেমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আমরা মেনে নিই, তেমনই বেদ, উপনিষদ, ভগবদ্গীতা প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে ঈশ্বরের অস্তিত্বও আমরা মেনে নিতে পারি।[১]

শাস্ত্র প্রবক্তা এবং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের কথা আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য। এবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হলে আমরা সাধনা করে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং তখন আমাদের সংশয় দূর হবে।

উদয়ন ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নয়টি প্রমাণ দিয়েছেন। ঈশ্বরবাদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নয়টি প্রমাণ বিখ্যাত।

(১) জগৎকার্য। সুতরাং এই কার্যের কোন না কোন নিমিত্ত কারণ থাকবে। ঈশ্বর এই কারণ। রচনা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি (কার্যাৎ)।

(২) পরমাণু স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় বলে ঈশ্বর গতি সঞ্চার না করলে এদের সংযোগ সম্ভব নয়। অদৃষ্ট অচেতন বলে গতি সঞ্চার করতে পারে না। অদৃষ্টেও ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষিত। ঈশ্বর ব্যতীত অদৃষ্ট পরমাণু সংযোগ করতে পারে না। (আয়োজনাৎ)।

(৩) ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগতের স্থিতি। অচেতন অদৃষ্ট একাজ করতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জগতের লয় হয় (ধৃত্যাদেঃ)।

(৪) শব্দের অর্থ আছে এবং একটি বিষয় বোঝায়। শব্দের বিষয় নির্দেশ করার শক্তি ঈশ্বর থেকে আসে (পদাৎ)।

(৫) অভ্রান্ত বেদের রচয়িতা ঈশ্বর (প্রত্যয়তঃ)।

(৬) শ্রুতি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে (শ্রুতেঃ)।

(৭) বেদবাক্য বিধিনিষেধাত্মক। বেদের নির্দেশ ঈশ্বরেরই নির্দেশ। বিধির জনক ঈশ্বর (বাক্যাৎ)।

(৮) ন্যায় বৈশেষিক মতে দ্ব্যণুকের আয়তন দুটি পরমাণুর প্রত্যেকের আয়তনের ওপর নির্ভর করে না, দুটি পরমাণুর সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। 'এক' সংখ্যাটি প্রত্যক্ষ করা হয়; কিন্তু অন্য সংখ্যা বুদ্ধিগ্রাহ্য। যা বুদ্ধিগ্রাহ্য তা চৈতন্য ছাড়া অসম্ভব। সৃষ্টিকালে জীবাত্মা অচেতন। পরমাণু, অদৃষ্ট, দিক, কাল ও মন সবই সর্বদাই অচেতন। সুতরাং ঈশ্বরের চেতনার ওপরই বুদ্ধিগ্রাহ্য সংখ্যা নির্ভরশীল। (সংখ্যাবিশেষাৎ)।

১। কুসুমাঞ্জলি ৫।১

(৯) আমরা আমাদের কর্মফল ভোগ করি। আমাদের কর্ম থেকে পাপপুণ্য সঞ্চিত হয়। পাপপুণ্যের সমাহার অদৃষ্ট। কিন্তু তা অচেতন বলে তাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় (অদৃষ্টাৎ)।

শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ প্রভৃতি বেদান্তীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক অধিকাংশ ন্যায়-প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে একমাত্র শ্রুতি প্রমাণের ওপর নির্ভর করেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও লোটজা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রমাণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করতে পারে না বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাস সমর্থনের জন্য এই প্রমাণগুলো আসলে ওজরমাত্র। কাণ্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাসভিত্তিক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করলে নৈতিক জীবন অসম্ভব হয়ে ওঠে। কাণ্ট যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে বিশ্বাসের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি বেদান্তীরা তেমনই শ্রুতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

ঈশ্বরবাদ বিরোধী প্রমাণ

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সব প্রমাণ দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ আনা হয়। এদেরই ঈশ্বরবাদ বিরোধী প্রমাণ বলে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তৃতীয় প্রমাণটিতে ঈশ্বরকে বেদের স্রষ্টা বলা হয় আর চতুর্থ প্রমাণে বেদের ওপর নির্ভর করেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। সুতরাং এই দুটি প্রমাণের মধ্যে সুস্পষ্ট চক্রক দোষ বর্তমান। যে ঈশ্বর বেদের স্রষ্টা তাঁর জ্ঞান বেদ দিতে পারে কি? এর উত্তরে বলা যায়—জ্ঞানের দিক থেকে বেদ আগে, ঈশ্বর পরে অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান বেদ থেকেই পাওয়া যায়, কিন্তু অস্তিত্বের দিক থেকে ঈশ্বর আগে বেদ পরে, অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বের জন্য বেদের অস্তিত্ব। দুটি বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রমাণের মধ্যে কোন চক্রক দোষই থাকে না।[১] বেদ অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে, আর ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান বেদের ওপর নির্ভর করে হয়। সুতরাং এতে কোন বিরোধ নেই।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তৃতীয় প্রমাণে ঈশ্বরকে বেদের স্রষ্টা বলা হয়েছে, আর চতুর্থ প্রমাণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বেদ থেকে জানা যায় বলা হয়েছে। সুতরাং এ দুটি প্রমাণের মধ্যে সুস্পষ্ট চক্রক দোষ রয়েছে। এই দোষ পরিহার করা সম্ভব।

ন্যায়-ঈশ্বরবাদ সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, ঈশ্বর যদি জগতের স্রষ্টা হন, তবে নিশ্চয়ই তিনি দেহবিশিষ্ট হবেন, কারণ দেহ ছাড়া কোন কাজ করা কি সম্ভব? আর যদি তাঁর দেহ থাকে, তবে তিনি আর অসীম থাকবেন না, সসীম হয়ে যাবেন। নৈয়ায়িকেরা একটি দ্বিকল্পের[২] আকারে এই প্রশ্নের জবাব দেন। তাঁরা বলেন, বেদ যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে থাকেন, তবে এই অভিযোগ উঠতেই পারে না, কারণ তাহলে সিদ্ধসাধনদোষ অর্থাৎ যা প্রমাণিত হয়েছে, তাকে আবার প্রমাণ করার

ন্যায়ের ঈশ্বরবাদ সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিযোগ খণ্ডন।

১। সর্বদর্শন, একাদশ অধ্যায়।

২। দ্বিকল্প = Dilemma.

অযৌক্তিক প্রসঙ্গ হবে ; আর যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বই প্রমাণিত না হয়ে থাকে, তবে দেহভিন্ন তাঁর কর্মের অসম্ভাবনার প্রশ্নই ওঠে না।[১]

সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি, এই প্রসঙ্গ নিয়ে আর একটি ঈশ্বরবাদ বিরোধী যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে। ঈশ্বর যখন জগৎ সৃষ্টি করেছেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর কোন উদ্দেশ্য ছিল, কারণ উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ ত কোন কাজ করে না। কিন্তু সৃষ্টি ব্যাপারে ঈশ্বরের কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? তাঁর নিজের ত কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। কারণ ঈশ্বর ত পূর্ণ, অপূর্ণেরই প্রয়োজন বা অপূর্ণ অভিষ্ট থাকতে পারে, পূর্ণের ত পারে না। তবে কি তিনি অন্যের কল্যাণের জন্য করুণাপরবশ হয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন? তাই যদি হয়, তবে তিনি সমস্ত জীবনকেই সুখী, সম্পন্ন ও সার্থক করে তৈরি করতেন, কিন্তু তা ত তিনি করেন নি। জীবের ত দুঃখের অন্ত নেই। সুতরাং একথাই বলতে হয় যে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন নি।

ঈশ্বরবাদ সম্পর্কে তৃতীয় অভিযোগ।

নৈয়ায়িকেরা এই যুক্তির উত্তরে বলেন, ঈশ্বর করুণাপরবশ হয়েই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের প্রকৃতিতেই নীতির অস্তিত্ব আছে। তিনি কখনই অনীতি বা দুর্নীতি প্রশ্রয় দিতে পারেন না। নীতির দাবীই এই যে, পুণ্যবান পুরস্কৃত হবে এবং পাপী শাস্তি পাবে; যার যা কর্মফল তাকে তা ভোগ করতেই হবে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে কাণ্টও একথা স্বীকার করেন।[২] সুতরাং ঈশ্বর জীবের কর্মফল অনুসারে কাউকে সুখী ও কাউকে দুঃখী করবেন, এই ত স্বাভাবিক। এতে তাঁর করুণাহীনতা প্রমাণিত হয় না। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া করুণা নয়, অযৌক্তিক অপরাধ। কেউ যদি বলেন, এরকম হলে ত ঈশ্বর নীতির নিয়মের দ্বারা সীমিত হবেন এবং তাঁকে আর সর্বশক্তিমান বলা যাবে না। তার উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলবেন, এ অতি অযৌক্তিক কথা। নীতির নিয়ম ত ঈশ্বরের প্রকৃতি-সঞ্জাত তাঁরই নিয়ম। সুতরাং তাঁর নিয়ম তাঁকে সীমিত করবে কি? কেউ হয়ত বলবেন, এ না হয় হল, কিন্তু সৃষ্ট জগৎ ত ঈশ্বরকে সীমিত করবে। তার উত্তরে বলা যায়—দেহ কি কাউকে সীমিত করে? দেহের সাহায্যেই ব্যক্তি তার আদর্শ ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। অনুরূপভাবে জগৎ ঈশ্বরকে সীমিত না করে তাঁর নৈতিক নিয়ম প্রয়োগে সাহায্য করে।[৩] সুতরাং ঈশ্বরের পক্ষে জগতের স্রষ্টা হতে কোন বাধা নেই।[৪]

তৃতীয় অভিযোগ খণ্ডন এবং ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা এমতের প্রতিষ্ঠা।

১। সর্বদর্শন, একাদশ অধ্যায়।

২। Kant-এর Critique of Practical Reason দ্রষ্টব্য।

৩। সর্বদর্শন, একাদশ অধ্যায়

৪। নৈয়ায়িকদের ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে আরও অনেক আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। জয়ন্ত ভট্ট 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে ঈশ্বরবাদ-বিরোধী বিভিন্ন আপত্তি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে খণ্ডন করেছেন। আমাদের পক্ষে এখানে সে সমস্ত আপত্তি ও খণ্ডন আলোচনা করা সম্ভব নয়। গ্রন্থের কলেবর তাতে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। আমরা উৎসাহী পাঠককে জয়ন্ত ভট্টের 'ন্যায় মঞ্জরী' পাঠ করার জন্য অনুরোধ করি। ডঃ সুশীল কুমার মৈত্র 'The Fundamental Questions of Indian Metaphysics and Logic' গ্রন্থে Nyaya proofs of the existence of God,' প্রবন্ধে ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থ নির্ভর করে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। পাঠক এই প্রবন্ধটি পাঠেও উপকৃত হবেন।

সিদ্ধান্ত

ন্যায়দর্শন দর্শনালোচনার যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে তার তুলনা নেই। নব্যন্যায়ের বিচারশৈলী দর্শনচর্চার পক্ষে অতি উপাদেয়। সেইজন্যই ভারতীয় অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ও নব্যন্যায়ের বিচারশৈলীই গ্রহণ করেছেন। নব্যন্যায় অত্যন্ত জটিল। সাধারণের পক্ষে তা সহজবোধ্য নয়। সেইজন্য আমরা এখানে মুখতঃ প্রাচীন ন্যায়ই আলোচনা করেছি। প্রয়োজন অনুসারে নব্যন্যায়েরও প্রসঙ্গ তুলেছি। অনেকে বলেন, ভারতীয় দর্শনে কোন বিচার নেই, এখানে শুধুই নিশ্চেষ্ট অন্ধ বিশ্বাসে অনুরক্তি। কথাটি যে সর্বৈব মিথ্যা ন্যায়দর্শনই তার প্রমাণ। ন্যায় যে বিচার-বিশ্লেষণ যুক্তি-প্রমাণের পদ্ধতি নির্দেশ করেছে তার চেয়ে ভাল পদ্ধতি পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও নেই। যুক্তি দিয়েই ন্যায়দর্শন পরমত খণ্ডন করে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছে।

ন্যায়দর্শন দর্শনালোচনার যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে তার তুলনা নেই। নব্যন্যায়ের বিচারশৈলী দর্শন চর্চার পক্ষে অতি উপাদেয়।

ন্যায়দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ লোকের দৃষ্টিভঙ্গী। সেইজন্য অনেকের কাছেই এ দর্শন অত্যন্ত প্রিয়। নৈয়ায়িকেরা জড়পরমাণু, মন, জীবাত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি অনেক সত্তায় বিশ্বাসী এবং এরা সকলেই দেশ, কাল এবং আকাশে বাহ্যতঃ যুক্ত বলে মনে করা হয়। কোন একটি চরমতত্ত্ব দিয়ে জগৎ ও জীবনের সমস্ত ব্যাপারের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা ন্যায়দর্শনে নেই। সেইজন্য অনেকে ন্যায়দর্শনকে সাংখ্য এবং বেদান্তদর্শন থেকে নিম্নস্তরের বলে মনে করেন। জীবাত্মা এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে ন্যায়মত আলোচনা করলে এই ধারণার খানিকটা সত্যতা মানতে হয়। ন্যায়মতে চৈতন্য জীবাত্মার আগন্তুক গুণ। কিন্তু আমরা আত্মসচেতন হলেই স্বপ্রকাশ চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাই উপলব্ধি করি। তদুপরি এই দর্শনে মুক্ত আত্মাকে চৈতন্যহীন জড়-পাষাণবৎ কল্পনা করা হয়েছে। নৈয়ায়িকেরা এর সমর্থনে যাই বলুন না কেন, এরকমের অবস্থা কেউই কাম্য বলে মনে করতে পারে না। চিরকালের জন্য অচেতন হয়ে থাকতে চাইবে কে? এই দিক থেকে ন্যায়বাদ ও জড়বাদে কোন তফাৎ নেই। শ্রীহর্ষ এই মতবাদের প্রবক্তা গোতমকে গোতম বা গরুশ্রেষ্ঠ বলে বিদ্রূপ করেছেন। নৈয়ায়িকেরা ঈশ্বরকে নিমিত্ত কারণ বলে তাঁকে মানুষের মতই জগতের এক স্থপতিতে পরিণত করেছেন। সাধারণ স্থপতির মতই তিনি কতকগুলো প্রদত্ত দ্রব্য নিয়ে কাজ করেন। একথায় ঈশ্বরের মহিমা যেন অনেকটাই খর্ব হয়। তবে মুক্তিকে জীবনের পরমপুরুষার্থ বলে অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মতই ন্যায়দর্শন জীবনদর্শন হিসেবে মোহনীয় হয়ে উঠেছে।

ন্যায়দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ লোকের দৃষ্টিভঙ্গী। সেইজন্যই অনেকের কাছেই এ দর্শন প্রিয়।

গ্রন্থপঞ্জী

ফণীভূষণ তর্কবাগীশ: ন্যায় দর্শন
পঞ্চানন শাস্ত্রী: ভাষা পরিচ্ছেদ (সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী সহ)
জীবানন্দ বিদ্যাসাগর: ন্যায়দর্শন (বাৎস্যায়ন ভাষ্য ও বিশ্বনাথের বৃত্তি সহ)

অধ্যাপক চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য: The Elements of Indian Logic and Epistemology.

ডঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: The Nyaya Theory of Knowledge

মাধবাচার্য: সর্বদর্শন সংগ্রহ (Cowell ও Gough-কৃত অনুবাদ)

উদয়ন: কুসুমাঞ্জলি (Cowell-এর অনুবাদ)

Hiriyanna: Outlines of Indian Philosophy

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র: বেদান্ত পরিভাষা

স্বামী মাধবানন্দ: ভাষা পরিচ্ছেদ (সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী সহ ইংরেজী বই)

Dr. S. K. Maitra: Fundamental questions of Indian Metaphysics and Logic

Gopinath Bhattacharyya: Tarkasangraha Dipika on Tarkasangraha.

অধ্যাপক শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী: তর্কসংগ্রহঃ (সটীকঃ অধ্যাপনাসহিতঃ)

অন্যান্য যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তা যথাস্থানে পাদটীকায় বলা আছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈশেষিক দর্শন

কণাদ মুনি বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা।

কণাদ মুনি বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। 'বিশেষ' নামে একটি পদার্থের বিশদ আলোচনা এই দর্শনে আছে বলেই এর নাম বৈশেষিক দর্শন।[১] শস্যকণা থেকে জীবন ধারণ করতেন বলে এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতার নাম কণাদ। কণাদ মুণির আর এক নাম উলুক। সেইজন্যই বৈশেষিক দর্শন কাণাদ বা ঔলুক্য শাস্ত্র নামে পরিচিত।

এই দর্শনের সর্বপ্রাচীন আকর গ্রন্থের নাম 'বৈশেষিক সূত্র'। এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

এই দর্শনের সর্বপ্রাচীন আকর গ্রন্থের নাম 'বৈশেষিক সূত্র'। কণাদ মুনি এর রচয়িতা। এই গ্রন্থ দশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে আবার দুটি করে আহ্নিক। প্রশস্তপাদের 'পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ' সাধারণতঃ বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য বলেই পরিচিত; কিন্তু এই গ্রন্থ পাঠ করার সময় একে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলেই মনে হয়, ভাষ্য বলে নয়। শঙ্করাচার্যের 'শারীরকভাষ্য'-এর দুটি টীকা[২] থেকে জানা যায়, লঙ্কার রাজা রাবণ বৈশেষিক সূত্রের একটি ভাষ্য রচনা করেছিলেন। ব্যোমশিবের 'ব্যোমবতী', উদয়নের 'কিরণাবলী' এবং শ্রীধরের 'ন্যায়কন্দলী' প্রশস্তপাদ ভাষ্যের অতি উৎকৃষ্ট এবং প্রসিদ্ধ তিনটি টীকা, প্রশস্তপাদ ভাষ্যের স্বল্প প্রসিদ্ধ দুটি টীকা

১। হিরিয়ান্না 'Outlines of Indian Philosophy' গ্রন্থের ২২৫ পৃষ্ঠায় বৈশেষিক কথাটির অন্যরূপ অর্থ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে বিশেষ কথার অর্থ ভেদ এবং বৈশেষিক দর্শনের নাম বৈশেষিক হয়েছে এইজন্যে যে, এই দর্শনে অভেদ বা অদ্বৈততত্ত্ব স্বীকৃতি পায়নি, বরং ভেদ বা বহুতত্ত্বই স্বীকৃতি পেয়েছে।

২। প্রকটার্থ এবং রত্নপ্রভা (২।২।১১) দ্রষ্টব্য।

হচ্ছে জগদীশ তর্কালঙ্কারের 'স্থক্তি' এবং পদ্মনাভ মিশ্রের 'সেতু'। বল্লভাচার্যের 'ন্যায় লীলাবতী' এবং উদয়নের 'লক্ষণাবলী' বৈশেষিক দর্শনের ছুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বৈশেষিক দর্শনের পরবর্তীকালের গ্রন্থগুলো এই দর্শনকে ন্যায়দর্শনের সঙ্গে বিশেষভাবে একত্র করে দেখেছে। এদের মধ্যে শিবাদিত্যের 'সপ্তপদার্থী', লৌগাক্ষি ভাস্করের 'তর্ক কৌমুদী' এবং 'সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' টীকাসহ বিশ্বনাথের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। অন্নং ভট্টের তর্ক-সংগ্রহও ন্যায় ও বৈশেষিক মত একত্র করে প্রকাশ করেছে।

ন্যায় ও বৈশেষিক সমানতন্ত্র।

ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন সমানতন্ত্র নামে পরিচিত। জীবের মুক্তি বিধানই উভয় দর্শনের উদ্দেশ্য। উভয় দর্শনের মতেই অজ্ঞান সমস্ত দুঃখ কষ্টের নিদান; ছুঃখের নিবৃত্তি বা মুক্তি তত্ত্বজ্ঞান থেকেই লাভ করা যায়। তবে ছুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ন্যায় এবং বৈশেষিক মতের তফাৎ আছে। নৈয়ায়িকেরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ এই চারটি প্রমাণ স্বীকার করেন, কিন্তু বৈশেষিকেরা প্রত্যক্ষ অনুমান মাত্র এই ছুটি প্রমাণ মানেন এবং উপমান ও শব্দ প্রমাণকে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রমাণে পর্যবসিত করেন। তা ছাড়া, নৈয়ায়িকেরা ষোড়শ পদার্থ স্বীকার করেন, কিন্তু বৈশেষিকেরা স্বীকার করেন মাত্র সাতটি পদার্থ। বৈশেষিকদের ধারণা, অন্যান্য সমস্ত কিছুই এই সপ্ত পদার্থে পরিণত করা যায়। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব বৈশেষিক স্বীকৃত সপ্ত পদার্থ। বৈশেষিক দর্শন এই সপ্ত পদার্থেরই স্থযুক্তিপূর্ণ সবিশেষ আলোচনা। এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয় এই যে, ন্যায়দর্শনে বৈশেষিক সমস্ত পদার্থই প্রমেয়ের অন্তর্গত। ন্যায়মতে প্রথম পদার্থ প্রদাণ। এর থেকে বোঝা যায় যে, ন্যায়দর্শনে জ্ঞানালোচনা মুখ্য। বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞানের বিষয়ের আলোচনা প্রধান। পদস্থচিত অর্থ বা বিষয়কেই পদার্থ বলে।[১] স্থতরাং পদার্থ বলতে আমরা জ্ঞানের বিষয় বা প্রমেয় বুঝতে পারি। যে বিষয় জ্ঞেয় এবং অভিধেয় তা-ই পদার্থ।[২]

১। 'অভিধেয় পদার্থঃ'—তর্ককৌমুদী ১ পৃষ্ঠা।

২। পদার্থকে ইংরেজীতে 'category' বলে। তবে অ্যারিস্টটল, কাণ্ট এবং হেগেল যদিও 'category' শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁদের বক্তব্য এক নয়। অ্যারিস্টটলের Categories বিধেয়তার (Predication) প্রকার (mode) মাত্র এবং বিধেয়ের তর্কবিজ্ঞান সম্মত শ্রেণীবিভাগ বোঝায়। কাণ্ট Categories বলতে বিষয় বোঝার উপায় (Ways of understanding things) বোঝেন। এই সমস্ত উপায়ের মাধ্যমে ছাড়া বিষয় জ্ঞেয় হয় না। হেগেলের মতে একমাত্র তত্ত্ব (Reality) হল চিন্তা (Thought)। চিন্তার অগ্রগতির বিভিন্ন গতিশীল স্তরকে (dynamic stages in the development of Thought) তিনি বলেছেন Categories.

বৈশেষিক পদার্থ প্রমেয় বা শুদ্ধজ্ঞানের বিষয় এবং তত্ত্ব। বৈশেষিক মতে পদার্থবিভাগ বস্তুতঃ তত্ত্ববিভাগ। বৈশেষিক পদার্থ অ্যারিস্টটলের Categories-গুলোর মত বিধেয়ের প্রকার নয়। বৈশেষিক পদার্থবিভাগ বিধেয়ের প্রকারবিভাগও নয়। বৈশেষিক পদার্থ কাণ্টের Catagories-গুলোর মত বুদ্ধির প্রকার বা বোঝার উপায় মাত্রও নয়, আবার হেগেলের categories-গুলোর মত চিন্তার বিভিন্ন গতিশীল স্তরও নয়। হেগেল আত্যন্তিক ভেদ বা আত্যন্তিক অভেদ কোনটাই স্বীকার করেন না। তাঁর মতে চরমতত্ত্ব ভেদের মধ্যে অভেদতত্ত্ব (Identity-in-difference)। বৈশেষিকেরা ভেদবাদী এবং বহুতত্ত্ববাদী।

পদার্থ বলতে জ্ঞানের বিষয় বা প্রমেয় বুঝতে পারি।

বৈশেষিকদের মতে প্রমেয় দ্বিবিধ—ভাব এবং অভাব। ভাববস্তু অস্তিত্ব বোঝায়, অভাববস্তু নাস্তিত্ব বোঝায়। ভাববস্তু আবার ষড়বিধ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়। বৈশেষিক দর্শনে প্রথমতঃ ষড়বিধ ভাবপদার্থেরই স্বীকৃতি ছিল।[১] পরবর্তীকালে বৈশেষিকেরা ষড়বিধ ভাবপদার্থের সঙ্গে অভাব পদার্থটি জুড়ে দিয়েছেন।[২] বৈশেষিক মতে কোন উপলব্ধিই সবিষয় হয় না। সুতরাং অভাবের উপলব্ধি অভাব নামক পদার্থ ভিন্ন হতে পারে না।

বিভিন্ন পদার্থের প্রকৃতি

১। দ্রব্য

দ্রব্য গুণ ও কর্মের আধার, কিন্তু গুণও কর্ম থেকে ভিন্ন।

দ্রব্য গুণ ও কর্মের আধার, কিন্তু গুণও কর্ম থেকে ভিন্ন। গুণ কোন না কোন দ্রব্যেরই গুণ এবং কর্ম কোন না কোন দ্রব্যের কর্ম। সুতরাং গুণ বা কর্ম দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না। দ্রব্য যে কোন সাবয়ব বস্তুরই সমবায়ী কারণও বটে। একটি বস্ত্র কখনই সুতা ছাড়া তৈরি হতে পারে না। সূত্র বস্ত্রের উপাদান বা সমবায়ী কারণ।[৩]

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, দ্রব্য সমবায়ী কারণ ও গুণাশ্রয়।[৪]

দ্রব্য নয় প্রকার[৫]—ক্ষিতি অপ, তেজ, মরুৎ, আকাশ, দিক (দেশ), কাল, আত্মা ও মন। এদের মধ্যে প্রথম পাঁচটির নাম পঞ্চভূত এবং এদের প্রত্যেকটিরই একটি বিশেষ গুণ আছে এবং আমরা তা বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে পারি। ক্ষিতির

১। বৈশেষিক সূত্র (১।১।৪)।

২। তর্কামৃত ঃ প্রথম অধ্যায়।

৩। ন্যায়দর্শনে সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণ স্বীকৃত হয়েছে। অসমবায়ী কারণ সমবায়ী কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্যের কারণ হয়; সূত্রের রঙ সূত্রের মাধ্যমেই বস্ত্রে সঞ্চারিত হয়। সূত্রের রঙ অসমবায়ী কারণ। তন্তুবায় যিনি বস্ত্র তৈরি করেন তিনি নিমিত্ত কারণ। আমরা ন্যায় দর্শন আলোচনা কালে এ প্রসঙ্গ বিশদ আলোচনা করেছি।

৪। সমবায়ী কারণম্, গুণাশ্রয়ো বা তর্কভাষা, ২০ পৃঃ।

৫। সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকই সাত প্রকার পদার্থ স্বীকার করেন নি। ভাট্ট মীমাংসকেরা দ্রব্য, গুণ, কর্ম, অভাব ও সামান্য—এই পাঁচটি পদার্থ স্বীকার করেছেন। এঁদের মতে বিশেষ ও সমবায় অতিরিক্ত পদার্থ নয়। প্রাভাকর মীমাংসকেরা দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সংখ্যা, সমবায়, সাদৃশ্য ও শক্তি—এই আটটি পদার্থ স্বীকার করেছেন। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুটি মূল পদার্থ। মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রকৃতির পরিণাম এবং মূল পদার্থ নয়। বেদান্ত মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও শক্তি—এই পাঁচটি পদার্থ। চার্বাকেরা পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু—এই চারটি পদার্থ স্বীকার করেন। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের মতে বিজ্ঞান মাত্রই পদার্থ। জৈনমতে জীব ও অজীব, এই দুটি মূল পদার্থ।

গন্ধ, জলের স্বাদ, তেজ বা আগুনের বর্ণ, বায়ুর স্পর্শ এবং আকাশের শব্দ বিশেষ গুণ। ক্ষিতি ছাড়া কোন কিছুরই গন্ধ নেই। যখন অন্য জিনিসে গন্ধ পাওয়া যায় তখনই বুঝতে হবে তাতে ক্ষিতির মিশ্রণ আছে। অন্যান্য বিশিষ্ট গুণগুলোও এদের আধার বিশেষ দ্রব্য ছাড়া থাকে না। অন্যত্র সেই গুণের অবস্থিতির হদিস পেলে সেখানে ঐ গুণের আধার যে বিশেষ দ্রব্য তা মিশ্রিত আছে বলে বুঝতে হবে। পাঁচটি বিশেষ গুণ পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করা হয়। যে ইন্দ্রিয় যে গুণ প্রত্যক্ষ করে, সে ইন্দ্রিয় সেই গুণের আশ্রয় বিশেষ ভূতের সৃষ্টি। অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় ক্ষিতির, জিহ্বা জলের, দর্শনেন্দ্রিয় তেজ বা আগুনের, স্পর্শেন্দ্রিয় বায়ুর, এবং শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশের সৃষ্টি।

দ্রব্য নয় প্রকার—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, আকাশ, দিক, কাল, আত্মা ও মন।

ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ—এই চতুর্ভূত দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। এই সমস্ত ভূতের উপাদান বা পরমাণুগুলো নিত্য, কারণ, পরমাণু নিরংশ বলে অবিভাজ্য। এই সমস্ত পরমাণু থেকে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য যে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ জন্মে তারা অনিত্য। পরমাণুর অস্তিত্ব অনুমান করে জানা যায়। দুনিয়ার সমস্ত সাবয়ব বস্তুই বিভিন্ন অবয়ব বা অংশের সৃষ্টি। সাবয়ব বস্তুর অবয়বগুলো ভাগ করে যেতে থাকলে আমরা ক্ষুদ্রতর থেকে ক্ষুদ্রতর অবয়ব এবং সর্বশেষে সম্পূর্ণ অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অবয়ব পাবো। বস্তুর এই ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অবয়বই পরমাণু। পরমাণুর সৃষ্টি হতে পারে না, কারণ সৃষ্টি করার অর্থ কোন কিছুর অবয়ব সংযোগ করা এবং পরমাণুর কোন অবয়বই নেই। পরমাণুর ধ্বংসও হতে পারে না, কারণ কোন কিছু ধ্বংস হলে তা তার অবয়বেই বিভক্ত হয় এবং পরমাণুর অবয়ব নেই বলে তার পক্ষে অবয়বে বিভক্ত হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সৃষ্টি এবং ধ্বংস কোনটাই নেই বলে পরমাণু নিত্য। পরমাণু চতুর্বিধ—ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ। প্রত্যেক পরমাণুরই বিশেষ গুণ আছে। এদের কথা খানিকটা আগেই বলেছি। প্রাচীন গ্রীক দর্শনে ডেমোক্রাইটিস নামে একজন দার্শনিক পরমাণুবাদ প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতে পরমাণুর সংখ্যাগত ভেদ আছে, কিন্তু গুণগত ভেদ নেই এবং সমস্ত পরমাণুই এক শ্রেণীর। বৈশেষিকদর্শন পরমাণুর গুণগত প্রভেদ এবং শ্রেণী বিভাগ দুই-ই স্বীকার করে। সুতরাং বৈশেষিক-দর্শনের পরমাণু এবং প্রাচীন গ্রীক দর্শনে ডেমোক্রাইটিস প্রবর্তিত পরমাণুবাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ—এই চতুর্ভূত দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য।

আকাশ পঞ্চম দ্রব্য। আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ। শব্দ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, কিন্তু আকাশ তা নয়। কোন বাহ্য জিনিসের প্রত্যক্ষ হতে হলে তার মহত্ত্ব (প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পরিমিতি) এবং উদ্‌ভূত রূপবত্ত্ব (প্রকট রূপ) থাকা একান্ত আবশ্যক। যে বস্তুর এই দুটি গুণ নেই তা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। আকাশ সীমিতও নয়, রূপযুক্তও নয়। সুতরাং আকাশের কোন প্রত্যক্ষ হতে পারে না। আকাশ বিভু এবং শব্দগুণযুক্ত দ্রব্য। শব্দের প্রত্যক্ষ থেকে আকাশের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। গুণ দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না। তাহলে

আকাশ এক, নিরবয়ব ও নিত্য দ্রব্য।

শব্দ কোন্ দ্রব্যে থাকবে? শব্দ, ক্ষিতি, অপ, তেজ বা মরুতের গুণ হতে পারে না, কারণ এদের গুণ শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, কিন্তু শব্দ ত আমরা কান দিয়েই শুনি। তা ছাড়া, এ সমস্ত দ্রব্য থেকে তুলনামূলকভাবে মুক্ত স্থানেই শব্দের অবস্থান সম্ভব। শব্দ দিক (দেশ), কাল, আত্মা বা মনেরও কোন গুণ হতে পারে না, কারণ শব্দ না থাকলেও এসব দ্রব্য থাকে। সুতরাং শব্দ অন্য কোন দ্রব্যেরই গুণ হবে এবং এই দ্রব্যের নামই আকাশ। আকাশ এক, নিরবয়ব ও নিত্য।

দিক আকাশের মতই নিরবয়ব, নিত্য ও সর্বব্যাপী এবং প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য নয়।

দিক (দেশ) এবং কাল আকাশের মতই নিরবয়ব, নিত্য ও সর্বব্যাপী এবং আকাশের মতই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। 'দূর', 'নিকট' প্রভৃতির প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে দিক বা দেশ অনুমিত হয়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ কালের ধারণার ওপর নির্ভরশীল। দিক এবং কাল অণুপরিমাণ নয়, বিন্দু ও মুহূর্ত যথাক্রমে এদের সাধারণতঃ স্বীকৃত বিভাগ। পরমাণু দিক এবং কালে থাকে না, কিন্তু পরমাণুজাত দ্রব্য থাকে। দিক এবং আকাশ এক নয়। আকাশ সেই দ্রব্য যা দিক বা দেশে থাকে এবং এর বিশেষ গুণ হচ্ছে শব্দ।

আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

আত্মা নিত্য এবং বিভু। চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ। আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর। পরমাত্মা বা ঈশ্বর এক এবং তিনি জগতের কারণরূপে অনুমিত হন। জীবাত্মা দেহভেদে ভিন্ন। আমাদের আত্মা আমরা কোন না কোন চেতন অবস্থার আধার হিসেবে আন্তরপ্রত্যক্ষে জানি, অন্যদের আত্মা তাদের ব্যবহার দেখে অনুমিত হয়। জীবাত্মা এক নয়—বহু। জ্ঞানের মতই ইচ্ছা ও যত্ন আত্মার আগন্তুক গুণ ও সবিষয়ক।

মন নিত্য, অণুপরিমাণ দ্রব্য।

মন নিত্য এবং অণুপরিমাণ দ্রব্য। কিন্তু ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ পরমাণুর মত মন কোন কিছু সৃষ্টি করে না। জীবাত্মার সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অবস্থা প্রত্যক্ষ করার ইহা একটি ইন্দ্রিয় বিশেষ। একে অন্তরিন্দ্রিয় বলে। মন অণুপরিমাণ বলে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। মনের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। প্রথমতঃ বলা হয়, বাহ্য জিনিস প্রত্যক্ষের জন্য যেমন বিভিন্ন বহিরিন্দ্রিয় আছে, তেমনি জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতি আন্তর অবস্থার প্রত্যক্ষের জন্য একটি অন্তরিন্দ্রিয় প্রয়োজন। এই ইন্দ্রিয়ের নামই মন। দ্বিতীয়তঃ বলা হয়, বাহ্য পঞ্চেন্দ্রিয় তাদের বিভিন্ন বিষয়সংযুক্ত হলেও একই সঙ্গে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু কেন? এক সঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয়ের বিষয় কখনই যে প্রত্যক্ষ হতে দেখা যায় না তার কারণ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হলেই প্রত্যক্ষ হয় না, আর একটি জিনিস দরকার, যার নাম মনঃসংযোগ। সেইজন্যই মন না থাকলে চোখ খোলা থাকলেও আমরা দেখি না। সুতরাং মনের অস্তিত্ব আমাদের স্বীকার করতেই হয়, নইলে এ জাতীয় ব্যাপারের কোনই ব্যাখ্যা মেলে না। মন যে নিরবয়ব বা অণুপরিমাণ তার প্রমাণ এই যে, আমরা একই সঙ্গে অনেক ইন্দ্রিয়ের বিষয় জানি না। মনের যদি অবয়ব থাকতো তবে এর বিভিন্ন অবয়বের সঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে বিভিন্ন বিষয়ের প্রত্যক্ষই একসঙ্গে হত।

২। গুণ[১]

গুণ দ্রব্যে থাকে। অর্থাৎ গুণ বলতেই দ্রব্যের গুণ বোঝায়। গুণের কোন গুণ বা কর্ম থাকতে পারে না। দ্রব্য অন্যের ওপর নির্ভর না করেই থাকে এবং বস্তুর সমবায়ী বা উপাদান কারণ হয়। কিন্তু গুণ দ্রব্যের ওপর নির্ভর না করে থাকতে পারেনা এবং বস্তুর সমবায়ী কারণ না হয়ে অসমবায়ী কারণ[২] হয়। গুণ কোন কার্যের অস্তিত্ব সিদ্ধ করতে পারে না, কার্যের গুণের জন্যই দায়ী হতে পারে। সুতরাং গুণের পক্ষে সমবায়ী কারণ হওয়া সম্ভব নয়, অসমবায়ী কারণ হওয়াই সম্ভব। সমস্ত গুণই কোন না কোন দ্রব্যে থাকে। সুতরাং কোন গুণে অন্য কোন গুণ থাকতে পারে না। 'শ্বেত' এই গুণটি কোন না কোন দ্রব্যেই থাকা সম্ভব, অন্য কোন গুণে থাকা সম্ভব নয়। গুণ দ্রব্যের নিষ্ক্রিয় বিশেষণ। দ্রব্যে নিষ্ক্রিয়ভাবেই এর অবস্থান। সুতরাং ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, গুণ দ্রব্য এবং কর্ম এই দুই পদার্থ থেকেই ভিন্ন।

গুণ দ্রব্যে থাকে এবং দ্রব্যও কর্ম থেকে ভিন্ন।

বৈশেষিকেরা চতুর্বিংশতি[৩] গুণের কথা বলেছেন—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম এবং অধর্ম। এই সমস্ত গুণের অনেকগুলোই আবার নানাভাগে বিভক্ত। রূপ সবুজ, নীল, লাল প্রভৃতি নানারকমের হতে পারে। অম্ল, মধুর, কষায় প্রভৃতি নানা প্রকার রসই সম্ভব। গন্ধ দ্বিবিধ—সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধ। স্পর্শ ত্রিবিধ—শীত, উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ। শব্দ দ্বিবিধ—ধ্বনি (যেমন শঙ্খধ্বনি) এবং বর্ণ (অর্থাৎ অ, আ প্রভৃতি)।

বৈশেষিক মতে চতুর্বিংশতি গুণ স্বীকৃত।

সংখ্যা দ্রব্যের সেইগুণ যার জন্য আমরা তাকে এক, দুই প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করি। এক থেকে আরম্ভ করে সংখ্যা অনেক। যে গুণের জন্য দ্রব্য ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বলে অভিহিত হয়, তারই নাম পরিমাণ। পরিমাণ চতুর্বিধ—ক্ষুদ্রতম বা অণুপরিমাণ বৃহত্তম, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ। যে গুণের দ্বারা একটি বস্তুকে অন্য আর একটি বস্তু থেকে পৃথক করা হয় তাকে পৃথকত্ব বলে। পৃথকসিদ্ধ দুই বা ততোধিক জিনিস একত্র হলেই সংযোগ হয়। যেমন টেবিলের সঙ্গে পুস্তকের সংযোগ, গাছের সঙ্গে ঘাসের। এইক্ষেত্রে টেবিল, পুস্তক, গাছ, ঘাস প্রভৃতি সংযোগ সম্পর্কভিন্নও অনায়াসে থাকতে পারে এবং এদের অস্তিত্ব সংযোগসম্পর্কের ওপর একেবারেই নির্ভরশীল নয়। কার্য এবং কারণের সম্পর্ক সংযোগসম্পর্ক নয়, কার্য কারণ ছাড়া কখনই থাকতে পারে

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ প্রভৃতি গুণের প্রকৃতি।

১। বৈশেষিক সূত্র ১।১।১৬ ; তর্ক সংগ্রহ 'গুণ' অধ্যায় ; তর্ক ভাষা ২৪-২৮ পৃষ্ঠা

২। 'দ্রব্য' আলোচনা প্রসঙ্গে ১ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য। বিস্তারিত আলোচনা অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ন্যায়তত্ত্ব পরিক্রমা'য় পাওয়া যাবে।

৩। কণাদ ১৭টি গুণের কথা বলেছেন। প্রশস্তপাদ আরও ৭টি গুণ স্বীকার করেছেন।

না। সংযুক্ত ছুটি বা ততোধিক বস্তুর সংযোগ নষ্ট হলেই বিভাগ ঘটে। সংযোগ ত্রিবিধ—সংযুক্ত কোন একটি বস্তুর গতিজন্য (যখন একটি কাক উড়ে এসে মনুমেণ্টের ওপর বসে), সংযুক্ত ছুটি বস্তুরই গতিজন্য (বিপরীত দিক থেকে আগত ছুটি মার্বেল খণ্ড যখন একত্র হয়) এবং অন্য সংযোগজন্য (আমার হাতের কলমটি যখন কাগজের সঙ্গে সংযুক্ত তখন আমার হাত কাগজের সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ এখানে একটি সংযোগ অন্য আর একটি সংযোগজন্য হয়েছে)। অনুরূপভাবে বিভাগও ত্রিবিধ—বিযুক্ত কোন একটি বস্তুর গতিজন্য (কাক যখন মনুমেণ্ট থেকে উড়ে চলে যায়), বিযুক্ত ছুটি বস্তুরই গতিজন্য (যখন বিপরীত দিক থেকে আগত ছুটি মার্বেল খণ্ড একসঙ্গে ধাক্কা লেগে ছড়িয়ে পড়ে) এবং অন্যবিভাগজন্য (আমার হাত থেকে কলমটি ছেড়ে দিলে হাতের সঙ্গে কাগজেরও বিভাগ হবে)।

পরত্ব ও অপরত্ব দ্বিবিধ—কালগত ও দেশগত। কালগতভাবে এরা অতীত ও বর্তমান বোঝায়, আর দেশগতভাবে দূর ও নিকট।

পরত্ব ও অপরত্ব দ্বিবিধ—কালগত ও দেশগত।

বুদ্ধি বা জ্ঞান বৈশেষিকদের মত দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বৈশেষিক ব্যাখ্যা ন্যায় ব্যাখ্যার অনুরূপ। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতি আত্মার আগন্তুক গুণ। দেহসংযুক্ত হলেই আত্মায় এই সমস্ত গুণের আবির্ভাব হয়। প্রযত্ন ত্রিবিধ—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনায়নি (জৈব ক্রিয়া)। গুরুত্ব বস্তুর পতনের কারণ। দ্রবত্ব জল, দুধ প্রভৃতি দ্রব্যের প্রবাহিত হওয়ার হেতু। স্নেহগুণের জন্যই বিভিন্ন বস্তু এক সঙ্গে তাল পাকাতে পারে। এই গুণ একান্তভাবেই জলের, অন্য কোন দ্রব্যের নয়।

জ্ঞান দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

সংস্কার ত্রিবিধ—বেগ (যার জন্য কোন বস্তু গতিশীল হয়), ভাবনা বা মানসিক সংস্কার (যার জন্য স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব) এবং স্থিতিস্থাপক (যার জন্য রাবার গার্টারের মত কোন বস্তু টানলেও পরক্ষণেই সাম্যাবস্থায় ফিরে যায়)। বিধিনির্দিষ্ট কর্ম করলে ধর্ম এবং নিষিদ্ধ কর্মে অধর্ম। ধর্মের ফল সুখ আর অধর্মের ফল দুঃখ।

সংস্কার ত্রিবিধ—বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক।

এইক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে—বৈশেষিকেরা চতুর্বিংশতি গুণ স্বীকার করলেন কেন? কিছু বেশী বা কিছু কম সংখ্যক গুণ স্বীকার করলে ক্ষতি ছিল কি? পঞ্চানন শাস্ত্রী লিখিত 'ভাষাপরিচ্ছেদ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। কৌতূহলী পাঠক তা পড়লে উপকৃত হবেন। আমরা এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে বৈশেষিক মত উদ্ধার করে দিচ্ছি। যে সমস্ত গুণ মৌলিক এবং যাদের অন্য কোন গুণে পরিণত করা যায় না, একমাত্র সেই সমস্ত গুণই এখানে স্বীকৃত হয়েছে। মৌলিক গুণের সংযোগে একাধিক গুণের আবির্ভাব হতে পারে অথবা একটি গুণেরই অনেক বিভাগ থাকতে পারে। সেগুলো মৌলিক গুণের তালিকা প্রদানকালে উল্লেখিত হয়নি। এই দিক থেকে বিচারে চতুর্বিংশতি গুণই হয়, বেশীও নয় আবার কমও নয়।

চতুর্বিংশতি গুণই মৌলিক গুণ।

৩। কর্ম[১]

কর্ম গুণের মতই কোন না কোন দ্রব্যেই থাকে। অর্থাৎ দ্রব্যেরই কর্ম সম্ভব। কিন্তু কর্ম দ্রব্য ও গুণ উভয় থেকেই ভিন্ন। দ্রব্য কর্ম ও গুণ উভয়েরই আধার বা অধিষ্ঠান। গুণ দ্রব্যের নিষ্ক্রিয় বিশেষণ, কিন্তু কর্ম ক্রিয়াবোধক বিশেষণ। সংযোগ এবং বিভাগ কর্মের জন্যই হয়। কর্মের কোন গুণ থাকতে পারে না, গুণ একমাত্র দ্রব্যেই থাকে। কর্ম একমাত্র ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ প্রভৃতির মত মূর্ত দ্রব্যেই থাকতে পারে। আকাশ, দিক (দেশ), কাল এবং আত্মার মত অমূর্ত দ্রব্যের কোন কর্মই সম্ভব নয়। বৈশেষিকদর্শন স্থির-দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছে এবং এইদিক থেকে সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে এর মতভেদ সুস্পষ্ট, সাংখ্যদর্শনে জড়জগতে কোন স্থির দ্রব্যই স্বীকৃত হয়নি।[২]

কর্ম গুণের মতই কোন না কোন দ্রব্যে থাকে।

কর্ম পাঁচ প্রকার—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন।[৩] উর্ধ্বস্থিত কোন বস্তুর সঙ্গে সংযোগ হতে হলে উৎক্ষেপণ আবশ্যক (গাছের উর্ধ্ব শাখায় ঢিল লাগাতে হলে ঢিল ওপরের দিকে ছুঁড়তে হয়), নিম্নস্থিত বস্তুর সঙ্গে সংযোগের জন্য দরকার অবক্ষেপণ (দোতলা বাড়িতে দাঁড়িয়ে ভিখারীকে পয়সা দিতে হলে নিচের দিকেই ছুঁড়তে হয়)। কোন বস্তুর কাছাকাছি অংশের সংযোগের জন্য আকুঞ্চন আবশ্যক এবং এর বিপরীত প্রক্রিয়া প্রসারণ। এ ছাড়া, অন্য সমস্ত কর্মই গমন নামে আখ্যাত হয়েছে। সমস্ত কর্মই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য দ্রব্যের কর্মই প্রত্যক্ষগম্য। গুরুত্ব, দ্রবত্ব, বেগ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, অভিঘাত, নোদন ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার কর্মের কারণ।

কর্ম পাঁচ প্রকার—অবক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ, প্রসারণ, আকুঞ্চন, এবং গমন।

যদি প্রশ্ন করা যায়—কর্ম পাঁচ প্রকার হবে কেন? ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন কি কর্ম নয়? তদুত্তরে অন্নং ভট্ট বলেছেন, এগুলো গমনের অন্তর্গত।

৪। সামান্য

কোন একটি শ্রেণীর সমস্ত ব্যক্তিই একটি সাধারণ প্রকৃতির অধিকারী বলে একই নামে অভিহিত হয়। রাম, শ্যাম, যদু, মধু সবাই ত মানুষ, কারণ তারা সকলেই 'মনুষ্যত্ব' এই সাধারণ প্রকৃতির অধিকারী। যে সাধারণ প্রকৃতির জন্য কোন একটি শ্রেণীর সমস্ত ব্যক্তিই একই নামে পরিচিত হয়, তাকেই বলে সামান্য। মানুষজাতির ক্ষেত্রে সামান্যের নাম মনুষ্যত্ব। পাশ্চাত্য দর্শনে একে 'universal' বলে। অবশ্য প্লেটো যাকে 'Idea' বলেছেন সামান্য সে জিনিস নয়। কারণ, প্লেটোর মতে ব্যক্তি ধারণার অনুকৃতি[৪] মাত্র। কিন্তু বৈশেষিকদর্শনে ব্যক্তি সামান্যের

যে সাধারণ প্রকৃতির জন্য কোন একটি শ্রেণীর সমস্ত ব্যক্তিই একই নামে পরিচিত হয় তাকেই বলে সামান্য।

১। তর্ক সংগ্রহ ৮৭ পৃষ্ঠা, বৈশেষিক সূত্র ১।১।২৭, তর্কামৃত ৩০ পৃষ্ঠা।
২। Outlines of Indian Philosophy ২৩৩ পৃষ্ঠা।
৩। বৈশেষিক সূত্র ও প্রশস্তপাদ ভাষ্যে স্বীকৃত।
৪। Copy; এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা লেখকের 'দর্শনের ভূমিকা' ৮৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

কোন অনুকরণ নয়। সামান্য সমস্ত ব্যক্তিতেই বর্তমান, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে তা ভিন্ন ভিন্ন নয়।

ভারতীয় দর্শনে সামান্য সম্পর্কে তিন প্রকার মতবাদ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের মতে স্বলক্ষণই আছে, ব্যক্তি-ভিন্ন জাতি বলে কিছু নেই। কতকগুলো জিনিস সম্বন্ধে যে আমাদের একরূপ ধারণা হয় তার কারণ তারা এক নামে পরিচিত। একমাত্র নামটাই সামান্য এবং এই নাম কতকগুলো ব্যক্তিতে অবস্থিত কোন সাধারণ গুণ বা প্রকৃতি বোঝায় না। একই নামে অভিহিত ব্যক্তিরা অন্য নামে অভিহিত ব্যক্তি থেকে যে ভিন্ন, তার একমাত্র কারণ তাদের নাম ভিন্ন। কতকগুলো জন্তুকে যে গরু বলা হয় তার কারণ এই নয় যে, এদের কোন সাধারণ প্রকৃতি বর্তমান, আসল কারণ এই যে, এরা অন্য নামের জন্তু থেকে ভিন্ন।[১] সুতরাং নঞর্থক তাৎপর্যযুক্ত নাম (অন্য ব্যাবৃত্তি) ভিন্ন সামান্য বলে কিছু নেই। এই মতবাদের নাম অপোহবাদ।

ভারতীয় দর্শনে সামান্য সম্পর্কে তিন প্রকার মতবাদ প্রচলিত। বৌদ্ধেরা সামান্য বলতে অন্য ব্যাবৃত্তি বোঝেন।

জৈন[২] এবং অদ্বৈতবেদান্তীদের[৩] মতে সামান্য ব্যক্তির অতিরিক্ত কোন কিছু বোঝায় না। একই জাতির অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তির অপরিহার্য স্বরূপই সামান্য। সুতরাং অস্তিত্বের দিক থেকে ব্যক্তি ও সামান্য কখনই একান্ত ভিন্ন হতে পারে না। সামান্য ব্যক্তিতেই থাকে। ব্যক্তি ও সামান্যের সম্পর্ক আসলে তাদাত্ম্য সম্পর্ক।

জৈন ও অদ্বৈতবাদীদের মতে সামান্য ব্যক্তির অতিরিক্ত কিছু নয়।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে সামান্যের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৪] ন্যায়বৈশেষিক মতে সামান্য অনেকান্তগত (বিভিন্ন ব্যক্তিগত) কিন্তু অনেক বা বিভিন্ন ব্যক্তি থেকে ভিন্ন এক নিত্য পদার্থ। একই জাতির অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তিতেই একই সামান্যের অবস্থান।[৫] একই জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুর একরূপতার ধারণা আমরা সামান্য থেকেই পাই। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কোন কোন বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী[৬] দার্শনিকও অনেকান্তগত নিত্যসত্তাকে সামান্য (universal) বলেছেন।[৭] সামান্য দেশে-কালে থাকে না। দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে (দ্রব্য গুণকর্মবৃত্তি)। বৈশেষিকদর্শনের এই মত অনেক আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকও স্বীকার করেন।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে সামান্য অনেকান্তর্গত ও নিত্য।

১। সর্ব দর্শন সংগ্রহ ১৩-১৪ পৃষ্ঠা।
২। প্রমেয় কমল মার্তণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়।
৩। বেদান্ত পরিভাষা, প্রথম অধ্যায়।
৪। তর্ক সংগ্রহ ৮৭ পৃষ্ঠা ; পদার্থ ধর্ম ১৬৪ পৃষ্ঠা ; 'নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বম্', সামান্যের লক্ষণ। ভাষাপরিচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ ৫৩ পৃষ্ঠা।
৫। 'সমানানাং ভাবঃ সামান্যম্' এরূপ অর্থ করলে সামান্য শব্দের দ্বারা সাধারণ ধর্ম বুদ্ধির বিষয় হয়। ঘটবৎ ভূতলম্, ঘটবৎ ভূতলম্, ঘটবৎ ভূতলম্, এরূপ বলায় ঘট সামান্য হবে। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে এই অর্থে সামান্য শব্দ ব্যবহার হয় না। সামান্য এই দর্শনে পারিভাষিক অর্থে গৃহীত।
৬। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী—Realist.
৭। Russell ; The Problems of Philosophy নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

উদয়নাচার্য দ্রব্যকিরণাবলীতে কোথায় কোথায় সামান্য হয় না, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উদয়নাচার্যের মতে জাতিবাধক ছয়টি—(১) ব্যক্তির অভেদ, (২) তুল্যত্ব, (৩) সঙ্কর (৪) অনবস্থা (৫) রূপহানি এবং (৬) অসম্বন্ধ বা সমবায়ের অভাব।[১] ন্যায়মতে আকাশ একটিই আছে। ফলে আকাশত্বের পক্ষে অনেকের মধ্যে থাকা (অনেকানুগত) সম্ভব নয়। সুতরাং আকাশত্ব জাতি নয়, শব্দাশ্রয়ত্বরূপ উপাধিমাত্র। ঘটত্ব ও কলসত্ব দুটি ভিন্ন জাতি নয়। কারণ ঘটও কলস তুল্য। অর্থাৎ যা ঘট তা কলসও আবার যা যা কলস তা ঘটও। দুটি জিনিস স্থলবিশেষে সমানাধিকরণ আবার স্থলবিশেষে পরস্পরের অভাবের সঙ্গে সমানাধিকরণ হলে তাদের একত্র অবস্থিতিকে সঙ্কর বলে।

ব্যক্তির অভেদ, তুল্যত্ব, সঙ্কর, অনবস্থা, রূপহানি এবং সমবায়ের অভাব জাতিবাধক।

ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূতে ভূতত্ব ও মূর্তত্ব দুইই থাকে। আবার মনে মূর্তত্ব আছে, ভূতত্ব নেই এবং আকাশে ভূতত্ব আছে, মূর্তত্ব নেই। সেজন্য এখানে সঙ্কর হয়েছে। সঙ্কর জাতিবাধক। ভূতত্ব ও মূর্তত্ব পরস্পরের অভাবের সমানাধিকরণ হয়েও একত্র অবস্থান করে বলে এরা জাতি নয়। যদি এরা জাতি হয়, তবে গোত্ব ও অশ্বত্বের একত্র অবস্থিতি স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ গো অশ্বও বা অশ্ব গোও এইরূপ বলতে হয়। তা বলা সম্ভব নয়। সহজ কথায়, দুটি জাতি একত্র থাকতে পারে না। যেমন গোত্ব ও অশ্বত্বের পক্ষে একত্র থাকা সম্ভব নয়। ভূতত্ব ও মূর্তত্ব ক্ষিতি, অপ প্রভৃতির মধ্যে একত্র থাকতে পারে বলে এরা জাতি নয়।

বৈশেষিকেরা সামান্যের সামান্য স্বীকার করেন না। কারণ, তা হলে অনবস্থা দোষ হয়। যদি সামান্যের সামান্য স্বীকৃত হয়, তবে তারও সামান্য স্বীকার করতে হবে, আবার তারও সামান্য এবং এই প্রক্রিয়ার শেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। গোত্ব ও অশ্বত্ব দু'ই সামান্য। গোত্ব ও অশ্বত্বকে ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করে যদি তাদের একটি সামান্য জাতি স্বীকার করা হয়, তবে গোত্ব ও অশ্বত্ব ও তাদের সামান্যত্বেরও আবার সামান্য কল্পনা করা যায়। ফলে অনবস্থা দেখা দেয়। সামান্য স্বীকার করলে যদি দ্রব্যের স্বরূপের হানি হয়, তবে সামান্য স্বীকার করা যায় না। বৈশেষিক মতে বিশেষ নিত্য দ্রব্যের অসাধারণ ধর্ম। ক্ষিতি, অপ প্রভৃতি পরমাণু এবং অন্য নিত্যদ্রব্যের বিভিন্ন বিশেষের সামান্য ধর্ম বিশেষত্ব স্বীকার করলে বিশেষের স্বরূপ যে অসাধারণ ধর্ম তা নষ্ট হয়। সেইজন্য বিশেষত্ব বলে কোন জাতি হতে পারে না। সামান্য ব্যক্তিতে সমবায় সম্পর্কে থাকে। কিন্তু সমবায় এবং অভাব পদার্থে কিছুই সমবায় সম্পর্কে থাকতে পারে না বলে সমবায় ও অভাবের সামান্য থাকতে পারে না। ন্যায়বৈশেষিক মতে সমবায়ত্ব ও অভাবত্ব জাতি নয়, অখণ্ডোপাধি।

জাতিবাধকের ব্যাখ্যা।

ব্যাপকতা অনুসারে সামান্য তিন ভাগে বিভক্ত—পর (সবচেয়ে ব্যাপক সামান্য),

১। ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ।
রূপহানিরসম্বন্ধো জাতি-বাধক-সংগ্রহঃ॥

অপর (সবচেয়ে কম ব্যাপক সামান্য), এবং পরাপর (মাঝামাঝি রকম ব্যাপক সামান্য)।[১] সত্তা পর সামান্য, কারণ এর চেয়ে ব্যাপক সামান্য আর কিছু নেই। সমস্ত ঘটগত সামান্য ঘটত্ব অপর সামান্যের উদাহরণ, এর চেয়ে কম ব্যাপক সামান্য আর হয় না। দ্রব্যত্ব সামান্য সত্তাসামান্যের চেয়ে কম ব্যাপক এবং ঘটত্ব সামান্য থেকে বেশী ব্যাপক বলে পরাপর সামান্য নামে স্বীকৃত।

ব্যাপকতা অনুসারে সামান্য ত্রিবিধ—পর, অপর এবং পরাপর।

ন্যায়বৈশেষিক-স্বীকৃত সামান্যের ধারণা দোষমুক্ত নয়। বৌদ্ধ এবং অদ্বৈতবেদান্তী দার্শনিকেরা বৈশেষিক-সম্মত সামান্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। সামান্য যদি নিত্য এবং অনেকান্তগত হয়, তবে নতুন উদ্ভূত কোন ব্যক্তি বা বিষয়ে নৈয়ায়িকেরা সামান্যের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করবেন কি করে? তারপর যখন সেই ব্যক্তি বা বিষয় ধ্বংস হবে তখনই বা তাঁরা সামান্যের তিরোভাবের কি ব্যাখ্যা দেবেন? যখন মাটি দিয়ে কোন ঘট নির্মাণ করা হয় তখন নতুন নির্মিত ঘটে নিত্য ঘটত্বের আবির্ভাব হবে কি করে? আবার এই ঘট যখন ধ্বংস হবে তখন নিত্য ঘটত্বের তিরোভাবই বা এই ঘটে কি করে হবে? যদি বিবর্তনের ফলে কোন একটি জাতির সমস্ত ব্যক্তি লুপ্ত হয়, তবে সেই জাতি বা সামান্য থাকবে কোথায়? তারপর জাতি যখন ব্যক্তিত্বে অনুগত থাকে তখন কি পূর্ণতঃ না অংশতঃ অনুগত থাকে? যদি বলা যায় পূর্ণতঃ অনুগত থাকে, তবে জাতি একটি ব্যক্তিত্বেই সম্পূর্ণ অনুগত থাকবে এবং অন্য ব্যক্তিতে থাকতেই পারবে না। আবার যদি বলা যায় অংশতঃ অনুগত থাকে, তবে একই সঙ্গে কোন ব্যক্তি, যেমন অশ্ব, অংশতঃ অশ্বত্ব বিশিষ্ট এবং অংশতঃ অন্য কিছু, যেমন গোত্ব বিশিষ্ট হবে। এ সবই অসম্ভব।

ন্যায়বৈশেষিক স্বীকৃত সামান্যের ধারণা দোষমুক্ত নয়। বৌদ্ধ ও অদ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা বৈশেষিক সম্মত সামান্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

ন্যায়বৈশেষিক মতে সত্তা পরজাতি। অর্থাৎ সমস্ত দ্রব্য, গুণ এবং কর্মই সত্তাবিশিষ্ট। তাহলে আমরা যখন বলি 'অশ্ব নয়' তখন 'সত্তাবিশিষ্টঅশ্ব অসত্তা বিশিষ্ট' এই অদ্ভুত কথা বলি। অথবা যখন বলি 'অশ্ব' তখন 'সত্তা বিশিষ্ট অশ্ব সত্তা বিশিষ্ট,' বলে একই কথার পুনরুক্তি করি।

সত্তা পরজাতি বলে স্বীকৃত হলে নানা অসুবিধা হয়।

ন্যায়বৈশেষিক মতে সামান্য নিত্য এবং অনেকান্তগত বলে কোন কোন বিশেষ দৃষ্টান্ত একাধিক সামান্যের অন্তর্গত হবে। যেমন একটি বিশেষ গো একই সঙ্গে গোত্ব জাতি বিশিষ্ট, দ্রব্যত্ব জাতি বিশিষ্ট আবার সত্তাজাতি বিশিষ্ট হবে। এবং ন্যায়বৈশেষিক মতে একই ব্যক্তিতে বিভিন্ন জাতি থাকায় জাতিসঙ্কর হবে। এবিষয়ে ন্যায়ের বক্তব্য খুব জটিল। আমরা তা এখানে আলোচনা করছি না। আমরা পূর্বেই বলেছি, ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকেরা জাতিসঙ্করকে জাতির বাধক বলে উল্লেখ করেছেন।

ন্যায়বৈশেষিকদের সামান্য সম্বন্ধে ধারণা গ্রহণ করলে জাতি-সঙ্কর দোষের আশঙ্কা প্রবল।

১। ভাষা পরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলী ৮, ৯

৫। বিশেষ[১]

বিশেষ সামান্যের সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ পরমাণু, আকাশ, দিক (দেশ), কাল, মন, আত্মা প্রভৃতি নিরবয়ব নিত্য দ্রব্যের স্বরূপগত স্বাতন্ত্র্যকেই বিশেষ বলা হয়। যেখানে অন্য কোন ভেদনিয়ামক নেই সেখানে বিশেষই ভেদনিয়ামক। অপ বা জলের একটি পরমাণু থেকে আর একটি পরমাণুর পার্থক্য কি করে নির্ণয় করা যায় ? একটি মন বা আত্মা থেকে অন্য আর একটি মন বা আত্মার তফাৎ কোথায় ? এরা যে ভিন্ন এবিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু এদের পার্থক্য অবয়বভিন্নতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ এরা নিরবয়ব। সুতরাং এদের তফাৎ করার জন্য এসব দ্রব্যের স্বরূপগত স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। অন্য কোনভাবেই যে সব দ্রব্যের পার্থক্য করা যায় না তাদেরই পার্থক্য করা হয় এদের স্বরূপগত স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে। এই সব দ্রব্যের স্বরূপগত স্বাতন্ত্র্যকেই বিশেষ বলে।[২]

নিত্য দ্রব্যের স্বরূপগত স্বাতন্ত্র্যকে বিশেষ বলে।

বিশেষ একমাত্র নিত্যদ্রব্যেই অবস্থান করে বলে নিজেও নিত্য। সাবয়ব কোন দ্রব্যেরই কোন বিশেষ নেই, কারণ এদের ত অবয়বের ভিত্তিতেই পৃথক করা যায়। একমাত্র নিরবয়ব দ্রব্যেরই পারস্পরিক পার্থক্যের জন্য বিশেষ স্বীকার করা হয়। নিত্য ও নিরবয়ব দ্রব্য বিশেষের ভিত্তিতে ভিন্ন বলে জানা যায়। এখানে প্রশ্ন উঠবে—ভিন্ন ভিন্ন বিশেষের ভিন্নতা জানার উপায় কি ? বৈশেষিকেরা বলেন, এরা স্বতঃব্যাবৃত্ত, অর্থাৎ এরা নিজেরাই ভিন্ন, এদের ভিন্নতার জন্য অন্য কিছু স্বীকার করার দরকার নেই। যদি এদের ভিন্নতার জন্য অন্য কিছু স্বীকার করতে হয়, তবে তারও ভিন্নতার জন্য আবার অন্য কিছু স্বীকার করতে হবে এবং এভাবে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। বৈশেষিক মতে বিশেষ পরমাণুর মতই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, অতীন্দ্রিয়।

বিশেষ নিত্য, স্বতঃ-ব্যাবৃত্ত এবং অতীন্দ্রিয়।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে বিভিন্ন বিশেষ স্বীকৃত হলেও বিভিন্ন বিশেষের কোন সাধারণ ধর্ম বা সামান্য স্বীকৃত নয়। ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকেরা বলেন, বিশেষ অসাধারণ ধর্ম, সুতরাং বিভিন্ন বিশেষের সাধারণ ধর্ম থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষের সামান্য স্বীকৃত হলে রূপহানি বা বিশেষের স্বরূপহানি হয় ; বিশেষ আর বিশেষ থাকে না।

বৈশেষিকেরা বিভিন্ন বিশেষের সাধারণ ধর্ম বা সামান্য স্বীকার করেন না।

বৈশেষিক স্বীকৃত বিশেষের ধারণা ত্রুটিহীন নয়। বৈশেষিক দার্শনিকেরা প্রতিটি বিশেষকে স্বতঃব্যাবৃত্ত বলেছেন। কিন্তু তাঁরা যদি প্রত্যেক নিত্য দ্রব্যকেই স্বতঃব্যাবৃত্ত বলতেন, তবে অতিরিক্ত বিশেষ পদার্থ আর স্বীকার করতে হত না এবং তাতে লাঘব হত। যে পদার্থ না মানলেও চলে, সে পদার্থ মানা দোষের।

বৈশেষিকেরা বিশেষ পদার্থ স্বীকার করে লাঘব-নীতি লঙ্ঘন করেছেন।

বৈশেষিকেরা পৃথকত্ব নামে একটি গুণ স্বীকার করেছেন। তাঁরা এই গুণের

১। ভাষা পরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলী ১০, পদার্থ ধর্ম ১৬৮ পৃষ্ঠা।
২। নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়োঽন্ত্যা বিশেষাঃ—প্রশস্তপাদ ভাষ্য।

ভিত্তিতেই ত নিত্যদ্রব্যের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারতেন। অযথা লাঘবনীতি লঙ্ঘন করে তাঁরা আবার বিশেষ পদার্থ স্বীকার করতে গেলেন কেন ?

৬। সমবায়

সংযোগ ও বিভাগ সম্বন্ধের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধের পার্থক্য।

দর্শনে মুখ্যতঃ তিন প্রকার সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়—সংযোগ, বিভাগ ও সমবায়। ন্যায়বৈশেষিক মতে সংযোগ ও বিভাগ সম্বন্ধ কোন দ্রব্য নয়, দ্রব্যের গুণ। গুণ পদার্থ আলোচনা করার সময় আমরা 'সংযোগ' ও 'বিভাগ' সম্পর্কে অনেক কথা বলেছি। সমবায় সংযোগ বা বিভাগের মত কোন গুণ নয়, ভিন্ন জাতীয় পদার্থ।

আধার আধেয়ভূত অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধকে সমবায় বলে।

পরস্পর সংযুক্ত না হয়েও যে দুটি জিনিস থাকতে পারে (যুতসিদ্ধ) তাদের মধ্যে অনিত্য সম্বন্ধকে সংযোগ বলে। টেবিলের ওপর কোন একটি বই রাখলে বইটির সঙ্গে টেবিলের যে সম্বন্ধ হয় তা-ই সংযোগ। এই সম্বন্ধ কোন একটি বিশেষ সময়েই সংঘটিত হয় এবং আবার হয়ত কোন এক সময় থাকে না। সেইজন্যই এই সম্বন্ধকে অনিত্য বা সাময়িক বলা হয়। সংযোগসম্বন্ধ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তা সংযুক্ত দ্রব্যের গুণ হিসেবেই থাকে। এই সম্বন্ধ একান্তভাবেই আকস্মিক, কোন দিক থেকেই আবশ্যিক নয়। সংযুক্ত দুটি বা ততোধিক বস্তু বিযুক্ত হলেই বিভাগ ঘটে। অজ সংযোগের ক্ষেত্রে অবশ্য এই নিয়ম খাটবে না। বিভাগ বিযুক্ত বস্তুর গুণ। এ সম্বন্ধও সাময়িক ও আকস্মিক।

সমবায় পাঁচ প্রকার।

সমবায় এমন দুটি জিনিসের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ প্রকাশ করে যাদের একটি অন্যটির মধ্যে থাকে (আধার—আধেয়) এবং একটি যা অন্যটির মধ্যে থাকে তা যার মধ্যে থাকে তাকে ছাড়া থাকতেই পারে না (অযুতসিদ্ধ)।[১] অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ বা সমবায় পাঁচটি ক্ষেত্রে অনুভব সিদ্ধ :—(১) অবয়ব ও অবয়বীর সম্বন্ধ (২) দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ, (৩) দ্রব্য ও কর্মের সম্বন্ধ, (৪) দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সঙ্গে জাতির সম্বন্ধ এবং (৫) বিশেষের সঙ্গে নিত্য দ্রব্যের সম্বন্ধ।[২] এদের মধ্যে অবয়বী অবয়ব ছাড়া, গুণ ও কর্ম দ্রব্য ছাড়া, দ্রব্য, গুণ ও কর্মজাতি ছাড়া এবং বিশেষ নিত্য দ্রব্য ছাড়া থাকতেই পারে না। সেইজন্যই এ সম্বন্ধকে নিত্য সম্বন্ধ বলা হয়। নৈয়ায়িকদের মতে সমবায় প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, কিন্তু বৈশেষিক দার্শনিকেরা সমবায়কে প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য বলেন না।[৩]

১। 'অযুত সিদ্ধানামাধার্যাধার ভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহ প্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়' ইতিঃ—ভাষা পরিচ্ছেদ ৭১ পৃঃ।

২। ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্মনোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্তিতঃ॥ ভাষা পরিচ্ছেদ ৭১ পৃঃ।
সমবায় সম্বন্ধ সম্পর্কে ন্যায়কন্দলী টীকায় বলা হয়েছে—যে দুটি বস্তু আধার ও আধেয় হতে হলে একটিকে বর্জন করে অপরের আধার আধেয়ভাব সম্পন্ন হয় না, এমন দুটি বস্তুকে অযুতসিদ্ধ বলা হয়। এইরূপ অযুতসিদ্ধ দুটি বস্তুর সম্বন্ধের নাম সমবায়।

৩। তর্ক কৌমুদী ৮ পৃঃ, ভাষাপরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলী ২৬০ পৃঃ।

সংযোগ বা বিভাগ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ দুটি দ্রব্য বিপরীতভাবেও একই সম্বন্ধ প্রকাশ করে। অর্থাৎ হাতের সঙ্গে কাগজের সংযোগ হলে কাগজের সঙ্গেও হাতের সংযোগ হবে। বা হাতের সঙ্গে কাগজের বিভাগ হলে কাগজের সঙ্গে হাতেরও বিভাগ হবে। কিন্তু সমবায়ের ক্ষেত্রে একথা সত্য নয়। গুণ দ্রব্যে থাকে, কিন্তু দ্রব্য কখনই গুণে থাকে না।

সংযোগ ও বিভাগের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধের আরও পার্থক্য।

বৈশেষিক মতে সমবায় সম্বন্ধ পাঁচটি ক্ষেত্রে অনুভব সিদ্ধ বলে স্বীকৃত। ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকেরা লাঘবনীতি অনুসরণ করে মাত্র একটি সমবায় স্বীকার করেন। তাঁরা সমবায়ত্ব নামে কোন সামান্য স্বীকার করেন না। সমবায়ের ক্ষেত্রে সামান্য স্বীকার না করার কারণ আমরা সামান্য আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

বৈশেষিক মতে সমবায় একটিই, তবে তার পাঁচটি প্রকার বর্তমান।

সমবায় সম্বন্ধ আধার-আধেয় সম্বন্ধ বলে, এই সম্বন্ধ ভাব পদার্থের মধ্যেই থাকতে পারে।

ভাট্ট ও বেদান্তিগণ সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করেন নি। তাঁরা সমবায় স্থলে তাদাত্ম্য স্বীকার করেছেন। ভাট্ট মীমাংসকেরা তাদাত্ম্য বলতে ভেদ-সহিষ্ণু-অভেদ বুঝেছেন। তাঁরা বলেন, জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ ভেদের মধ্যে অভেদের সম্বন্ধ। জাতি ব্যক্তি থেকে ভিন্ন হয়েও অভিন্ন।

ভাট্ট ও বেদান্তিগণ সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। তাঁরা সমবায়কে তাদাত্ম্য বলেন।

প্রাভাকর মীমাংসকেরা সমবায়কে স্বতন্ত্র পদার্থ বলে স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে সমবায় নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। নিত্য অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সমবায় নিত্য। নিত্য ও অনিত্য বা অনিত্য অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সমবায় অনিত্য। ন্যায়-বৈশেষিক মতে সমবায় মাত্র একটি, তবে তার পাঁচটি বিভিন্ন প্রকার বর্তমান। প্রাভাকর মতে সমবায় মাত্র একটি নয়, বহু।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, নৈয়ায়িকেরা স্বরূপ সম্বন্ধ নামে চতুর্থ প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই সম্বন্ধের ক্ষেত্রে একটি সম্বন্ধীই সম্বন্ধ বলে একে স্বতন্ত্র পদার্থ বলে স্বীকার করা হয়নি। জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ স্বরূপ সম্বন্ধ। জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে জ্ঞান একটি সম্বন্ধী, আবার জ্ঞান বিষয়ের সম্বন্ধও বটে।

প্রাভাকর মীমাংসকেরা সমবায়কে স্বতন্ত্র পদার্থ বলেন। তাঁদের মতে সমবায় নিত্য ও অনিত্য দুইই হতে পারে। সমবায় একটি নয়, বহু। স্বরূপ সম্বন্ধ সমবায় নয়।

মাধ্ব বেদান্তী ব্যাসতীর্থ তর্কতাণ্ডবে সমবায়বাদ খণ্ডন করেছেন। শঙ্করাচার্য শারীরক ভাষ্যে ন্যায়বৈশেষিক মত-খণ্ডন-প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদে 'অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা' সূত্রের ভাষ্যে সমবায়ের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তির অবতারণা করেছেন। আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে শঙ্করাচার্যের মূল কথা বলছি।

ব্যাসতীর্থ ও শঙ্কর সমবায় খণ্ডন করেছেন।

বৈশেষিক মতে অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধের নাম সমবায়। শঙ্করাচার্য প্রশ্ন করেছেন—পদার্থদ্বয়ের দুইটিই কি অযুতসিদ্ধ? না, একটি অযুতসিদ্ধ? বৈশেষিক

মতে কার্য উপাদান-কারণ সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ। উপাদান কারণ কার্যের পূর্বেই থাকে। স্থতরাং শঙ্কর বলেন, এই অবস্থায় কারণ অযুতসিদ্ধ নয়, অর্থাৎ দুটি পদার্থই অযুতসিদ্ধ হতে পারে না। তবে কি কার্য বা একটি পদার্থ অযুতসিদ্ধ? উপাদান কারণের সঙ্গে অযুতসিদ্ধ কার্যের যে সম্বন্ধ তাই কি সমবায়? তাও হতে পারে না। কার্য যতক্ষণ অসিদ্ধ ছিল, অর্থাৎ হয় নাই, ততক্ষণ কিরূপে কারণের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধ হতে পারে? আর তা যদি না পারে, তবে কার্য অযুতসিদ্ধ হবে কি করে? এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সমবায় সম্বন্ধ আসলে যুতসিদ্ধ পদার্থেরই সম্বন্ধ। স্থতরাং সমবায় সম্বন্ধ আসলে সংযোগ সম্বন্ধ। কারণ, বৈশেষিক মতে যুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধকে সংযোগ সম্বন্ধই বলে। অর্থাৎ সংযোগ অতিরিক্ত সমবায় বলে বিশেষ সম্বন্ধ স্বীকারের কোন যুক্তিই নেই।

সমবায়ের বিরুদ্ধে শঙ্করের মূল যুক্তি।

বৈশেষিকেরা সমবায়কে বলেছেন পদার্থ, আর সংযোগকে বলেছেন গুণ। কিন্তু দুটিই ত সম্বন্ধ, যদিও প্রথমটি অযুতসিদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি যুতসিদ্ধ। আবার সমবায় সম্বন্ধ দুটি বিষয় থেকে ভিন্ন বলে সমবায়ের সঙ্গে এ দুটি বিষয়ের সম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে এবং এই দ্বিতীয় সম্বন্ধ আবার তৃতীয় একটি সম্বন্ধ সূচনা করবে এবং এমনি করে দেখা দেবে অনবস্থা। আবার যদি সমবায় সম্বন্ধ দুটি বিষয় থেকে ভিন্ন না হয়, তবে কোথায় তা সমবেত হয়? যদি তা একটি বিষয়ে সমবেত হয়, তবে তা অন্য বিষয়কে সম্বদ্ধ করতে পারবে না, আর যদি তা দ্বিতীয় বিষয়ে সমবেত হয়, তবে তা প্রথম বিষয়কে সম্বদ্ধ করতে পারবে না। আবার একই সমবায় দুটি বিষয়েও থাকতে পারে না, কারণ সমবায়ের ভেদ সম্ভব নয়। স্থতরাং সমবায় অসিদ্ধ।

৭। অভাব

ন্যায়বৈশেষিক মতে বিষয় ছাড়া কোন জ্ঞানই হতে পারে না। আমরা অনেক সময়ই বিভিন্ন বস্তুর অভাবের জ্ঞান পাই। দিনের আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন বলি 'আকাশে তারা নেই', তখন ত আমাদের তারার অভাব জ্ঞানই হয়। এই অভাব জ্ঞানের বিষয় হিসেবে বৈশেষিকেরা 'অভাব' নামে একটি পদার্থ স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পূর্বে আলোচিত ছটি ভাবপদার্থের অতিরিক্ত 'অভাব' সপ্তম পদার্থ নামে গৃহীত।

একথা সত্য যে কণাদ মুনি পদার্থের তালিকা প্রস্তুত কালে 'অভাব'কে স্বতন্ত্র পদার্থ বলে স্বীকার করেন নি। সেইজন্য অনেকে বলেন, তিনি ষড়পদার্থ গ্রহণেরই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বৈশেষিক সূত্রের অন্যান্য অংশে অভাব-জ্ঞানের বিষয় হিসেবে 'অভাব' পদার্থ স্বীকৃত হয়েছে এবং পরবর্তীকালের ভাষ্যকারেরা 'অভাব'কে সপ্তম পদার্থ বলেই গ্রহণ করেছেন।[১] তা ছাড়া, বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞানের বিষয় সব সময়েই জ্ঞানাতিরিক্ত বা জ্ঞানভিন্ন বলে স্বীকৃত। স্থতরাং এই দর্শনে অভাব-জ্ঞানের বিষয় 'অভাব' অভাব-জ্ঞানের অতিরিক্ত পদার্থ বলে গৃহীত হওয়াই সঙ্গত ও স্বাভাবিক।[২]

১। বৈশেষিক সূত্র ১।১।৪, ৯।১।১-১০, কিরণাবলী ৬ পৃষ্ঠা ; ন্যায় কন্দলী ৭ পৃষ্ঠা
২। Hiriyanna রচিত Outlines of Indian Philosophy ২৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রাভাকর মীমাংসকদের মতে অভাব অধিষ্ঠান স্বরূপ। অর্থাৎ ভূতলে ঘট নাই বলতে শুধু ভূতল বোঝায়, তবে ভূতল ঘটবিশিষ্ট হতে পারে এই সম্ভাবনাও স্বীকৃত হয়। সুতরাং প্রাভাকর মতে অভাব স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। বৌদ্ধেরা অভাবকেই একমাত্র পদার্থ বলেন এবং ভাব অভাবের দ্বারাই ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের মতে অভাব নিরধিষ্ঠান। অর্থাৎ অভাবের কোন অধিষ্ঠান নেই। এ মত প্রাভাকরদের সম্পূর্ণ বিপরীত। ন্যায়মত প্রাভাকর এবং বৌদ্ধদের আতিশয্য পরিহার করে ভাব ও অভাব উভয়কেই পদার্থ বলেছেন। তবে ন্যায়মতে অভাব অন্যত্রস্থিত ভাব পদার্থের অভাব বোঝায়। অভাব ভাবপদার্থ ভিন্ন বোঝা যায় না। কিন্তু ভাব-পদার্থ বুঝতে অভাব-পদার্থের কোন আবশ্যকতা নেই। অভাব অধিষ্ঠান এবং অন্যত্রস্থিত ভাবপদার্থ বা প্রতিযোগীর অস্তিত্ব-সাপেক্ষ। যখন আমরা বলি ঘট নেই, তখন কোন বিশেষ স্থানে (অধিষ্ঠান) ঘট নেই, একথাই বোঝাতে চাই এবং ঘট (প্রতিযোগী) অন্যত্র আছে, তাও বোঝাই। শূন্যবাদী বৌদ্ধমতে অভাবের অধিষ্ঠান নেই, অদ্বৈত মতে অভাবের অধিষ্ঠান আছে, কিন্তু প্রতিযোগী অন্যত্রস্থিত সত্যবস্তু নয়, অনির্বচনীয় বা মিথ্যা।

অধিকরণের সঙ্গে অভাবের সম্বন্ধকে ন্যায়বৈশেষিকেরা বিশেষণতা বলে উল্লেখ করেছেন। এ সম্বন্ধ সংযোগও নয়, সমবায়ও নয়। ন্যায়মতে বিশেষণতা স্বরূপ সম্বন্ধ। অধিকরণের সঙ্গে অভাবের যে বিশেষণতা সম্বন্ধ তা স্বরূপ সম্বন্ধ বলে সে সম্বন্ধ অন্য সম্বন্ধ সাপেক্ষ নয়। সুতরাং অনবস্থা দোষের কোন প্রসঙ্গই থাকতে পারে না। অভাব অধিকরণের বিশেষণ। 'ভূতলে ঘট নেই' বললে 'ঘটাভাব বিশিষ্ট ভূতল' বোঝায়।

অভাব দ্বিবিধ—সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব তাকেই বলে যে অভাব নিজের প্রতিযোগীর সংসর্গের বিরোধী হয়। এই অভাব অর্থাৎ সংসর্গাভাব যখন কোথাও থাকে, তখন সেখানে তার প্রতিযোগীর সংসর্গ থাকে না। তন্তুতে বস্ত্রের প্রাগভাব যখন থাকে, তখন ঐ তন্তুতে প্রাগভাবের প্রতিযোগী বস্ত্রের সংসর্গ থাকে না, যেহেতু তখনও ঐ তন্তুতে বস্ত্র উৎপন্ন হয়নি। যার অভাব তাকেই তার প্রতিযোগী বলে। ঘটভাবের ক্ষেত্রে ঘট প্রতিযোগী, বস্ত্রাভাবের ক্ষেত্রে বস্ত্র প্রতিযোগী।

অন্যোন্যাভাব শব্দের দ্বারা এমন অভাব বোঝায় যা তাদাত্ম্যের বিরোধী হয়। ঘট পট নয়, এই প্রতীতি অন্যোন্যাভাব বোঝায়। ঘটে পটের অন্যোন্যাভাব বা ভেদ আছে, ঘটে পটের তাদাত্ম্য থাকে না। সংসর্গাভাব আবার তিনপ্রকার হতে পারে —প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব এবং অত্যন্তাভাব।

কোন একটি বস্তু সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে সেই বস্তুর উপাদানে বস্তুটির যে অভাব তারই নাম প্রাগভাব। মাটিতে ঘটের অভাবকে প্রাগভাব বলে। যে মাটি দিয়ে ঘট তৈরি হয়, ঘট তৈরি হওয়ার আগে সেই মাটিতে ঘটের অভাব সবাই মানতে বাধ্য। ঘট তৈরি হওয়ার আগে মাটিতে ঘট কোনদিনই থাকে না, সেইজন্য মাটিতে ঘটের অভাব বা প্রাগভাব অনাদি। কিন্তু ঘট তৈরি হয়ে গেলেই এই অভাব আর থাকে না। সুতরাং প্রাগভাবের অন্ত আছে। অর্থাৎ প্রাগভাব অনাদি, কিন্তু সান্ত।

কোন একটি জিনিস ধ্বংস হয়ে গেলে ধ্বংসাবশেষে সেই বস্তুর যে অভাব তাকেই

বলে ধ্বংসাভাব। কুম্ভকার যে ঘট তৈরি করেছে, পরে তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে পারে। এই সমস্ত ঘটখণ্ডে ঘটের যে অভাব তাই ধ্বংসাভাব। কোন একটি বিশেষ সময়েই ঘটটি ভাঙে, সুতরাং ধ্বংসাভাবের আদি বা আরম্ভ আছে। কিন্তু এর অন্ত নেই, কারণ একবার ভেঙে গেলে সেই ঘটটি আর পাওয়া সম্ভব নয়। ভাবপদার্থ সৃষ্টি হলেই নিশ্চয়ই ধ্বংস হবে, কিন্তু অভাব পদার্থ একবার আবির্ভূত হলে আর তিরোহিত হয় না। ঘট ভাবপদার্থ বলে এর যেমন সৃষ্টি আছে তেমনি আবার ধ্বংসও আছে। কিন্তু ঘটটি ভেঙে দিলে যে অভাবের সৃষ্টি হয় তা আর কখনও ধ্বংস হয় না। যে ঘট ভেঙে গেছে তাকে আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়।

কোন জিনিসে অন্য আর একটি জিনিসের চিরকালীন অভাবকে অত্যন্তাভাব বলে। বায়ুতে রূপের অভাব এই শ্রেণীর অন্তর্গত।[১] বায়ুতে রূপ কোন দিনই ছিল না, এখনও নেই এবং কোনদিনই থাকবে না। অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব এবং ধ্বংসাভাব উভয় থেকেই ভিন্ন। প্রাগভাব একটা বিশেষ সময়ে শেষ হয়, কিন্তু অত্যন্তাভাব কখনই শেষ হয় না। মাটিতে ঘটের অভাব (প্রাগভাব) ঘট তৈরি হয়ে গেলেই আর থাকে না ; কিন্তু বায়ুতে রূপের অভাব (অত্যন্তাভাব) কখনও নেই, এমন হতেই পারে না ধ্বংসাভাবের আরম্ভ আছে, কিন্তু অত্যন্তাভাবের কোন আরম্ভ নেই। ঘট ভেঙে গেলেই ত ঘটখণ্ডে ঘটের অভাব (ধ্বংসাভাব) উদ্ভূত হয়, কিন্তু বায়ুতে রূপের অভাব (অত্যন্তাভাব) চিরকালই আছে বলে এর কোন আরম্ভের কথা ভাবা যায় না। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, অত্যন্তাভাব অনাদি ও অনন্ত ; এর আরম্ভও নেই, শেষও নেই।

ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সংসর্গাভাব কোন একটি বস্তুতে অন্য আর একটি বস্তুর অভাব নির্দেশ করে। কিন্তু অন্যোন্যাভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এ অভাব একটি জিনিসের সঙ্গে আর একটি জিনিসের ভেদ বোঝায়। টেবিল চেয়ার নয়, আবার চেয়ারও টেবিল নয়। অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন বস্তু একটি আর একটির অভাব প্রকাশ করে। এরই নাম অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব একটি জিনিসের সঙ্গে অন্য আর একটি জিনিসের সংসর্গের অভাব বোঝায়। যেমন শশকের শৃঙ্গ নেই, অর্থাৎ শশকের সঙ্গে শৃঙ্গের কোন সংসর্গ নেই। কিন্তু অন্যোন্যাভাব দুটি জিনিসের তাদাত্ম্যের অভাব বোঝায়। যেমন ঘট পট নয়, অর্থাৎ ঘটে ও পটে তাদাত্ম্য নেই। অত্যন্তাভাবের মতই অন্যোন্যাভাবের আরম্ভও নেই, শেষও নেই। ঘট যে পট নয়, একথা কোন বিশেষ দিনে সত্য হয়ে ওঠেনি, আবার কোন বিশেষ দিনে মিথ্যাও হয়ে যাবে না। এ অভাব চিরকালের অভাব।

জগৎ—সৃষ্টি ও প্রলয়

ভারতীয় দার্শনিকদের মতে জগৎ একটি নৈতিক রঙ্গমঞ্চ বিশেষ। জীবের শিক্ষা ও মুক্তির জন্যই জগৎ। আমরা এই প্রসঙ্গ গ্রন্থারম্ভেই আলোচনা করেছি। সুতরাং পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। জগৎ সম্পর্কে বৈশেষিক মতবাদ ভারতীয় দর্শনের এই

১। অন্নংভট্ট ভূতলে ঘট নেই, এক্ষেত্রে ঘটাভাবকেও অত্যন্তাভাব বলেছেন। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা নারায়ণ গোস্বামী রচিত 'সটীকঃ তর্ক সংগ্রহঃ' গ্রন্থের ১১৪—১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মূল সুরেই ঝঙ্কৃত। জগৎসৃষ্টি ও প্রলয়ের ব্যাখ্যার জন্য বৈশেষিকেরা সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যের উপাদানরূপে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারপ্রকার পরমাণু স্বীকার করেন। এইজন্যই এই মতবাদকে পরমাণুবাদ বলা হয়। বৈশেষিকেরা পরমাণুর সংযোগ ও বিভাগের নিয়ামক স্বরূপ একটি নৈতিক নিয়ম স্বীকার করেন। এই নিয়মটির নাম অদৃষ্ট। ন্যায়মত আলোচনার সময় আমরা 'অদৃষ্ট' কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছি। এই ব্যাপারে ন্যায় ও বৈশেষিকদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। পাঠক সেই প্রসঙ্গটি দেখে নেবেন। বৈশেষিক মতে অদৃষ্ট অচেতন। পরমেশ্বর অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং শেষ পর্যন্ত পরমেশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীনেই পরমাণুর সংযোগ ও বিভাগ, অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় হয়। ঈশ্বর জীবের কর্মফলজাত সমবেত সংস্কার বা অদৃষ্ট অনুসারে যার যা প্রাপ্য তা তাকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেবার জন্য জগতের সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির উদ্দেশ্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি এই নৈতিক আদর্শ এবং জীবের মুক্তি এই আধ্যাত্মিক পুরুষার্থ সার্থক রূপায়ণের জন্যই ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন। প্রজাদের কল্যাণকামী রাজা যেমন তাদের আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ সুবিধা সহজলভ্য করার জন্যই রাজ্যের বিধিবিধান নির্দেশ করেন, তেমনই রাজার রাজা পরমেশ্বর জীবের জীবনের যথাযোগ্য বিকাশ ও চরিতার্থতার জন্য সুশৃঙ্খল জগৎ রচনা করেছেন। এই দিক থেকে পাশ্চাত্ত্য পরমাণুবাদ ও বৈশেষিক পরমাণুবাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে আমরা যে পরমাণুবাদ পাই তা একান্তভাবেই জড়বাদ সম্মত। এই মতে অসংখ্য পরমাণু যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছে, জগৎ সৃষ্টির পেছনে কোন চেতন সত্তা, কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক আদর্শ কিছুই নেই।

ঈশ্বর জীবের অদৃষ্টানুসারে পরমাণুর সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেন।

বৈশেষিক পরমাণুবাদ জগতের একমাত্র অনিত্য অংশেরই ব্যাখ্যা দেয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ পরমাণু, আকাশ, দিক বা দেশ, কাল, মন, আত্মা প্রভৃতি জগতের নিত্যদ্রব্যের পরমাণুভিত্তিক কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এই সমস্ত নিত্যদ্রব্যের উৎপত্তিও নেই, বিলয়ও নেই। এই দিক থেকেও পাশ্চাত্ত্য পরমাণুবাদের সঙ্গে বৈশেষিক পরমাণুবাদের তফাৎ আছে। পাশ্চাত্ত্য পরমাণুবাদ অনুসারে মন, আত্মা প্রভৃতিও পরমাণুর সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণীয়। গ্রীক পরমাণুবাদী দার্শনিক ডেমোক্রাইটাস পরমাণুর কোন গুণগত ভেদ স্বীকার করেন নি। বৈশেষিকেরা তা করেন। বৈশেষিকদের মতে ক্ষিতির গন্ধ, অপ বা জলের স্বাদ, তেজ বা আগুনের রূপ এবং বায়ুর স্পর্শ গুণ বর্তমান। গ্রীকমতে পরমাণু স্বরূপতঃ গতিশীল। বৈশেষিক মতে পরমাণু স্বরূপতঃ নিশ্চল ও গতিহীন। অদৃশ্য শক্তি তাতে গতি সঞ্চার করেন। জৈনরা গ্রীকদের মতই পরমাণুর গুণগত ভেদ স্বীকার করেন না। এই দিক থেকে জৈন পরমাণু এবং বৈশেষিক পরমাণুর পার্থক্য স্পষ্ট।

পাশ্চাত্ত্য পরমাণুবাদ ও বৈশেষিক পরমাণু-বাদের তুলনা।

বৈশেষিকদের মতে অনিত্য সাবয়ব দ্রব্য পরমাণুর সৃষ্টি। পরমাণুর সংযোগ থেকে সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তি এবং এদের বিভাগের ফলে সাবয়ব বস্তুর বিনাশ। দুটি

পরমাণুর একত্র সমাবেশকে দ্ব্যনুক বলে। তিনটি দ্ব্যনুকের সমষ্টির নাম ত্র্যনুক বা ত্রসরেণু। বৈশেষিকদের মতে ত্রসরেণুই প্রথম প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তু, ত্রসরেণুর পূর্বাবস্থা দ্ব্যনুক ও পরমাণু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। দ্ব্যনুক ও পরমাণুর অস্তিত্ব অনুমান করে জানা যায়। আমরা 'দ্রব্য' আলোচনা প্রসঙ্গে পরমাণুর অস্তিত্ব বিষয়ে অনুমান বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছি। এখানে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অনিত্য সাবয়ব দ্রব্য পরমাণুর সৃষ্টি।

জগতের সমস্ত সসীম অনিত্য বস্তু চতুর্পরমাণুর দ্ব্যনুক, ত্র্যনুক ক্রমে সৃষ্ট হয়। উপাদান থেকে যখন কোন বস্তু উদ্ভূত হয় তখন একদিকে যেমন উপাদানের সংযোগ হয় অন্যদিকে তেমনি উপাদান ও উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে সমবায় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। সুতো থেকে কাপড় হয়। সুতোগুলো কাপড়ের উপাদান এবং এগুলো পরস্পর সংযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এই সংযোগ থেকে যখন কাপড় পাই তখন কাপড়ের সঙ্গে সুতোর সমবায় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সমবায় সম্পর্কের জন্যই কাপড় যে একটি নতুন বস্তু সৃষ্টি হয়েছে, একথা মানতে হয়। বৈশেষিকেরা বলেন, সমস্ত জড়বস্তুই অনুরূপভাবে সৃষ্ট হয় এবং সৃষ্ট বস্তুর নতুনত্ব স্বীকার করতে আমরা বাধ্য হই। কার্য সম্পর্কে এই মতবাদ **আরম্ভবাদ বা অসৎকার্যবাদ** নামে পরিচিত। এটা আরম্ভবাদ, কারণ এই মত অনুসারে কার্যের সঙ্গে কারণের সমবায় সম্পর্ক অতীতে ছিল না, কার্য উৎপন্ন হতেই আরম্ভ হয়েছে। এটা অসৎ কার্যবাদ, অর্থাৎ কার্য কারণের মধ্যে অতীতে ছিল না, এই মত। বিভিন্ন সূত্র-সংযোগ বস্ত্রের কারণ। কিন্তু সূত্রসংযোগই বস্ত্র নয়। বস্ত্র সূত্রসংযোগজাত একটি নতুন জিনিস। অসৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য কারণে থাকে না বটে, কিন্তু কারণ ছাড়া কখনই কার্য হয় না। কার্য যেমন উৎপন্ন হয় তেমনি আবার বিনষ্টও হয়।[১] বৈশেষিক মতে কোন উৎপন্ন জিনিসই দুই ক্ষণের কম স্থায়ী হতে পারে না। প্রথম ক্ষণে বস্তুর উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি এবং অন্ততঃ (minimum) তৃতীয় ক্ষণে বস্তুর বিনষ্টি। বৌদ্ধদের মতে কোন জিনিসই এক ক্ষণের বেশী থাকে না, সবই ক্ষণিক। এই দিক থেকে বৌদ্ধমতের সঙ্গে বৈশেষিক মতের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

সৃষ্টিক্রম এবং অসৎ-কার্যবাদ।

বৈশেষিকদের মতে পরমেশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ। তিনি ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ পরমাণু, আকাশ, দিক বা দেশ, কাল, মন এবং আত্মার সাহায্যে জীবের কর্মসংস্কার বা অদৃষ্ট অনুসারে জগৎ সৃষ্টি করেন। পরমেশ্বরের সৃষ্টিক্রম নিম্নরূপ।

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ।

কর্মফল অনুসারে জীবের সুখ-দুঃখ-বিধানের জন্য ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় অনাদি বলে আমরা প্রথম সৃষ্টির কথা ভাবতে পারি না। প্রত্যেক সৃষ্টিই প্রলয়ের পর হয়, আবার প্রত্যেক প্রলয়ই সৃষ্টির পর হয়। সেইজন্য জীবের কর্ম অনুসারে জগৎ সৃষ্টির কথা ওঠে। ঈশ্বর যখনই জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখনই পূর্ব সৃষ্টিতে জীবের কর্মজাত অদৃষ্ট নিত্যআত্মায় অবস্থান করে ভোগার্থে সৃষ্টি

১। "উৎপন্নম্ নিরুধ্যতে" (ন্যায়সূত্রভাষ্য ১।২৯)

অভিমুখী হয়। অদৃষ্টের এই সৃষ্টিঅভিমুখীতাই বায়ু পরমাণুকে সক্রিয় করে তোলে।

স্থষ্টি ও প্রলয় অনাদি।

বায়ু পরমাণু থেকে দ্ব্যণুক ত্র্যণুক ক্রমে স্থূলবায়ু মহাভূতের সৃষ্টি হয় এবং এই মহাভূত নিত্য আকাশে সদা চঞ্চল হয়ে থাকে। তারপর অনুরূপভাবে জল পরমাণু সক্রিয় হয় এবং মহাভূত স্থূলজল আবির্ভূত হয়। এই জল বায়ুতে থাকে এবং বায়ুর দ্বারা তাড়িত হয়। তারপর ক্ষিতি পরমাণু সক্রিয় হয়ে স্থূলক্ষিতির সৃষ্টি করে এবং এই ক্ষিতি স্থূলজলে থাকে। তারপর তেজপরমাণু থেকে স্থূলতেজের উদ্ভব হয় এবং এই স্থূলতেজও তার সমস্ত জ্যোতি নিয়ে জলে অবস্থান করে। এরপর পরমেশ্বরের অভিধ্যানের ফলে তেজ এবং ক্ষিতিপরমাণু থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। পরমেশ্বর তখন এই ব্রহ্মাণ্ডকে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যযুক্ত ব্রহ্মা দ্বারা সঞ্জীবিত করেন এবং ব্রহ্মার ওপরই পাপপুণ্য অনুসারে দুঃখ-সুখের ব্যবস্থা করে জগতের খুঁটিনাটি সৃষ্টির ভার দেন।

সৃষ্ট জগৎ অনেকদিন থাকলেও কখনই চিরস্থায়ী হয় না। সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর ঈশ্বর যেমন আমাদের রাত্রির সুখনিদ্রার ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি একটি বিশেষ

সৃষ্টি ও প্রলয় মিলে একটি কল্প। কল্প নিরবধিকাল ধরে চলেছে।

সৃষ্টিতে বারবার জন্মপরিগ্রহ এবং আনুষঙ্গিক দুঃখে মানুষ যখন কাতর হয় তখন তিনি এদের সাময়িকভাবে দুঃখ থেকে পরিত্রাণের একটা উপায় করে দেন। জগতের ধ্বংস বা প্রলয়ই এই উপায়। প্রত্যেক সৃষ্টির পরই পরমেশ্বর একটি প্রলয়ের ব্যবস্থা করেন। সৃষ্টি ও প্রলয় মিলে একটি কল্প সৃষ্টি করে এবং এই কল্প বার বার সৃষ্ট হয়ে নিরবধিকাল ধরে চলে। এই কল্পবাদ অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকই স্বীকার করেন।

জগতের প্রলয় নিম্নলিখিতরূপে সংঘটিত হয়ে থাকে। কালক্রমে বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা যখন অন্যান্য জীবের মত দেহ ত্যাগ করেন তখন পরমেশ্বর জগৎ ধ্বংস করার কথা

জগতের প্রলয়ক্রম।

ভাবেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টিঅভিমুখী অদৃষ্ট প্রলয়অভিমুখী অদৃষ্টের দ্বারা প্রতিহত হয় এবং ফলে সৃষ্টিঅভিমুখী অদৃষ্টের কর্মক্ষমতা থাকে না। প্রলয়অভিমুখী অদৃষ্ট সক্রিয় হলে জীবদেহ ও ইন্দ্রিয়ের উপাদান পরমাণুর মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দেয়। এই চঞ্চলতার ফলে পরমাণুগুলো অযুক্ত হয়ে যায় এবং দেহ ও ইন্দ্রিয় উপাদানে লীন হয়। অনুরূপভাবে স্থূল ক্ষিতির পরমাণুর মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দিলে এরাও অযুক্ত হয় এবং স্থূলক্ষিতি আর থাকে না। এইভাবে ক্রমে ক্রমে জল, তেজ ও মরুতের পরমাণু বিশ্লিষ্ট হয় এবং স্থূল জল, তেজ ও মরুৎ বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে থাকে শুধু ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ পরমাণু এবং আকাশ, দিক বা দেশ কাল, মন এবং আত্মার মত নিত্য দ্রব্য। অবশ্য অদৃষ্ট এবং অতীত সংস্কাররূপ ভাবনা তখনও আত্মায় থাকে। এখানে লক্ষণীয় এই যে, প্রলয়কালে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই ক্রম অনুসারে স্থূল মহাভূতের পরমাণু বিশ্লিষ্ট হয়; কিন্তু সৃষ্টিকালে মরুৎ, অপ, ক্ষিতি এবং তেজ এই ক্রম অনুসারে মহাভূতের আবির্ভাব ঘটে।[১]

[১] বৈশেষিক সম্মত জগৎসৃষ্টি ও প্রলয়ের বিশদ বিবরণ প্রশস্তপাদ রচিত 'পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ' গ্রন্থে পাওয়া যায়। উৎসাহী পাঠক এই গ্রন্থ অনুধাবন করলে উপকৃত হবেন।

মন্তব্য

বৈশেষিকদর্শন ন্যায়দর্শনের মতই বহুতত্ত্ববাদী বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শন। এই মতে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানাতিরিক্ত। ভাবজ্ঞানের বিষয় যেমন ভাবপদার্থ, অভাবজ্ঞানের বিষয় তেমনি অভাবপদার্থ। অভাবপদার্থের স্বীকৃতি এই দর্শনের বৈশিষ্ট্য। জগতের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পরমাণুবাদের প্রতিষ্ঠা এবং পরমেশ্বরের প্রয়োজনা স্বীকার এই দর্শনের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। তবে ঈশ্বরকে কেবলমাত্র নিমিত্ত কারণ বলে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ দাবী এ দর্শন মেটাতে পারেনি। এই মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ পরমাণু, আকাশ, দিক বা দেশ, কাল, মন ও আত্মা ঈশ্বরাতিরিক্ত সত্তা সম্পন্ন নিত্যদ্রব্য। ঈশ্বর এদের সৃষ্টি করেন না, এদেরই সাহায্যে জগৎ রচনা করেন। আমাদের মনে হয়, এই মতবাদে ঈশ্বরকে সীমিত করা হয়েছে। ন্যায়দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সমস্ত বিশ্বভুবন একই সত্তা দিয়ে ব্যাখ্যা করার বিরাট পরিকল্পনা এই দর্শনে নেই। মানুষের বুদ্ধি এতে তৃপ্ত হয় না। সর্বোপরি চৈতন্যকে আত্মার আগন্তুক গুণ বলে এই দর্শন আত্মার মহিমা খর্ব করেছে। শেষপর্যন্ত আত্মায় অনাত্মায় তফাৎ করাই মুশকিল। ভক্ত যে অন্তরঙ্গ ভগবানের কল্পনা করেন তাঁর স্বীকৃতি এই দর্শনে নেই। অবশ্য নৈয়ায়িকদের সাধন জীবনে এই কথার স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। এই মতের ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, ধর্মের রক্ষক ও জগতের স্রষ্টা, কিন্তু তিনি প্রেমের ঠাকুর কি-না তা স্পষ্ট করে বলা নেই। ধর্ম-জীবনের আকুতি এতে মেটে না। ধার্মিক ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের চেয়ে করুণা-ঘন ক্ষমা সুন্দর ঈশ্বরেরই বেশী পক্ষপাতী। তাঁর এই পক্ষপাতের প্রতি কোন সমর্থন এই দর্শনে নেই। সেইজন্যই এই দর্শনের ঈশ্বরবাদ ধার্মিককে খুশী করে না।

বৈশেষিক দর্শন বহুতত্ত্ববাদী ও বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী। এই দর্শনে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, পরমাণু উপাদান কারণ। এই দর্শনের বিভিন্ন ত্রুটি।

এই ক্ষেত্রে আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে—বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণ বলা হয়েছে। কিন্তু আসলে নিমিত্ত কারণ ত অদৃষ্ট। মানুষের কৃতকর্মের ফলভোগের জন্যই ত জগৎ। তবে অদৃষ্ট অচেতন বলে তাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য, ঈশ্বর প্রয়োজন। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বর পরমাত্মা। চৈতন্য এই দর্শনে আত্মার আগন্তুক গুণ। মুক্ত অবস্থায় আত্মায় চৈতন্য থাকে না। তবে ঈশ্বরেরই বা চৈতন্য থাকে কি করে? ঈশ্বর কি মুক্ত নন?

বৈশেষিক দর্শনে পরস্পর নিরপেক্ষত্ত স্বতন্ত্র সপ্ত পদার্থ স্বীকৃত। কিন্তু বলা হয়েছে যে গুণ ও কর্ম দ্রব্যে ছাড়া থাকতে পারে না। তা হলে গুণ ও কর্ম দ্রব্যের সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত হবে কি করে? আবার সামান্য ত অনেকে সমবেত না হয়ে থাকতে পারেনা, বিশেষ থাকে নিত্যদ্রব্যে এবং সমবায় একপ্রকার সম্বন্ধ বলে সম্বন্ধী ছাড়া থাকতে পারেনা। আবার অভাব ভাব সাপেক্ষ। সুতরাং এরা কেউই দ্রব্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। অর্থাৎ, সপ্তপদার্থের মধ্যে দ্রব্যই প্রধান। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায়—গুণ, কর্মের অতীত দ্রব্য কেমন জিনিস? উত্তর দেওয়া সহজ নয়।

অভাব যেমন ভাবপদার্থ সাপেক্ষ, তেমনি ভাবপদার্থ ও অভাবপদার্থ সাপেক্ষ নয়

কি ? আর তা যদি হয়, তবে এদের অতীত কোন নিরপেক্ষ পদার্থ আছে কি ? যদি থাকে, তবে তার প্রকৃতি কি ? এসব সমস্যা নিয়ে ন্যায় বৈশেষিক আলোচনা করেনি।

শঙ্করাচার্য বৈশেষিক পদার্থের বিরুদ্ধে নানা আপত্তি তুলেছেন। আমরা তাঁর সমবায়-খণ্ডন পূর্বেই আলোচনা করেছি। বৈশেষিকদের পদার্থ কল্পনা মাত্র। কল্পিত বস্তুর সংখ্যা ছয় বা সাতেই সীমাবদ্ধ হবে কেন ? আমাদের খুশীমত আমরা যে কোন সংখ্যক পদার্থেরই কল্পনা করতে পারি।

বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ নানা দোষ যুক্ত। পরমাণুর গুণগত ভেদ স্বীকার করা যায়না। ক্ষিতি পরমাণু যদি সবচেয়ে বেশী গুণ এবং মরুৎ পরমাণু যদি সবচেয়ে কম গুণযুক্ত হয়, তবে তাদের ওজন এবং আয়তনেরও পার্থক্য থাকবে। আরও কথা এই যে, পরমাণু যদি গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, রূপ প্রভৃতি গুণযুক্ত হয়, তবে তারা নিত্য হবে কি ? পরমাণুর গুণ যদি নিত্য হয় এবং যদি এই গুণ পরমাণু থেকে অযুক্ত না হয়, তবে মুক্তিতে আত্মা চৈতন্য গুণ রিক্ত হবে কি করে, দ্রব্যই বা গুণ ব্যতীত থাকবে কি করে ? কারণ যদি তার গুণাবলী কার্যে সঞ্চারিত করে, তবে পরমাণু তার পরিমণ্ডলাকারই বা কেন দ্ব্যণুকে সঞ্চারিত করেনা এবং দ্ব্যণুক তার সূক্ষ্মত্ব ও হ্রস্বত্ব ত্রসরেণুতে সঞ্চার করে না ? কার্য যদি কারণে প্রচ্ছন্ন না থাকে তবে যে কোন কারণ থেকেই ত যে কোন কার্য হতে পারে বা কার্য শশ শৃঙ্গের মত অসৎ হতে পারে। আরও কথা বৈশেষিক মতে সৃষ্টি ও প্রলয় কিছুই হতে পারে না। পরমাণু কি স্বরূপতঃ সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় না দুইই, না কোনটাই নয় ? যদি সক্রিয় হয় সৃষ্টি হবে নিত্য, যদি হয় নিষ্ক্রিয় তবে সৃষ্টি হবে অসম্ভব, যদি দুইই হয়, তবে দেখা দেবে স্ববিরোধ, কারণ কোন জিনিসই একসঙ্গে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় হতে পারেনা। আর যদি কোনটাই না হয়, তবে পরমাণুর সক্রিয়তা আসবে বাইরের কোন কিছু থেকে। এখন প্রশ্ন উঠবে—এই কোন কিছু কি দৃষ্ট, না অদৃষ্ট ? যদি দৃষ্ট হয় তবে সৃষ্টির আগে তা থাকতে পারে না। আর যদি হয় অদৃষ্ট, তবে তা সর্বদাই পরমাণুর সন্নিকটবর্তী বলে সৃষ্টি হবে নিত্য, আর যদি পরমাণুর সঙ্গে এই অদৃষ্ট বস্তুর নৈকট্য অস্বীকার করা হয়, তবে সৃষ্টি হবে অসম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জী

গঙ্গানাথ ঝা—পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ (শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী সহ) ইংরেজী অনুবাদ।
শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য—Tarka samgraha Dipika on Tarka samgraha
জগদীশ তর্কালঙ্কার—তর্কামৃত
এ বি কিথ—Indian Logic of Atomism
মাধবাচার্য্য—সর্বদর্শন সংগ্রহ
নন্দলাল সিংহ—কণাদের বৈশেষিক সূত্র (ইংরেজী অনুবাদ)
পঞ্চানন শাস্ত্রী—ভাষাপরিচ্ছেদ (বঙ্গানুবাদ)
অধ্যাপক শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী– সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনা সহিতঃ।
হিরিয়ান্না—Outlines of Indian Philosophy.

অন্যান্য যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে বৈশেষিকদর্শন আলোচনা করেছি তাদের উল্লেখ যথাস্থানে পাদটীকায় করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়

বেদান্ত দর্শন

প্রস্তাবনা

উপনিষদই বেদান্ত, কিন্তু কেন?

বেদান্ত বলতে বেদের অন্ত বা শেষ বোঝায়। প্রথমতঃ উপনিষদ ও বেদান্ত সমার্থক বলে মনে করা হত, পরে উপনিষদ থেকে উদ্ভূত সমস্ত চিন্তাই বেদান্ত নামে অভিহিত হয়েছে। এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—উপনিষদকে বেদের অন্ত বা শেষ কেন বলা হয়? আমাদের মনে হয়, তিনটি বিভিন্ন দিক থেকে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়।

বৈদিক যুগের সাহিত্যের কালানুক্রমিক বিচারে উপনিষদ সর্ব শেষে।

প্রথমতঃ, বৈদিকযুগের সাহিত্যসৃষ্টির কালানুক্রমিক বিচারে উপনিষদের স্থান সর্বশেষে। বৈদিকযুগের সাহিত্য সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ। বৈদিকমন্ত্রের সমাহারই সংহিতা। সংহিতা চারটি—ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব। কবিরা সংহিতার স্রষ্টা। সংহিতা সাহিত্যই বৈদিকযুগের প্রথম সৃষ্টি। বৈদিক যাগযজ্ঞের বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে ব্রাহ্মণ। পুরোহিতরা ব্রাহ্মণের স্রষ্টা। ব্রাহ্মণ বৈদিকসাহিত্যে কালানুক্রমিক বিচারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সংহিতার পরই ব্রাহ্মণের স্থান। বৈদিকযুগের সর্বশেষ সাহিত্য-সৃষ্টি উপনিষদ। বিভিন্ন দার্শনিক-সমস্যাই উপনিষদের উপজীব্য। দার্শনিকেরাই উপনিষদের উদ্গাতা। এই তিনপ্রকার সাহিত্যই শ্রুতি এবং ব্যাপকতর অর্থে বেদ নামে পরিচিত। উপনিষদ বৈদিকযুগের সর্বশেষ সাহিত্য সৃষ্টি বলে বেদান্ত।

পাঠবিধি অনুসারেও উপনিষদের স্থান সর্ব শেষে।

দ্বিতীয়তঃ, পাঠবিধি অনুসারেও উপনিষদের স্থান সর্বশেষে। ভারতবর্ষ মানুষের জীবনকে চারটি আশ্রমে বিভক্ত করেছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। জীবনের প্রারম্ভকালে ব্রহ্মচর্য। অধ্যয়নই তখন মানুষের একমাত্র কর্তব্য। তারপর সংসারধর্মপালন এবং এরই নাম গার্হস্থ্য। পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করলেই সংসার ছেড়ে বনে যাওয়ার নির্দেশ। একেই বলে বানপ্রস্থ। সর্বশেষে সন্ন্যাস। সন্ন্যাস গ্রহণ করার অধিকার সকলের নেই। নিজেদের উৎসাহ, ঐকান্তিকতা এবং নিষ্ঠার দ্বারা যারা সন্ন্যাসলাভের অধিকার অর্জন করেন, একমাত্র তাঁরাই সন্ন্যাসী হতে পারেন। শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মচর্য আশ্রমে সংহিতা পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। গার্হস্থ্যকালে গৃহস্থধর্ম অনুসরণের জন্য ব্রাহ্মণপাঠের আদেশ। ব্রাহ্মণ-নির্দিষ্ট যাগযজ্ঞ করা গৃহস্থের পবিত্র কর্তব্য। সর্বশেষে মানুষ যখন সংসার ছেড়ে বনে যাবে, তখনই সে উপনিষদ পাঠের জন্য বিশেষ যোগ্য হবে। জগতের কোলাহল থেকে দূরে বানপ্রস্থকালেই মানুষ স্থির মস্তিষ্কে দার্শনিক সমস্যাবলী ও তাদের সমাধান উপলব্ধি ও অনুবর্তন করতে সক্ষম হয়। সেইজন্যই শাস্ত্রকারেরা উপনিষদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন জীবন-সন্ধ্যায়।

উপনিষদই বৈদিকসাহিত্যগুলোর মধ্যে সর্বশেষে পাঠ্য বলে একে সঙ্গতভাবেই বেদান্ত বলা যায়।

বৈদিক চিন্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ও পরিণতি উপনিষদেই লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয়তঃ বৈদিকচিন্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ও পরিণতি উপনিষদেই লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদের চেয়ে মহত্তম চিন্তা শুধু বৈদিকযুগে কেন পৃথিবীর কোন যুগেই হয়েছে কি-না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ। জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ার বলেছেন, "সমগ্র জগতে উপনিষদ পাঠের মত উপকারী ও উন্নয়নকারী অন্য কোন পাঠই নেই। উপনিষদ আমাকে জীবনে শান্তি দিয়েছে, মৃত্যুতেও শান্তি দেবে।"[১] বৈদিকচিন্তার চরম প্রকাশ বলেও উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়।

উপনিষদ বেদোপনিষদ বা বেদরহস্য নামে খ্যাত। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে বিভিন্নউপনিষদের অবিরুদ্ধ মূলকথা প্রকাশ করেছেন। ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য থেকে বিভিন্ন বেদান্ত-সম্প্রদায়ের উদ্ভব।

উপনিষদ কথার অর্থ 'যা মানুষকে ঈশ্বরের কাছে নেয়' বা 'যা মানুষকে গুরুর কাছে নেয়' (উপ-নি-সদ)।[২] উপাসন্ন বা গুরুর সন্নিকটে অবস্থিত শিষ্যকেই উপনিষদের শিক্ষা দেওয়া হত। উপনিষদে 'উপসদ' এই ক্রিয়াটি বার বার উপদেশের জন্য শিষ্যের গুরুসান্নিধানে যাত্রার কথা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। উপনিষদকে বেদের রহস্য বা গূঢ় তাৎপর্য বলে মনে করা হয় এবং সেইজন্যই উপনিষদের আর এক নাম বেদোপনিষদ[৩] বা বেদ-রহস্য। রহস্য ত কখনই হাটে প্রচার করা যায় না, সেইজন্যই বেদোপনিষদ বা বেদ-রহস্য শিষ্যের কাছে নিভৃতে প্রকাশ করার রীতি প্রচলিত ছিল। উপনিষদ অসংখ্য।[৪] যে সমস্ত দার্শনিক সমস্যা এই সমস্ত উপনিষদে আলোচিত হয়েছে তাদের উত্তর একইভাবে সমস্ত উপনিষদে দেওয়া হয়নি। ফলে, বিভিন্ন উত্তরগুলোর অন্তর্নিহিত ঐক্য অনুধাবনের জন্য উপনিষদের বিভিন্ন শিক্ষা সাজানো এবং গোছানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত সূত্র বা শারীরক সূত্র বা শারীরক মীমাংসা বা উত্তর মীমাংসা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে খ্যাত গ্রন্থে এই প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিলেন। উপনিষদের মূল বক্তব্য প্রকাশই বাদরায়ণের গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থের চারটি অধ্যায়। প্রথমতঃ সমন্বয় অধ্যায়ে বিভিন্ন উপনিষদের তথাকথিত বিরুদ্ধ শিক্ষার সমন্বয় দেখান হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপনিষদ-শিক্ষার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত মতবাদ এবং যুক্তিতর্কসিদ্ধ ধারণার অবিরোধ প্রদর্শিত হল। তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তির সাধন এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সাধনলব্ধ ফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বাদরায়ণের সূত্রগুলো এমনই সংক্ষিপ্ত যে, তাদের

১। 'In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanisads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death"—Schopenhauer.

২। শঙ্করাচার্য লিখিত কঠ, তৈত্তিরীয় এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩। তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১।১১

৪। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত History of Indian Philosophy প্রথম খণ্ড ২৮ পৃষ্ঠায় ১১২টি উপনিষদের কথা বলেছেন।

নিহিতার্থ বোঝা মুশকিল। সেইজন্যই পরবর্তীকালে সূত্রগুলোর তাৎপর্য প্রকাশের জন্য বিভিন্ন লোক ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করেছেন। শঙ্কর রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক এবং অন্যান্য অনেকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার।[১] এদের ভাষ্যের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন বেদান্তসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত ভাষ্যের আবার বার্তিক, টীকা ও টিপ্পনীর অন্ত নেই। ফলে, বিপুলাকার বৈদান্তিক সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক কি, এই সমস্যা নিয়েই বিভিন্ন বেদান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আসল মতভেদ। মধ্বাচার্য বলেন, জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই মতবাদ দ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। শঙ্কর বলেন, জীব ও ব্রহ্ম একান্ত অভিন্ন। এর নাম অদ্বৈতবাদ। রামানুজের মতে জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক অংশের সঙ্গে অংশীর সম্পর্ক। একে বলে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ। এ ছাড়া, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ, অভেদ বা ভেদাভেদ বিভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করার জন্য বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈত, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত, বলদেব বিদ্যাভূষণের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর অবিভাগলক্ষণাদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হয়েছে।[২]

জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক কি, এই সমস্যা নিয়েই বেদান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আসল মতভেদ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, উপনিষদ বেদান্তদর্শনের ভিত্তি হলেও একমাত্র ভিত্তি নয়। উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং বিভিন্ন ভাষ্যসহ ব্রহ্মসূত্র, এই তিনটিই বেদান্তদর্শনের ভিত্তি। এদের যথাক্রমে শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতি-প্রস্থান এবং ন্যায়প্রস্থান বলা হয়। এদের একত্র নাম প্রস্থানত্রয়। এই তিনটি স্তম্ভের ওপরই বেদান্ত-দর্শনের ইমারৎ দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান এবং ন্যায় প্রস্থান— এই প্রস্থানত্রয় বেদান্তের ভিত্তি।

পূর্বমীমাংসা ব্রাহ্মণভিত্তিক, কিন্তু উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তের ভিত্তি বেদের মন্ত্রভাগ বা সংহিতা। সুতরাং বেদান্তের তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য বেদের মন্ত্র বা সংহিতার মূল বক্তব্য জানা দরকার। উপনিষদ ভিন্ন বেদান্ত অর্থহীন। সেইজন্য উপনিষদের মুখ্য সিদ্ধান্তও জানা আবশ্যক। আমরা এইবার সংহিতা ও উপনিষদের মূলকথা আলোচনা করে বেদান্তবিচারের পথ প্রস্তুত করবো।

বেদান্তের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে সংহিতা ও উপনিষদের সার কথা জানা দরকার।

সংহিতায় প্রথমদিকে অগ্নি, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁদের সকলের উদ্দেশ্যেই ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়েছে। তবে যখন যে দেবতার উল্লেখ করা হত, তখন তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা হত। শুধু তাই নয়। সমস্ত দেবতাই যে এক 'সৎ' বা সত্তারই বিভিন্ন প্রকাশ, এই বোধও বৈদিক ঋষিদের ছিল। ঋক্‌সংহিতায় বলা হয়েছে—"একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি..."।[৩]

সংহিতায় বিভিন্ন দেবতার উল্লেখ থাকলেও এঁরা যে একই সত্তার প্রকাশ, এ বিশ্বাসও ছিল।

১। এই সমস্ত ভাষ্যকারদের মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা P. Nagaraja Rao রচিত The Schools of Vedanta এবং Ghate রচিত Vedanta গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

২। বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মূল বক্তব্যের তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ডঃ সুশীলকুমার মৈত্র বিরচিত 'Studies in Philosophy and Religion' গ্রন্থের 'Schools of Vedanta philosophy' নিবন্ধে পাওয়া যাবে।

৩। ঋক্‌বেদ ১।১৬৪।৪৬

অনেকে বলেন, সংহিতায় ঈশ্বর বা দেবতা-চিন্তার মধ্যে একটি বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, বহু দেবতায় বিশ্বাস, তারপর বহুর মধ্যে একের প্রাধান্য স্বীকার এবং সর্বশেষে এক এবং অদ্বিতীয় সত্তার স্বীকৃতি বৈদিক দেবতাচিন্তার বিবর্তন সূচনা করে।

সংহিতায় ঈশ্বর-চিন্তার বিবর্তন।

ঋক্‌ সংহিতায় শুধু সমস্ত দেবতাকেই একই সত্তায় প্রকাশ বলে কল্পনা করা হয়নি, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই সত্তায় বিধৃত, এমন কথাও বলা হয়েছে। পুরুষ সূক্তে বিশ্বভুবনব্যাপী এবং বিশ্বাতিরিক্ত এক বিরাট পুরুষের কল্পনা পাওয়া যায়।[১] বলা হয়েছে—সহস্র শীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ পুরুষ সর্বত্র বেষ্টন করে আছেন এবং তারপর দশাঙুল পরিমাণে বিশ্ব অতিক্রম করেও আছেন। ইহলোক, পরলোক, গ্রহ, নক্ষত্র, স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর, সজীব, নির্জীব সব কিছুই এই বিরাট পুরুষের অংশ। অংশীরূপে তিনি কিছু পরিমাণে সব কিছু অতিক্রম করেও আছেন।[২]

পুরুষ, সূক্তে এক বিরাট পুরুষের কল্পনা পাওয়া যায়।

অন্য আর একটি মন্ত্রে এক অপুরুষ অনির্বচনীয় সত্তার কল্পনা পাওয়া যায়। মন্ত্রটির নাম নাসদীয় সূক্ত।[৩] এই সত্তা সৎ নন, অসৎ নন, আকাশ নন, স্বর্গ নন; আসলে সমস্ত বর্ণনারই তিনি অতীত। আমাদের মনে হয়, পরবর্তীকালের সগুণ ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা যথাক্রমে পুরুষসূক্ত এবং নাসদীয় সূক্তে পাওয়া যায়। পুরুষসূক্তের বিরাট পুরুষই সগুণ ব্রহ্ম, নাসদীয় সূক্তের অনিবচনীয় সত্তা নির্গুণ ব্রহ্ম।

নাসদীয় সূক্তে এক অপুরুষ, অনিবচনীয় সত্তার কল্পনা পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে উপনিষদে এই দুই প্রকার চিন্তাধারারই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথমটির নাম সপ্রপঞ্চ ধারণা এবং দ্বিতীয়টির নাম নিষ্প্রপঞ্চ ধারণা। ছান্দোগ্য উপনিষদের শাণ্ডিল্য বিদ্যা-অধ্যায়ে সপ্রপঞ্চ ধারণার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করি।[৪] এখানে ব্রহ্মকে তজ্জলান (তৎ=তিনি, জ=জগতের জন্ম দেন, লি=তাঁতে জগৎ লয় পায়, অন=তিনিই জগৎ ধারণ করেন) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই উপনিষদে ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক রূপে সগুণ। তারপর জীবাত্মার সঙ্গে এই ব্রহ্মের অভিন্নত্ব কল্পনা করা হয়েছে। এরই নাম সপ্রপঞ্চ ধারণা। পুরুষসূক্তে বর্ণিত পুরুষের সঙ্গে এই ব্রহ্মের বর্ণনার মিল লক্ষণীয়।

উপনিষদে সপ্রপঞ্চ ও নিষ্প্রপঞ্চ, এই দুটি চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদের শাণ্ডিল্য বিদ্যা অধ্যায়ে সপ্রপঞ্চ ধারণার সুস্পষ্ট প্রকাশ বর্তমান।

নিষ্প্রপঞ্চ ধারণার পরিচয় পাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে।[৫] যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ও গার্গীর কথোপকথনে এই ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। গার্গী এই বিশ্বের ভিত্তি বা অধিষ্ঠান

১। ঋক্‌বেদ ১০।৯০

২। স ভূমিম্‌ বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্‌ পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্য অমৃতম্‌ দিবি। পূর্ববৎ।

৩। ঋক্‌বেদ ১০।১২৯ ৪। ছান্দোগ্য ৩।১৪

৫। বৃহদারণ্যক ৩।৮

সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যে অধিষ্ঠানের কথা বলেছিলেন তার কোন সদর্থক বর্ণনাই তিনি দেননি। তিনি স্থূল নন, সূক্ষ্ম নন; দীর্ঘ নন, হ্রস্ব নন, এমনি ধরনের কথাই শুধু তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তবে তিনি শূন্য নন, কারণ শূন্য কখনই জগতের অধিষ্ঠান হতে পারে না। একথা যাজ্ঞবল্ক্য সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন। নাসদীয়সূক্তে যে অনির্বচনীয় সত্তার কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষিকথিত জগতের অধিষ্ঠানের অভিন্নতা লক্ষণীয়।

নিষ্প্রপঞ্চ ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদে।

উপনিষদে চরম সত্তাকে কখনও আত্মা (ঐতরেয় ১।১, বৃহদারণ্যক ১।৪।১), কখনও ব্রহ্মণ (মুণ্ডক ২।১।১১, ছান্দোগ্য ৩।১৪।১) আবার কখনও শুধু সৎ (ছান্দোগ্য ৬।২।১) বলে অভিহিত করা হয়েছে। জীবাত্মা ও সর্ব-ভূতাত্মা বা ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। আত্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান উপনিষদে পরাবিদ্যা বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলে কথিত হয়েছে। আত্মা ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান অপরাবিদ্যা। "আত্মানং বিদ্ধি" (আত্মাকে জান), ঔপনিষদিক ঋষিদের সুস্পষ্ট নির্দেশ। আত্মাকে জানলেই সব কিছু জানা হবে,[১] বলেছেন উপনিষদের ঋষি। আত্মার পাঁচটি কোষ বা আবরণের কথা বলা হয়েছে—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়। প্রথমতঃ, আত্মাকে অন্নময় বা দেহের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে হয়। তারপর একটু চিন্তা করলে এই মত পরিত্যাগ করে বলতে হয় প্রাণই আত্মা। আরও চিন্তার পর মনকেই আত্মা বলে মনে হয়। আরও চিন্তাশীল লোক বিজ্ঞানকে আত্মা বলেন। সবচেয়ে তীক্ষ্ণধী ও দূরদর্শী লোকেরা আত্মাকে আনন্দ বলে জানেন। উপনিষদের ঋষি বলেছেন, আত্মাকে আনন্দ বলে জানলে আর কোন ভয়ই থাকে না (আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন)। তিক্ষ্ণধী ভিন্ন কেউই বিভিন্ন আবরণে আবৃত আত্মার প্রকৃত পরিচয় জানে না।[২]

উপনিষদে চরম সত্তাকে কখনও আত্মা, কখনও ব্রহ্মণ আবার কখনও শুধু সৎ বলা হয়েছে।

আত্মার আনন্দের জন্যই আত্মার সঙ্গ সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুই আনন্দময়। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ী দেবীকে এই উপদেশ দিয়েছেন।[৩] তিনি বলেন—'আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি'। জীবন যে এত প্রিয় তারও কারণ এই আত্মার আনন্দ। আত্মায় আনন্দ আছে বলেই এ-জগতে কেউ স্বেচ্ছায় মরতে চায় না।[৪] আত্মোপলব্ধিই আনন্দোপলব্ধি। আমরা বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হই বলেই আনন্দ পাই না। মৃগ যেমন তার নিজেরই নাভিদেশে গন্ধের উৎস না জেনে বনে বনে গন্ধের উৎস খুঁজে ক্লান্ত হয়, আমরাও তেমনি আত্মার আনন্দ ফেলে সুখের নেশায় বিষয়ের পেছনে ছুটি। ফল, দুঃখ ও বন্ধন বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে আত্মস্থ হতে পারলেই মুক্তির আনন্দ মিলবে।[৫]

আত্মার আনন্দের জন্যই বস্তু আনন্দময়।

১। বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬ ২। কঠ ৩।১২
৩। বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬ ৪। তৈত্তিরীয় ২।৭
৫। কঠ ৬।১৪

উপনিষদে সৃষ্টির সত্যতা ও অসত্যতা দুইই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ঔপনিষদিক নিষ্প্রপঞ্চ মতে সৃষ্টি মিথ্যা (নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, কঠ ৪।১১ ; মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি, বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯) ; কিন্তু সপ্রপঞ্চ মতে সৃষ্টি সত্য। ব্রহ্ম সত্যই জগতের স্রষ্টা। ঈশোপনিষদে বিশেষভাবে এই তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে।

উপনিষদে সৃষ্টির সত্যতা ও অসত্যতা দুই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি, ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য প্রচলিত এবং এ সমস্ত ভাষ্য নির্ভর করে বিভিন্ন বেদান্তসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে শঙ্করাচার্যের শারীরক ভাষ্য এবং রামানুজের শ্রীভাষ্য সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য উপনিষদের নিষ্প্রপঞ্চ মতবাদের অনুসরণকারী, কিন্তু রামানুজ সপ্রপঞ্চ মতবাদের প্রবক্তা। শঙ্করের মতবাদের নাম অদ্বৈতবাদ এবং রামানুজের মতের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। আমরা এখানে শুধু এই দুটি মতবাদেরই বিশদ পরিচয় প্রকাশ করবো।

ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্যের মধ্যে শঙ্করের শারীরক ভাষ্য ও রামানুজের শ্রীভাষ্য সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

ক। অদ্বৈতবাদ

ভূমিকা

অদ্বৈতবাদ শঙ্করাচার্যের নামের সঙ্গেই বিশেষভাবে জড়িত। তবে এর উৎস প্রাক-শঙ্কর যুগে খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্য অদ্বৈতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা শঙ্করাচার্যের জন্যই। সাধারণ লোক শাঙ্কর মতকেই অদ্বৈতবাদ বলে জানে। ঔপপত্তিক দিক থেকে এক এবং অদ্বিতীয় নির্গুণ ব্রহ্মের আত্যন্তিক সত্তা, জগৎ মিথ্যাত্ব, জীবব্রহ্মৈক্য এবং মুক্তিতে জীবের ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি প্রভৃতির স্বীকৃতি এবং ব্যবহারিক দিক থেকে কর্মসন্ন্যাস বা পরিপূর্ণ বৈরাগ্য এবং একমাত্র জ্ঞানকেই মুক্তির উপায় বলে বিশ্বাস অদ্বৈতবেদান্তের বৈশিষ্ট্য। এই মতবাদের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় গৌড়পাদকারিকায়। মাণ্ডুক্য উপনিষদের মূল বক্তব্য সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করাই এই কারিকার মুখ্যকাজ। আসলে কিন্তু অদ্বৈতবাদের মূলকথাই এই কারিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই এই কারিকাকে শাঙ্কর মতের ভিত্তি বলে মনে করেন। সুপ্রসিদ্ধ আচার্য ভর্তৃহরিকৃত 'বাক্যপদীয়' নামক গ্রন্থের ব্রহ্মকাণ্ডে অদ্বৈতবাদ আলোচিত।

অদ্বৈতবাদ শঙ্করাচার্যের নামের সঙ্গেই বিশেষভাবে যুক্ত। তবে এর উৎস প্রাক-শঙ্কর যুগে খুঁজে পাওয়া যায়।

শঙ্কর বিরচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যই প্রধান। রচনা-মাধুর্য এবং যুক্তির নিশ্ছিদ্র পারম্পর্যের জন্য এই ভাষ্য বিখ্যাত। শঙ্কর এই ভাষ্যে

সাংখ্যদের প্রকৃতিপরিণামবাদ এবং ভর্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতি বেদান্তসূত্রের ভাষ্যকারদের ব্রহ্মপরিণামবাদ প্রত্যাখ্যান করে বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ প্রচার করেছেন। শঙ্করের মতে জগৎ প্রকৃতি বা ব্রহ্মের পরিণাম নয়, ব্রহ্মের বিবর্ত বা ভ্রান্ত প্রকাশ মাত্র। অনেকে বৌদ্ধ মাধ্যমিক সম্প্রদায় বা শূন্যবাদীদের শূন্যের সঙ্গে শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্মের অভিন্নতা কল্পনা করেছেন।[১] শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এই জাতীয় অভিযোগ সম্ভব মনে করে আগেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বার বার বলেছেন, শূন্যবাদীদের মত নঞর্থক দর্শন প্রচার করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তিনি সদর্থক দর্শনের প্রবক্তা; তাঁর মত শূন্যবাদ নয়, পূর্ণবাদ।

শঙ্কর-বিরচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যই প্রধান। শঙ্করের মত শূন্যবাদ নয়, পূর্ণবাদ।

বেদান্তসূত্রের ভাষ্য ভিন্ন প্রধান প্রধান উপনিষদ এবং ভগবদ্গীতার ভাষ্যও রচনা করেছেন শঙ্করাচার্য। অদ্বৈতবোধের পক্ষে অপরিহার্য কতকগুলো বিষয় শঙ্কর বেদান্তসূত্রভাষ্যে বিষদভাবে আলোচনা না করে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে। সেইজন্য শঙ্কর মতের পরিপূর্ণ পরিচয় পেতে হলে এই দুইটি উপনিষদের ভাষ্য জানা একান্ত দরকার। এ ছাড়া, 'উপদেশ সাহস্রী'তেও শাঙ্কর মতের একটি চমৎকার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শঙ্করের সমর্থকেরা পরবর্তীকালে শঙ্কর-মত সমর্থন ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ সৃষ্টি করেছেন। এই মতভেদের ফলে যে সমস্ত অদ্বৈত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে বিবরণ এবং ভামতী সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বিবরণ সম্প্রদায় শঙ্করের সাক্ষাৎশিষ্য পদ্মপাদের শঙ্কর-সূত্র-ভাষ্যের পঞ্চপাদিকা টীকার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। কিছু পরবর্তীকালের ভামতী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বাচস্পতি মিশ্র, প্রকাশাত্মন বিবরণ নামে পঞ্চপাদিকার ওপর একটি টীকা লিখেছিলেন। বিবরণ সম্প্রদায়ের নাম এই টীকার নাম থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। অখণ্ডানন্দ তত্ত্বদীপন নামে বিবরণের একটি টীকা লিখেছিলেন। বিদ্যারণ্য মুনি বিবরণের বক্তব্য অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করেছেন বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহ নামক গ্রন্থে। শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের ওপর বাচস্পতি মিশ্রের টীকার নাম ভামতী। ভামতী সম্প্রদায়ের নাম এই টীকার নাম থেকেই গৃহীত হয়েছে। অমলানন্দ ভামতী ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর কল্পতরু গ্রন্থে, অপ্পয় দীক্ষিত কল্পতরুর ওপর পরিমল নামে একটি টীকা রচনা করেছিলেন। শঙ্কর মতানুসারী আরও অসংখ্য গ্রন্থ আছে। আমরা এখানে আর কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থের নামই শুধু উল্লেখ করবো।[২] সুরেশ্বরের নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি এবং তাঁর শিষ্য সর্বজ্ঞাত্মন বিরচিত সংক্ষেপ শারীরক অদ্বৈত বেদান্তের দুটি উল্লেখযোগ্য

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ভিন্ন প্রধান প্রধান উপনিষদ এবং ভগবদ্গীতার ভাষ্যও রচনা করেছেন শঙ্কর।

অদ্বৈত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থ।

১। "যৎ শূন্যবাদিনঃ শূন্যম্ তদের ব্রহ্ম মায়িনঃ"—মধ্বঃ বেদান্তসূত্রের অণুভাষ্য ২।২।২৯

২। উৎসাহী পাঠক বিভিন্ন গ্রন্থের কিছু পরিচয় ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী বিরচিত অদ্বৈত্যবাদ গ্রন্থে পাবেন।

গ্রন্থ। বিমুক্তাত্মন বিরচিত ইষ্টসিদ্ধিতে মায়াবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। আনন্দবোধের ন্যায়মকরন্দ এবং বিদ্যারণ্যের পঞ্চদশী কিছু পরবর্তীকালের অত্যন্ত জনপ্রিয় অদ্বৈতগ্রন্থ। শঙ্কর-পরবর্তীকালের বিভিন্ন শঙ্করপন্থীদের মতভেদ এবং বিভিন্ন অদ্বৈতসম্প্রদায়ের সুন্দর পরিচয় রয়েছে অপ্পয় দীক্ষিত বিরচিত সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ গ্রন্থে। ধর্মরাজ অধ্বরিন্দ্র বেদান্ত পরিভাষা গ্রন্থে অদ্বৈতপ্রমাণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সদানন্দের বেদান্তসার অদ্বৈতদর্শনের সুন্দর, সংক্ষিপ্ত এবং সরল পরিচয় গ্রন্থ। নৈষধীয় চরিতের কবি শ্রীহর্ষ খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য নামে একটি পরমতখণ্ডন-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অদ্বৈতবিরোধী বিভিন্ন মত খণ্ডন করাই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালের মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধি এবং তার ওপর ব্রহ্মানন্দ লিখিত লঘু চন্দ্রিকা টীকা অদ্বৈতদর্শনের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। অনেকের মতে এ গ্রন্থ পাঠ না করলে অদ্বৈতদর্শনে প্রতিষ্ঠালাভ অসম্ভব।

অদ্বৈতমতে প্রমা, প্রমাণ ও প্রমেয়

সাংখ্যমতে জ্ঞানের জন্য বুদ্ধির বৃত্তি এবং তাতে পুরুষ-চৈতন্যের প্রতিফলন আবশ্যক। অদ্বৈত মতে জ্ঞানের জন্য সাক্ষীচৈতন্য-ভাস্বর অন্তঃকরণ বৃত্তি দরকার। অদ্বৈত মতে অন্তঃকরণ ভৌতিক বা পঞ্চভূতের সৃষ্টি। তবে অন্তকরণে পঞ্চভূতের মধ্যে তেজসই প্রধান। সেইজন্য অন্তকরণকে তৈজস বলা হয়। সুষুপ্তি ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত অবস্থাতেই অন্তঃকরণ সদা সক্রিয়। ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত হয়ে অন্তঃকরণ বিষয়াকার ধারণ করে। সাংখ্যমতের মতই অদ্বৈতমতে বিষয়াকারে আকারিত অন্তঃকরণের নাম বৃত্তি। এই বৃত্তি সাক্ষীচৈতন্যের দ্বারা ভাস্বর হয়। সাংখ্যযোগ দর্শনে যা পুরুষ-চৈতন্য অদ্বৈতমতে তাই সাক্ষী-চৈতন্য। পুরুষের মতই সাক্ষী নিষ্ক্রিয়। সাক্ষী নিষ্ক্রিয় হলেও অন্তঃকরণ-বৃত্তির প্রকাশ সাক্ষীর জন্যই হয়। প্রদীপ যেমন বস্তুর প্রকাশের জন্য দায়ী, সাক্ষীও তেমনি অন্তঃকরণবৃত্তির প্রকাশের জন্য দায়ী। নিষ্ক্রিয় সাক্ষী এবং সক্রিয় অন্তঃকরণের সংযোগেই জ্ঞান, অনুভূতি, ক্রিয়া প্রভৃতি লোকব্যবহার হয়ে থাকে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জীব বলতে আমরা সাক্ষী ও অন্তঃকরণের সংযুক্ত রূপই বুঝি। জীবের মোক্ষ না হওয়া পর্যন্ত এই সংযুক্তরূপ কোন না কোন আকারে থাকে। সর্বশেষে এই সংযোগ যখন নষ্ট হয় তখন অন্তঃকরণ উপাদান কারণ মায়ায় লীন হয় এবং সাক্ষী সাক্ষিত্ব হারিয়ে ব্রহ্মই হয়ে যায়। সাক্ষী এবং জীব অভিন্ন নয়, অবশ্য তারা ভিন্নও নয়।[১] জীবের মধ্যে অন্তঃকরণ বা বিষয় অংশ থাকায় জীব আত্মচৈতন্যের বিষয় হতে পারে, কিন্তু সাক্ষী একান্তভাবে অবিষয় বলে কখনই কোন জ্ঞানের বিষয় হয় না। সাক্ষী অবশ্য সেজন্য অজ্ঞাতও থাকে না। সাক্ষী স্বরূপতঃ স্বয়ংপ্রকাশ। অর্থাৎ প্রকাশরূপতাই সাক্ষীর স্বরূপ। সুতরাং সাক্ষীর অপ্রকাশিত থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

অদ্বৈতমতে অন্তঃকরণ-বৃত্তি সাক্ষীচৈতন্য-ভাস্বর হলেই জ্ঞান হয়।

১। 'অন্তঃকরণবিশিষ্টো জীবঃ, অন্তকরণোপহিতঃ সাক্ষী—বেদান্তপরিভাষা, ১০২ পৃঃ

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অদ্বৈতমতে জ্ঞানের জন্য অন্তঃকরণবৃত্তি এবং সাক্ষী-চৈতন্য দুইই দরকার। এদের মতে অন্তঃকরণবৃত্তি অনিত্য, কিন্তু সাক্ষী-চৈতন্যের চৈতন্যং নিত্য। বৃত্তির পরিবর্তন হয়, কিন্তু সাক্ষী অপরিবর্তিত থাকে। বৃত্তির মত সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আন্তর অবস্থাও অন্তকরণের পরিণাম। অন্তঃকরণ-বৃত্তি দিয়েই এদের জানা যায়। বৃত্তি যেমন সাক্ষীচৈতন্য-ভাস্বর, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আন্তর অবস্থাও তেমনি সাক্ষীচৈতন্য প্রকাশিত।

অন্তঃকরণবৃত্তি অনিত্য, সাক্ষীচৈতন্য নিত্য।

অদ্বৈতমতে জ্ঞান দ্বিবিধ—অপরোক্ষ ও পরোক্ষ। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং অপরোক্ষজ্ঞান সমার্থক নয়। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ছাড়াও অপরোক্ষ জ্ঞান হতে পারে। নিম্নলিখিত সর্তগুলো পূর্ণ হলেই অপরোক্ষ জ্ঞান হয়।

জ্ঞান দ্বিবিধ—অপরোক্ষ ও পরোক্ষ।

প্রথমতঃ, বস্তু অপরোক্ষ জ্ঞানের যোগ্য হওয়া চাই। ঘট অপরোক্ষজ্ঞানের যোগ্য। কিন্তু 'ধর্ম' যোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ, বস্তু জ্ঞান কালে উপস্থিত থাকা চাই। যে ঘট এখানে নেই তার অপরোক্ষ জ্ঞান হতে পারে না। তৃতীয়তঃ, জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে বৃত্তি-সংযোগ হওয়া চাই। বাহ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় পথে বহির্গত হয়ে বিষয়াকারে আকারিত হয়, কিন্তু সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আন্তর অবস্থার ক্ষেত্রে অন্তঃকরণ বহির্গত হয় না, স্বস্থানে থেকেই বৃত্তিরূপ গ্রহণ করে। অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বিবিধ—সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক। এই বিষয়ে আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য। পরোক্ষ জ্ঞান পঞ্চবিধ– অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও শব্দ।

অপরোক্ষ জ্ঞানের বিভিন্ন সর্ত।

অদ্বৈতমতে জ্ঞান বস্তুতন্ত্র।[১] অর্থাৎ বিষয় ছাড়া জ্ঞান হয় না। এই ক্ষেত্রে যোগাচার মতের সঙ্গে অদ্বৈতমতের পার্থক্য সুস্পষ্ট। যোগাচার মতে মনের ধারণা বাহ্য বিষয়াকারে প্রকাশিত হয়। শঙ্করাচার্য এমত খণ্ডন করেছেন।[২] বিষয় ছাড়া জ্ঞান হয় না, একথা বলায় অদ্বৈতমতকে এদিক থেকে আমরা বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Realism) বলে মানতে পারি। জ্ঞানের বিষয় পরোক্ষও হতে পারে, আবার অপরোক্ষও হতে পারে। অপরোক্ষ বিষয় বাহ্যবস্তু ও আন্তর অবস্থা, দুইই হতে পারে। পূর্বে আলোচিত অপরোক্ষ জ্ঞানের সর্তাবলীর যে কোন একটি অনুপস্থিত থাকলেই অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না।

বিষয় ছাড়া জ্ঞান হয় না।

মানুষের জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয়—এই চতুর্বিধ অভিজ্ঞতা হতে পারে। আমরা এতক্ষণ জাগ্রত অভিজ্ঞতার কথা বলছিলাম। এবার স্বপ্ন অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করবো। স্বপ্ন অভিজ্ঞতায় যদিও আমাদের মনে হয় যে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হচ্ছে এবং স্থূল শরীরও রয়েছে, বস্তুতঃ কিন্তু স্বপ্নে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষও হয় না, স্থূল দেহের সঙ্গে সংযোগও থাকে না। স্বপ্নে স্মৃতিও থাকে, আবার নতুন সৃষ্টিও থাকে। জাগ্রত

জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়—মানুষের এই চতুর্বিধ অভিজ্ঞতা হতে পারে।

১। শারীরক ভাষ্য ১।১।৪

২। শারীরক ভাষ্য ২।২।২৮-৩০

অভিজ্ঞতার বিষয়ের মত স্বপ্ন অভিজ্ঞতায়ও বিষয় থাকে। তবে বিষয়ের প্রকৃতি দুই ক্ষেত্রে ভিন্ন। জাগ্রত অভিজ্ঞতার বিষয় একই সঙ্গে অনেকের অভিজ্ঞতা গ্রাহ্য, কিন্তু স্বাপ্ন অভিজ্ঞতার বিষয় ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য। স্বাপ্ন অভিজ্ঞতার বিষয়ের স্থায়িত্ব খুব কম। স্বপ্ন ভেঙে গেলেই স্বপ্ন অভিজ্ঞতার বিষয় থাকে না। কিন্তু জাগ্রত অভিজ্ঞতার বিষয় তুলনামূলকভাবে অনেক দীর্ঘস্থায়ী। পরিপূর্ণ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয় থাকে। এই সব পার্থক্যের কথা বিবেচনা করে শঙ্করাচার্য জাগ্রত অভিজ্ঞতার বিষয়কে ব্যবহারিক এবং স্বাপ্ন অভিজ্ঞতার বিষয়কে প্রাতিভাসিক বলেছেন। জাগ্রত অভিজ্ঞতার বিষয় নিয়ে লোক-ব্যবহার হয়। কিন্তু স্বাপ্ন অভিজ্ঞতার বিষয় নিয়ে লোক-ব্যবহার সম্ভব নয় এবং এরা প্রতিভাসকালমাত্র স্থায়ী। শাঙ্কর মতে প্রাতিভাসিক বিষয়ও বিষয়, ধারণা মাত্র নয়। অদ্বৈতমতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই স্বপ্নে অন্তঃকরণ সক্রিয় থাকে এবং অন্তঃকরণ বৃত্তি সাক্ষী চৈতন্য ভাস্বর হয়। জাগ্রত ও স্বপ্ন উভয়বিধ অভিজ্ঞতাতেই অন্তঃকরণ বৃত্তি এবং সাক্ষী-চৈতন্য থাকে, স্বাপ্ন অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয়-সংযোগ থাকে না, কিন্তু জাগ্রত অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয়সংযোগ বর্তমান।

জাগ্রত অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয়-সংযোগ থাকে, স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতায় থাকে না।

সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়-সংযোগ থাকে না, অন্তঃকরণ তার কারণ অবিদ্যায় লীন নয় এবং সাক্ষী-চৈতন্য পূর্ববর্তী অবস্থাগুলোর মতই বর্তমান থাকে। অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় অবিদ্যা এবং সাক্ষীচৈতন্য থাকে। অবিদ্যা ও সাক্ষীচৈতন্য মিলে কারণ-শরীর গঠন করে। এই অবস্থায় জীব থাকে না, কারণ জীব অন্তঃকরণ বিশিষ্ট এবং এই অবস্থায় অন্তঃকরণ থাকে না। তবে জীবত্ব এই অবস্থাতেও থাকে, সাক্ষী ও অবিদ্যার সংযোগে এই সময় জীবত্ব গঠিত হয়। অবিদ্যা এই অবস্থায় থাকে বটে, কিন্তু বিক্ষেপ করে না। অর্থাৎ অবিদ্যা চরম সত্তা ও সত্যকে আবৃত করে কিন্তু নাম-রূপাত্মক বিচিত্র জগৎ বিক্ষিপ্ত করে না। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, শঙ্করের মতে অবিদ্যার দ্বিবিধ কর্ম—আবরণ ও বিক্ষেপ। উদাহরণ দিলে বক্তব্য বোঝা যাবে। কোন ব্যক্তির যখন রজ্জু বিষয়ে অজ্ঞান থাকে তখন রজ্জু তার নিকট আবৃত থাকে এবং এই অজ্ঞান সর্প নামক বস্তু বিক্ষিপ্ত করে, ফলে, রজ্জু বিষয়ে অজ্ঞানী ব্যক্তি রজ্জু জানে না এবং তার স্থানে সর্প জানে। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সুষুপ্তি অবস্থায়, জীবত্ব থাকে, বৈচিত্র্য থাকে না। মানুষ সুষুপ্তি থেকে উঠে যখন বলে—'কিছুই টের পাই নি', তখনই বোঝা যায় সুষুপ্তি অবস্থায় তার বৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতা ছিল না। সুষুপ্তি অবস্থায় আনন্দের অভিজ্ঞতা হয়। এই আনন্দ অদ্বৈতমতে আত্মার আনন্দ। বৈচিত্র্যের অনুপস্থিতিতে আত্মার প্রকাশ অবারিত হয়। এই আনন্দ সুষুপ্তি অবস্থা থেকে জাগ্রত হওয়ার পরও কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়। অবশ্য ক্রমশঃ জাগ্রত অভিজ্ঞতার অভিঘাতে তা লুপ্ত হয়ে যায়। সুষুপ্তি অবস্থার কোন কথাই সুষুপ্তি অবস্থায় জানা যায় না, কারণ তখন অন্তঃকরণ থাকে না। সুষুপ্তির পর সুষুপ্তি অবস্থার স্মরণের ভিত্তিতে আমরা সুষুপ্তির পরিচয় পাই।

সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়-সংযোগ থাকে না, অন্তঃকরণ তার কারণ অবিদ্যায় লীন হয় এবং সাক্ষীচৈতন্য পূর্ববর্তী অবস্থাগুলোর মতই বর্তমান থাকে।

তূরীয় অভিজ্ঞতায় অবিদ্যাও থাকে না। অবিদ্যা না থাকায় সাক্ষীত্ব লুপ্ত হয়। শুধু চৈতন্য থাকে। এই চৈতন্য আত্মা বা ব্রহ্ম। এই চৈতন্য সদ্রূপ এবং আনন্দরূপ। অদ্বৈতমতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা। এরই নাম পারমার্থিক সত্তা। তূরীয় অভিজ্ঞতায় এই সত্তার যথার্থ প্রকাশ ঘটে। অন্যান্য অভিজ্ঞতায় এই সত্তার প্রকাশ অজ্ঞানে আবৃত থাকে। অবশ্য সুষুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞানের প্রভাব অনেক কমে যায় বলে চরম সত্তার প্রকাশ জাগ্রত ও স্বপ্নকালের চেয়ে সুষুপ্তিকালে বেশী হয়। জাগ্রতকালীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বাপ্ন অভিজ্ঞতার বিষয় যেমন মিথ্যা বলে প্রতিভাত হয়, তূরীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জাগ্রত অভিজ্ঞতার বিষয় ব্যবহারিক জগতও তেমনি মিথ্যা বলে প্রতিভাত হয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, অদ্বৈত দর্শনে আত্মা বা ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ বলে জ্ঞানস্বরূপও বটে। কিন্তু এই জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান নয়। আমরা যে জ্ঞানকে অদ্বৈতমত অনুসরণ করে অধ্যাসাত্মক বলেছি, তা বৃত্তিজ্ঞান।

তূরীয় অভিজ্ঞতায় অবিদ্যা থাকে না, সাক্ষীত্ব লুপ্ত হয়। শুধু চৈতন্য থাকে।

শঙ্করাচার্য বলেন, বিষয় এবং বিষয়ী নিত্য বিরুদ্ধ। এদের সংযোগ কখনই সত্য হতে পারে না। অথচ সব সময়েই আমাদের অভিজ্ঞতায় এদের সম্পর্ক দেখতে পাই। আমরা বিষয়ীর ধর্ম বিষয়ে আরোপ করি এবং বিষয়ের ধর্ম বিষয়ীতে প্রয়োগ করি। শঙ্কর একেই অধ্যাস বলেছেন।[১] আমরা যে জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছি তাও অধ্যাসাত্মক। কারণ, আমরা দেখেছি জ্ঞান হতে হলে সাক্ষীচৈতন্য এবং অন্তঃকরণবৃত্তির সংযোগ আবশ্যক। কিন্তু সাক্ষী-চৈতন্য নিত্য বিষয়ী এবং অন্তঃকরণবৃত্তি বিষয়। সুতরাং এদের সম্পর্ক স্বাভাবিক বা লৌকিক হলেও তা সত্য নয়, অধ্যাসাত্মক।

বিষয় ও বিষয়ীর সংযোগ অধ্যাসাত্মক।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, অদ্বৈতমতে বিষয় ছাড়া জ্ঞান হয় না, জ্ঞান হতে গেলেই কোন না কোন বিষয় চাই। এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে — আমাদের যে ভ্রান্ত জ্ঞান হয় তার বিষয় কি? আমরা অন্ধকার রাত্রিতে রজ্জুকে সর্প বলে দেখি। লোকে এই প্রকার জ্ঞানকে ভ্রান্তজ্ঞান বলে। এই জ্ঞানের বিষয় ত সত্য হতে পারে না। যদি সত্যই হয়, তবে পরে আমরা 'ইহা সর্প নয়, রজ্জু মাত্র' একথা জানি কি করে? সত্য জিনিস ত কখনও নস্যাৎ হতে পারে না। অদ্বৈতবাদীরা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা এই জাতীয় ভ্রান্ত জ্ঞান ব্যাখ্যার জন্য অনির্বচনীয় বিষয় স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, যজ্ঞদত্ত দিনের বেলায় না খেলেও যদি তাকে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ দেখা যায়, তবে আমরা অর্থাপত্তি প্রমাণের ভিত্তিতে বলি, সে রাত্রে খায়। সেইরূপ আমাদের ভ্রান্তজ্ঞান হয় অথচ তার বিষয় সত্য নয়, সুতরাং এই ভ্রান্তজ্ঞানের ব্যাখ্যার জন্য অর্থাপত্তি প্রমাণের সাহায্যে সত্যভিন্ন কোন বিষয় স্বীকার করতেই হবে। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় যেমন সৎ নয়, তেমনি তা অসৎও নয়। যা অসৎ তা কখনই প্রকাশিত হয় না। বন্ধ্যাপুত্র একান্ত অসৎ বলে কোথাও দেখতে

১। শারীরক ভাষ্য ১।১।১

পাওয়া যায় না। কিন্তু ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়, যেমন রজ্জুতে সর্প, অল্পক্ষণের জন্য হলেও দেখা যায়। সুতরাং ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় অসৎ নয়। ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় যদি সৎ না হয়, অসৎও না হয়, তবে কি সদসৎ? তাও অসম্ভব। কারণ, একই জিনিস একই সঙ্গে সৎ ও অসৎ দুই-ই হতে পারে না। তাহলে ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়ের প্রকৃতি কি? অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় সৎ, অসৎ, সদসৎ ভিন্ন অথচ বিষয়। এই অবস্থায় একে অনির্বচনীয় না বলে কোন উপায় নেই। ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই মতবাদ অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদ ভ্রান্তজ্ঞানের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারে বলে মনে হয়। ভ্রান্তজ্ঞানে কোন বিষয় যে প্রতিভাত হয় এবং তা লোকে জানে এবং ফলে সেই সময় কিছু ব্যবহারও হয়, একথা অস্বীকার করা যায় না। আবার এই বিষয় পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় তাও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় মিথ্যা, একথা না বলে উপায় নেই। কারণ, একমাত্র মিথ্যাই বাধিত হতে পারে। সত্য কখনও বাধিত হয় না। যা মিথ্যা তা অসৎ নয় বলেই প্রকাশিত হয়। অসৎ কখনই প্রকাশিত হতে পারে না। সুতরাং ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় সৎ নয়, অসৎ নয়, অনির্বচনীয় মিথ্যা, অদ্বৈতবাদীদের একথা না বলে উপায় কি?

অর্থাপত্তি প্রমাণের ভিত্তিতে অদ্বৈতবাদীরা ভ্রমের বিষয়কে অনির্বচনীয় বলে উল্লেখ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় এবং তার অধিষ্ঠান একইরূপ সত্তার অধিকারী হতে পারে না। রজ্জুতে যখন আমরা সর্প দেখি তখন অধিষ্ঠান রজ্জু ব্যবহারিক সত্তা বিশিষ্ট, কিন্তু সর্প প্রাতিভাসিক সত্তা বিশিষ্ট। প্রাতিভাস কালের পর সর্প থাকে না, কিন্তু রজ্জু থাকে। সুতরাং রজ্জুর উন্নত সত্তার কথা স্বীকার করতেই হয়। সর্বশেষে জগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্মের জ্ঞান হলে জগতও বাধিত হয়। ব্রহ্ম পারমার্থিক সত্তা সম্পন্ন, কিন্তু জগৎ ব্যবহারিক সত্তা সম্পন্ন। আরও কথা, অদ্বৈতমতে অধিষ্ঠানের জ্ঞান হলেই ভ্রান্তি থাকে না। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান স্থলে অধিষ্ঠান রজ্জুর জ্ঞান হলে সর্প থাকে না এবং ভ্রান্তিও ঘোচে। তেমনি জগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্মের জ্ঞান হলে জগতও থাকে না এবং জগৎ বিষয়ে ভ্রান্তি দূর হয়।

ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় ও তার অধিষ্ঠান একইরূপ সত্তা সম্পন্ন হতে পারে না। অধিষ্ঠান উন্নততর সত্তা সম্পন্ন হয়।

অদ্বৈতমতে জ্ঞান স্বতঃই প্রমাণ এবং জ্ঞানের অপ্রামাণ্য পরতঃসিদ্ধ। মীমাংসকেরাও জ্ঞানের প্রমাণ সম্বন্ধে এমতই প্রকাশ করেছেন। মীমাংসকদের মতই অদ্বৈতবাদীরা বলেন, জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার না করলে জ্ঞানের প্রমাণ কোনভাবেই সিদ্ধ করা যায় না। কোন জ্ঞান নিজে প্রামাণ্য না হলে অন্য কোন জ্ঞানের দ্বারাই ত তাকে প্রামাণ্য বলে প্রমাণ করতে হবে। এই অবস্থায় দ্বিতীয় জ্ঞানের প্রামাণ্য তৃতীয় জ্ঞানের ওপর এবং তৃতীয় জ্ঞানের প্রামাণ্য চতুর্থ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ অনবস্থাদোষ দেখা দেবে। এই দোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য জ্ঞানকে

জ্ঞান স্বতঃ প্রামাণ্য এবং পরতঃ অপ্রামাণ্য।

স্বতঃপ্রামাণ্যই বলতে হয়।[১] কোন জ্ঞান যখন পরবর্তী অন্য কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় তখনই তা অপ্রামাণ্য হয়ে থাকে। যেমন রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান রজ্জু-জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় বলে রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান অপ্রামাণ্য। সুতরাং জ্ঞানের অপ্রামাণ্য স্বতঃ নয়, পরতঃ বা অন্য নির্ভর। অদ্বৈতমতে যে জ্ঞানের বিষয় পরবর্তী কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না, সেই জ্ঞানই প্রমা,[২] আর যে জ্ঞানের বিষয় পরবর্তী জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়, তা অপ্রমা।

জ্ঞান কি করে জানা যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন, জ্ঞান স্বপ্রকাশ।

জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় না হয়েও অপ্রকাশিত থাকে না।

জ্ঞান যখন বিষয় প্রকাশ করে তখন নিজেও অপ্রকাশিত থাকে না। জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় হয় না, কিন্তু অপ্রকাশিতও থাকে না (অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষ ব্যবহারযোগ্যত্বম স্বপ্রকাশত্বম্)। প্রকাশই জ্ঞানের স্বরূপ।

অদ্বৈতবাদীরা ভাট্ট মীমাংসকদের মত ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করেন।

অদ্বৈতবাদীরা ভাট্টমীমাংসকদের ছয়টি প্রমাণই স্বীকার করেন এবং এ সমস্ত প্রমাণ সম্বন্ধে ভাট্টমতই গ্রহণ করেন।[৩] তবে কোন কোন বিষয়ে অদ্বৈতমতে কিছু পার্থক্য আছে। আমরা এখানে শুধু পার্থক্যগুলোই আলোচনা করবো। মীমাংসা দর্শনের আলোচনা-কালে ভাট্ট-স্বীকৃত ছয়টি প্রমাণ নিয়েই আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। সুতরাং ছয়টি প্রমাণের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

১। মীমাংসকেরা কোন বেদ-রচয়িতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকেরা ঈশ্বরকে বেদরচয়িতা বলে উল্লেখ করেন। শঙ্করাচার্য এই দুই মতের মধ্যপথ অনুসরণ

বেদ-রচয়িতা বিষয়ে শঙ্কর-মত ন্যায় ও মীমাংসকদের মধ্যপথ অনুসরণ করে।

করেছেন। তিনি বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। কিন্তু একথার অর্থ এই নয় যে, বেদরচয়িতা বলে কেউ নেই বা বেদ নিত্য। একথার নিহিতার্থ এই যে, প্রতিকল্পে ঈশ্বর নতুন করে বেদের উপস্থাপন করেন, কিন্তু তিনি বেদের বক্তব্য বা শব্দ বিন্যাসের কোন পরিবর্তন করেন না। ঈশ্বর বেদের রচয়িতা, কিন্তু তিনি সাধারণ গ্রন্থের রচয়িতার মত গ্রন্থের বক্তব্য ও শব্দ-বিন্যাস নিজ অভিরুচি অনুসারে উপস্থিত করেন না। তিনি বেদের উপস্থাপন-কর্তা হিসেবে বেদের রচয়িতা। বেদে যা আছে চিরকালই তা আছে। শুধু বেদের ভিন্ন ভিন্ন উপস্থাপন ভিন্ন ভিন্ন কল্পে প্রচারিত হচ্ছে।

১। মীমাংসা ও অদ্বৈতমতের আলোচনা ডাঃ সুশীলকুমার মৈত্র বিরচিত 'Studies in Philosophy and Religion' গ্রন্থের 'The theories of validity in Indian philosophy' অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

২। বেদান্ত পরিভাষা, ১৯ পৃঃ

৩। ব্যবহারে ভাট্টনয়ঃ

শঙ্কর বেদভিন্ন শব্দ-প্রমাণও স্বীকার করেন। তাঁর মতে বিধিবাক্য এবং ভূত-বস্তু বিষয়ক বাক্য সমান প্রামাণ্য।

২। শঙ্কর ভাট্টমীমাংসকদের মতই বেদকেই একমাত্র শব্দপ্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। বেদবহির্ভূত শব্দ প্রমাণও স্বীকার করেন। কিন্তু ভাট্ট মীমাংসকেরা বেদে বিধি বাক্যগুলোর স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করেন এবং ভূতবস্তু বিষয়ক বাক্যকে বিধি বাক্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। শঙ্করাচার্য এমত গ্রহণ করেন না। তিনি ভূতবস্তু বিষয়ক বাক্য এবং বিধিবাক্য উভয়ই সমান প্রমাণ বলে মনে করেন।

শঙ্কর মতে সমস্ত সত্তার ঐক্য প্রদর্শনই বেদাদি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

৩। শঙ্করের মতে সমস্ত সত্তার ঐক্য-প্রদর্শনই বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য। মীমাংসকেরা এমত স্বীকার করেন না। সমস্ত সত্তার ঐক্য বলতে শঙ্কর সমস্ত সত্তাই যে এক ব্রহ্ম বা চৈতন্য সত্তা, একথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

অদ্বৈতমতে নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের পার্থক্য।

এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রকৃতি সম্পর্কে অদ্বৈতমত আলোচনার যোগ্য। অদ্বৈতমতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে আমাদের নির্বিশেষ সত্তামাত্রের (সন্মাত্রম্) বা বৈশিষ্ট্যানবগাহী জ্ঞান হয়। বৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান বা বিশিষ্ট-জ্ঞান সবিকল্পক প্রত্যক্ষেই সম্ভব। এই জ্ঞান সবিকল্পক। কিন্তু 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' (এই সেই দেবদত্ত), 'তত্ত্বমসি' (তুমিই সেই ব্রহ্ম) প্রভৃতি বাক্য জন্য জ্ঞান নির্বিকল্পক। অদ্বৈতমতে আত্যান্তিক সত্তা নির্বিশেষ সন্মাত্র বলে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই আত্যান্তিক সত্তা প্রকাশ করে। চরম জ্ঞানের দিক থেকে সমস্ত বিশিষ্ট বস্তুই মিথ্যা বলে অদ্বৈত মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় মিথ্যা।[১]

অদ্বৈত তত্ত্ব

অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্ম স্বরূপ।

অদ্বৈতবাদ প্রসঙ্গে অগণিত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে পণ্ডিতেরা বলেন, অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত অর্দ্ধশ্লোকাকারেই প্রকাশ করা সম্ভব। অদ্বৈত মতে—"ব্রহ্ম সত্যং, জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব, নাপরঃ" ; (ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মস্বরূপ)। আমরা এখন (১) ব্রহ্ম সত্য, (২) জগৎ মিথ্যা এবং (৩) জীব ব্রহ্ম-স্বরূপ—এই কথাগুলোর তাৎপর্য বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে দেখাবো।

(১) ব্রহ্ম সত্য

আমাদের অভিজ্ঞতাকে চারভাগে ভাগ করা যায়—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তূরীয়। জীবনে এমন কোন অভিজ্ঞতা হতে পারেনা যা এই চার রকম অভিজ্ঞতার অন্তর্গত নয়। জেগে থেকে আমরা যে অভিজ্ঞতার অধিকারী হই, তাকেই বলে জাগ্রৎ অভিজ্ঞতা। স্বপ্ন দেখার সময় যে অভিজ্ঞতা হয়, তা-ই স্বপ্ন-অভিজ্ঞতা।

১। শাস্ত্র দীপিকা (নির্ণয় সাগর সং) ৪০ পৃঃ

স্বপ্নহীন গভীর ঘুমে মগ্ন হলে যে অভিজ্ঞতা পাই, তার নাম সুষুপ্তি এবং সমাধি হলে সাধক যে অভিজ্ঞতার অধিকারী হন, তা-ই তূরীয় অভিজ্ঞতা। জাগ্রতকালে জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয় দুইই বর্তমান। জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতা বা জ্ঞানের সৃষ্টি নয়।[১] স্বপ্ন দেখার সময় জ্ঞানের বিষয় এবং জাগ্রতকালীন জ্ঞানের বিষয় একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারেনা। স্বাপ্ন জ্ঞানের বিষয় ব্যক্তি বিশেষের কাছে স্বপ্নকালেই শুধু প্রতিভাত হয় এবং জাগ্রতকালে তা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু জাগ্রতকালীন জ্ঞানের বিষয় সাধারণত সকলের কাছেই প্রতিভাত হয়, কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছে প্রতিভাত হয় না। কিন্তু এজন্য স্বাপ্ন জ্ঞানের বিষয় একান্ত অসৎ নয়। শঙ্করের মতে যা কখনই কোন জ্ঞানের বিষয় হতে পারেনা, তাই অসৎ। এই অর্থে 'বন্ধ্যাপুত্র', 'শশশৃঙ্গ', 'আকাশ-কুসুম' প্রভৃতি অসৎ। কারণ, এদের পক্ষে কোন জ্ঞানের বিষয়রূপে প্রতিভাত হওয়া অসম্ভব। স্বপ্নকালীন অভিজ্ঞতার বিষয় জাগ্রতকালীন অভিজ্ঞতার বিষয়ের তুল্যরূপ না হলেও অন্ততঃ স্বপ্নকালে প্রতিভাত হয় বলে 'বন্ধ্যাপুত্র'-এর মত কখনই অসৎ নয়। শঙ্কর এই জাতীয় বিষয়কে প্রাতিভাসিক সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। এই বিষয় একান্তভাবেই বিশেষ ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বিষয় হলেও প্রতিভাত হয় এবং এই দিক থেকে এর বিষয়ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে এই জাতীয় বিষয় কখনই সকলের অভিজ্ঞতার বিষয় হতে পারেনা। জাগ্রতকালীন অভিজ্ঞতার বিষয় সকলের পক্ষেই সাধারণত একরূপ। শঙ্কর এই জাতীয় বিষয়কে ব্যবহারিক সত্য নামে অভিহিত করেছেন। এই বিষয় নিয়ে লোকব্যবহার সম্ভব। কিন্তু স্বাপ্নবিষয় নিয়ে কোন লোকব্যবহারই সম্ভব নয়। সেইজন্যই বলা হয়—"নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?"[২] জাগ্রতকালীন জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান-নির্ভর নয় ; জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয় উভয়ই এইক্ষেত্রে ব্যবহারিক সত্য। এই দিক থেকে শঙ্করের মত বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদ এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনের বার্কলি-প্রচারিত ভাববাদ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদ এবং বার্কলির ভাববাদ উভয়ই জাগ্রতঅভিজ্ঞতার বিষয়কে জ্ঞান-নির্ভর বলে মনে করে। সুষুপ্তিকালে বা স্বপ্নহীন গভীর ঘুমে জ্ঞান থাকে বটে, কিন্তু তাতে জ্ঞানের কোন সাধারণ বিষয় থাকে না। সুষুপ্তি থেকে উঠে আমরা বলি—'খুব সুখে ঘুমিয়েছিলাম, কিছুই টের পাইনি।' সুষুপ্তি-অভিজ্ঞতার এই প্রকাশ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, আত্মা এই অবস্থায় জ্ঞানরূপে বর্তমান ; এখানে জানবার মত বাইরের কোন বিষয় নেই, তবে আনন্দরূপ আত্মা নিজেই প্রদীপের মত প্রকাশিত থাকে। আত্মা যদি আনন্দরূপ না হত, তবে কখনই সুষুপ্তিতে আনন্দের অভিজ্ঞতা হত না। কারণ, সুষুপ্তিতে আত্মা ছাড়া ত আর কিছুই থাকে না। সুতরাং সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞান, আনন্দ

আমাদের অভিজ্ঞতাকে চারভাগে ভাগ করা যায়—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তূরীয়। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, চৈতন্যই একমাত্র অবাধিত। এই চৈতন্যই একমাত্র সত্তা এবং এই চৈতন্যই আনন্দ। এই সৎচিৎ ও আনন্দই ব্রহ্ম।

১। ব্রহ্ম সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য ২।২।২৮

২। মাইকেল মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' কবিতাটি দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতি যা পাওয়া যায় সবই আত্মার রূপ বলে মানতে হয়। এই জ্ঞানরূপ ও আনন্দরূপ আত্মা যে সদরূপও বটে (অস্তিত্বশীল) এই বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। কারণ, আত্মা নেই, একথা ভাবাই যায় না।[১] তা ছাড়া অন্য যে কোন জিনিসের অস্তিত্বই ত আত্মার অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। আত্মচৈতন্য না থাকলে কোন বিষয়েরই ত প্রকাশ হতে পারে না। জাগ্রৎ বা স্বপ্নকালীন অভিজ্ঞতার বিষয় থাকলেও আত্মাও থাকে; কিন্তু সুষুপ্তিতে জাগ্রৎ বা স্বপ্নকালীন অভিজ্ঞতার বিষয়ের মত কোন বিষয় না থাকলেও আত্মা থাকে। এতে বোঝা যায়, আত্মা ছাড়া বিষয় থাকে না, কিন্তু বিষয় ছাড়া আত্মা থাকতে পারে।[২] সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, শেষপর্যন্ত সুষুপ্তি অবস্থায় সৎ, চিৎ (জ্ঞান) ও আনন্দরূপ আত্মাই থাকে। সুষুপ্তিকালে এই আত্মার আভাষ মাত্র পাওয়া যায়, সাধক তাঁর তূরীয় অভিজ্ঞতায় এই আত্মার পরিপূর্ণ ও অনাবৃত প্রকাশ উপলব্ধি করেন। শঙ্করের মতে যা অবাধিত বা নেই এমন হয় না, তা-ই পারমার্থিক সত্য। এই অর্থে সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপ আত্মাই পারমার্থিক বা আত্যন্তিক সত্য। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তূরীয় এই সমস্ত অভিজ্ঞতাতেই আত্মা অবাধিত। অর্থাৎ আত্মা নেই, এমন কোন অভিজ্ঞতাই হতে পারে না। সেইজন্য শঙ্কর আত্মাকেই চরম সত্য বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] অস্তিত্ব (সৎ), জ্ঞান (চিৎ) এবং আনন্দ এই আত্মার কোন গুণ নয়, স্বরূপ। আত্মা জ্ঞানের বিষয় না হয়েও কখনই অপ্রকাশিত থাকে না। এই অর্থেই আত্মা স্বপ্রকাশ। শঙ্করের মতে এই আত্মা অদ্বিতীয় এবং স্বরূপতঃ নির্গুণ। এই আত্মাকে যখন নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত প্রভৃতি বলা হয়, তখন এই আত্মা অনিত্য নয়, বিভিন্ন মিশ্রণে অশুদ্ধ নয়, অবুদ্ধ বা অচেতন নয়, অমুক্ত বা বদ্ধ নয়, এসবই বোঝান হয়ে থাকে। উপনিষদে এই জন্যই নেতি নেতি করে এই আত্মার পরিচয় উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা হয়েছে। এই আত্মাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের সজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত কোন ভেদই নেই। একই জাতির অন্তর্গত দু-টি ব্যক্তির যে ভেদ, তাকে বলে সজাতীয়ভেদ; যেমন একটি গরুর সঙ্গে অন্য আর একটি গরুর পার্থক্য। এই অর্থে ব্রহ্মের কোন সজাতীয় ভেদ থাকতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। তাঁর সঙ্গে ভেদ থাকবে কার? দুটি ভিন্ন জাতির যে ভেদ, তাকে বলে বিজাতীয় ভেদ; যেমন গরুর সঙ্গে ঘোড়ার পার্থক্য। এই অর্থেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কোন ভেদ থাকতে পারে না, কারণ, ব্রহ্মের কোন বিজাতি নেই। একই জিনিসের অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের ভেদকে স্বগতভেদ বলে; যেমন আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ভেদ। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ হওয়ায় নিরংশ। সুতরাং তাঁর স্বগতভেদ অসম্ভব।

শঙ্কর মতে আত্মা চৈতন্য স্বরূপ, নিত্য শুদ্ধ ও মুক্ত। ব্রহ্ম সমস্ত ভেদরহিত।

১। ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর ভাষ্য ২।৩।৭

২। উপদেশ সাহস্রী ১।২।৯১

৩। অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য 'Studies in Vedantism' গ্রন্থে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার এক অপূর্ব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আত্মা বা ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্যতা নিরূপণ করেছেন। উৎসাহী পাঠক তা অনুধাবন করলে উপকৃত হবেন।

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ বলে শূন্য নয়। তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে বলেছেন,[১] মন্দমতিরাই নির্গুণ ব্রহ্মকে শূন্য বলে মনে করে, ব্রহ্ম পূর্ণ স্বরূপ। সমস্ত বিশ্বই এই সন্‌মূল, সদাশ্রয় এবং সৎপ্রতিষ্ঠ। ভাবপদার্থ কখনই অভাব বা শূন্যপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না।[২] সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্ম বৌদ্ধদের শূন্য নয়।

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ বলে শূন্য নয়।

আলোচনার সময় আমরা এই নির্গুণ ব্রহ্মকেই নাম-রূপ এবং কর্মদ্বারা বিশেষিত করি।[৩] পণ্ডিতেরা এই সব বিশেষণ আমাদের অপূর্ণ এবং অক্ষম আলোচনার অনুষঙ্গ বলে জানেন, কিন্তু মূর্খেরা এগুলোকে সত্য বলে মনে করে।[৪] নির্গুণ ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা এই সমস্ত অনুষঙ্গের ব্যবহার ভিন্ন সম্ভব নয়।[৫] নির্গুণ ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই আমরা ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা, রক্ষক এবং সংহারক রূপে কল্পনা করি। এই ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। এই ঈশ্বরকে আমরা করুণাসিন্ধু, পরম প্রেমিক ও ভক্তের ভগবান বলেও মনে করি। সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ[৬]; স্রষ্টা, রক্ষক, সংহারক প্রভৃতি তাঁর তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত আত্মা এবং একান্ত নির্গুণ। কিন্তু আমাদের লোকব্যবহারে এই ব্রহ্মই আবার স্রষ্টা, রক্ষক, সংহারক, করুণামৃতসিন্ধু ও ভক্তের ভগবান বলে কথিত। এঁর নাম ঈশ্বর। পারমার্থিক দৃষ্টিতে যে ব্রহ্ম নির্গুণ, সেই ব্রহ্মই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সগুণ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, শঙ্করের মতে পারমার্থিক সৎ ও সত্য অদ্বিতীয় আত্মা বা নির্গুণ ব্রহ্ম, যা কোন জ্ঞানেরই বিষয় নয়। যা জ্ঞানের বিষয় তা কখনই অসৎ হতে পারে না। সেইজন্যই শঙ্কর জাগ্রত এবং স্বপ্ন-অভিজ্ঞতার বিষয়কে সৎ বা সত্য বলেছেন। অসতের দিক থেকে এরা সৎ বা সত্য, কিন্তু পারমার্থিক সৎ বা সত্য আত্মার দিক থেকে এরা মিথ্যা। শঙ্করের মতে যা আত্মার মত সৎ নয় আবার বন্ধ্যাপুত্রের মত অসৎ নয় বা সৎ ও অসৎ দুইই একসঙ্গে নয়, তা-ই মিথ্যা। এই মিথ্যা আবার দ্বিবিধ—ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। যে জ্ঞানের বিষয় দিয়ে ব্যবহারিক প্রয়োজন

আমাদের অজ্ঞতার জন্য আমরা এই নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণ বলে ভাবি। ফলে সগুণ ঈশ্বরের ধারণার সৃষ্টি হয়।

শঙ্করের মতে সত্য অসৎ, ব্যবহারিক মথ্যা ও প্রাতিভাসিক মিথ্যার প্রকৃতি।

১। ৮।১।১

২। নাভাবাৎ ভাব উৎপদ্যতে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্য ২।২।২৬

৩। বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্য ২।৩।৬

৪। বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্য ২।১।২০

৫। মাণ্ডুক্য কারিকার শাঙ্কর ভাষ্য ৪।১০০

৬। লক্ষণ দু-প্রকার—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। যা লক্ষ্যের স্বরূপের অন্তর্গত তা স্বরূপ লক্ষণ। যা লক্ষ্যের স্বরূপের অন্তর্গত নয় কিন্তু যা লক্ষ্যকে অন্য বস্তু থেকে আলাদা করে তা তটস্থ লক্ষণ। শ্রুতিতে আছে—'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ', 'ব্রহ্মকে আনন্দ স্বরূপ বলে জানবে'। এই সমস্ত বাক্য ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশ করে। জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক বললে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ব্রহ্ম জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ।

সিদ্ধ হয় এবং যার লোকব্যবহার আছে, তাই ব্যবহারিক মিথ্যা। এই জাতীয় মিথ্যা বিষয় সকলের কাছেই সাধারণতঃ একরূপ এবং সাধারণতঃ সবাই তা একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করতে পারে। সমস্ত জাগতিক বস্তুই এই জাতীয় মিথ্যা। এদের দ্বারা ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সকলের কাছেই সাধারণতঃ এদের একই রূপে প্রকাশ এবং সবাই এদের একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করতে পারে। স্বপ্ন-অভিজ্ঞতার বিষয়, ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় (যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম কালে সর্প) প্রভৃতি প্রাতিভাসিক মিথ্যা। এরা জ্ঞানের বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয় বলে অসৎ হতে পারে না; আবার আত্মার মত একান্ত অবাধিত নয়, সুতরাং পারমার্থিক সৎও নয়। জগতের মত এদের দিয়ে কোন লোকব্যবহার হতে পারে না, এমনকি এরা একই সঙ্গে জগতের মত সকলের জ্ঞানের বিষয়ও হতে পারে না, এজন্যই এদের ব্যবহারিক মিথ্যা থেকে নিম্নশ্রেণীর প্রাতিভাসিক মিথ্যা নামে অভিহিত করা হয়েছে। রাখাল বালক রঙ্গমঞ্চে রাজার ভূমিকায় অভিনয় কালে রাজ্য জয় করে তা শাসন করে। স্বরূপতঃ সে রাখাল, কিন্তু অভিনয়ের দিক থেকে সে রাজা। শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম বা পারমার্থিক সত্য স্বরূপতঃ নির্গুণ, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে তা সগুণ ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হয়।[১] উপনিষদে ব্রহ্মকে "সত্যম্, জ্ঞানম্, অনন্তম্"[২] বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এইক্ষেত্রে ব্রহ্ম অসত্য নয়, অজ্ঞান নয় এবং সান্ত নয়—এমনিভাবে নেতি নেতি করে বুঝতে হবে বা সত্য, জ্ঞান ও অনন্তকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলেও বোঝা যেতে পারে।

(২) জগৎ মিথ্যা

শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা। আমরা আগেই বলেছি, শাঙ্কর দর্শনে যা আত্মার মত নিত্য অবাধিত নয়, আবার বন্ধ্যাপুত্রের মত জ্ঞানের বিষয়ই হতে পারে না, এমন অসৎ নয়, তাই মিথ্যা। জগৎ আত্মা নয়, আত্মার বিষয় আমরা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তূরীয় অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণকালে দেখেছি, সমস্ত অভিজ্ঞতায় একমাত্র আত্মাই হল তা যা অনিত্য নয়, জ্ঞানের বিষয় নিত্য পরিবর্তনশীল। আত্মা অনিত্য নয় বলেই পরমার্থিক সৎ, আর জ্ঞানের বিষয় জগৎ অনিত্য ও পরিবর্তনশীল বলেই মিথ্যা। এই জগৎ একদিকে স্বপ্ন-অভিজ্ঞতার বিষয় ও রজ্জুতে সর্পভ্রমকালে সর্পের মত একান্তভাবে ব্যক্তি-বিশেষের কাছে প্রতিভাত নয়, অন্যদিকে আবার ব্রহ্মের মত আত্যন্তিক সৎও নয়। জগৎ মিথ্যা বলতে শঙ্করাচার্য একথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

জগৎ ব্রহ্মের মত সত্য নয়, বন্ধ্যাপুত্রের মত অসৎ নয়, আবার রজ্জুতে জ্ঞাত সর্পের মত প্রাতিভাসিক নয়। জগৎ ব্যবহারিক মিথ্যা।

১। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য ২।১।১৮

২। তৈত্তিরীয় ২।১

উপনিষদে 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি' প্রভৃতি বৈচিত্র্যের সত্যতা-বিরোধী সুস্পষ্ট বাক্য পাওয়া যায়। 'যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ', যস্যামতং মতং তস্য, মতং যস্য ন বেদ সঃ—' প্রভৃতি বাক্যে ব্রহ্ম নির্গুণ একথাও সুস্পষ্ট। নির্গুণ ব্রহ্ম ত জগতের স্রষ্টা হতে পারেন না। সর্বশেষে 'সদেব সৌম্যেদম্ অগ্রে আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্' প্রভৃতি উপনিষদ বাক্যে সত্য এক ও অদ্বিতীয় সৎ বলেই কথিত হয়েছে। এই সমস্ত বাক্য বিচার করে জগৎ-বৈচিত্র্যকে মিথ্যা না বলে উপায় নেই।

বহু উপনিষদ-বাক্য জগতের মিথ্যাত্বই সমর্থন করে।

এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—কোন কোন উপনিষদে ত আবার জগৎ-সৃষ্টিকে সত্য বলেই উল্লেখ করা হয়েছে, ঈশোপনিষদের 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্—' প্রভৃতি বাক্য বিস্মৃত হলে চলবে কেন?

আবার জগৎ সত্য একথা বলা হয়েছে এমন উপনিষদ-বাক্যও আছে।

শঙ্করাচার্য জগৎসৃষ্টির সত্যতা নির্দেশক উপনিষদ বাক্য এবং বৈচিত্র্য নিষেধক উপনিষদ বাক্যের মধ্যে সঙ্গতি প্রদর্শনের জন্য উপনিষদ থেকেই 'মায়া' কথাটি গ্রহণ করে জগতের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। ঋক্‌বেদে 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' (এক ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বহুরূপে প্রকাশিত হন) এই বাক্য পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদও একথার সত্যতা স্বীকার করেছেন।[১] শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঈশ্বরের মায়াশক্তি থেকেই যে জগতের উৎপত্তি তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

শঙ্কর দুই শ্রেণীর উপনিষদ বাক্যের সঙ্গতি প্রদর্শনের জন্য 'মায়া' কথাটি গ্রহণ করে জগতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

শঙ্কর বলেন, জগৎ মায়ার সৃষ্টি বা জগৎ মায়া। মায়াকে ঈশ্বরের শক্তি হিসেবে কল্পনা করা যায়। অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন অগ্নি থেকে অভিন্ন, মায়াশক্তিও তেমনই ঈশ্বর থেকে অভিন্ন। যাদুকরের যাদুশক্তির মতই ঈশ্বরের এই শক্তি একমাত্র অজ্ঞ লোককেই ভ্রান্তিতে ফেলে। যাদুকর যখন একটি টাকাকে দশটি টাকায় রূপান্তরিত করে, তখন যারা যাদুশক্তির ফাঁকি বোঝে না তারাই তা সত্য বলে মনে করে এবং যাদুশক্তির তারিফ করে। কিন্তু যারা যাদুশক্তির ভেল্কি বোঝে তারা যাদুশক্তিকে একান্তভাবেই ফাঁকি বলে জানে এবং যাদুর সৃষ্টিকে মিথ্যা বলেই মানে। তেমনই আমরা যারা অজ্ঞ তারাই ঈশ্বরের মায়াশক্তিকে সত্য বলে মনে করি এবং এই শক্তিসৃষ্ট জগতকে সত্য বলে গ্রহণ করি। কিন্তু যাঁরা প্রাজ্ঞ তাঁরা মায়াশক্তি যে আসলে কোন শক্তিই নয় এবং জগৎ যে মিথ্যা, তা সহজেই উপলব্ধি করেন। যাদুকর কখনই যাদুশক্তিকে কোন সত্যিকারের শক্তি বলে মনে করেন না, ঈশ্বরও মায়া যে কোন শক্তি নয় তা বোঝেন।

অগ্নির দাহিকা শক্তির মত ব্রহ্মের মায়া শক্তি অধিষ্ঠান থেকে অভিন্ন। এই মায়া-শক্তি যাদুশক্তির সঙ্গে তুলনীয়।

১। বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্য ২।৫।১৯

২। 'মায়াং তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ, মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্'—শ্বেতাশ্বতর ৪।১০

আসলে অজ্ঞলোকের কাছেই মায়া ঈশ্বরের শক্তি এবং জগৎ এই শক্তির সৃষ্টি, প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বরের কাছে মায়া কোন শক্তিই নয় এবং জগতও সত্য নয়।

মায়া স্বরূপতঃ ভ্রান্তি উৎপাদনকারী অজ্ঞান বিশেষ। ভ্রান্তিতে আমরা একটি জিনিসের স্থানে অন্য আর একটি জিনিস দেখি; যেখানে রজ্জু আছে সেখানে দেখি সর্প। একটি জিনিসে আর একটি জিনিস দেখার কারণ সত্য জিনিসটির অজ্ঞান। রজ্জুকে রজ্জু বলে জানলে রজ্জুতে সর্প-দর্শন অসম্ভব। রজ্জুর অজ্ঞানের জন্যই রজ্জুতে সর্পের ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। অজ্ঞানের দুই কাজ—আবরণ ও বিক্ষেপ। অজ্ঞান যেমন সত্য জিনিসকে ঢেকে দেয় (আবরণ), তেমনই আবার অন্য আর একটি জিনিস তাতে প্রকাশিতও করে (বিক্ষেপ)। আমরা রজ্জুর অজ্ঞান-জন্য যখন রজ্জুতে সর্প দেখি, তখন রজ্জুর অজ্ঞান যেমন রজ্জুকে আবৃত করে, তেমনি আবার রজ্জুতে সর্পবিক্ষেপও করে। শঙ্করের মতে অজ্ঞান বা অবিদ্যা কোন অভাবপদার্থ নয়, একান্তভাবেই ভাবরূপ। কোন অভাবপদার্থই বিক্ষেপ সৃষ্টি করতে পারে না। পরবর্তীকালে বিবরণকার অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব প্রদর্শনের জন্য অনেক প্রমাণ দিয়েছেন।[১] আমরা স্থানাভাবে এবং অত্যন্ত জটিল বলে তা এখানে উদ্ধৃত করছি না। অজ্ঞান বা মায়া[২] শুধু ভাবরূপ নয়, অনাদিও বটে। কারণ, অজ্ঞান বা মায়া কখন উৎপন্ন হয়েছিল তা নির্ণয় করা অসম্ভব। নির্গুণ ব্রহ্ম সম্পর্কে অজ্ঞানজন্যই আমরা তাঁর পরিচয় না পেয়ে বিচিত্র জগতের পরিচয় পাই। তবে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা সত্যের স্বরূপ বোঝেন এবং জগতের বৈচিত্র্য তাঁদের আর ভোলাতে পারে না। অজ্ঞান অনাদি হলেও অনন্ত নয়। অজ্ঞান জ্ঞান নাশ্য, অর্থাৎ সত্যের জ্ঞান হলে অজ্ঞান থাকে না।

মায়া ভ্রান্তি উৎপাদনকারী অজ্ঞান বিশেষ। অজ্ঞানের দুই কাজ—আবরণ ও বিক্ষেপ।

এই প্রসঙ্গে বলা ভাল, মায়াকে প্রকৃতি ও অব্যক্ত বলা হয়। তবে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি ও শাঙ্করদর্শনের মায়া এক নয়।[৩] সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি সত্য বলে কথিত। কিন্তু শাঙ্করদর্শনে মায়া মিথ্যা বলে পরিচিত। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত, শাঙ্করমতে ব্রহ্ম ভিন্ন মায়া দুর্বোধ্য। মায়াকে মিথ্যা বলার কারণ, মায়া ব্রহ্মের মত নিত্য অবাধিত বা পারমার্থিক সৎ নয়, আবার বন্ধ্যা-পুত্রের মত একেবারে প্রতিভাত হতে পারে না, এমন অসৎও নয়। অর্থাৎ মায়া সৎও নয় আবার অসৎও নয়। যা সৎ ও অসৎ কোনটাই নয় তা যেমন মিথ্যা তেমনই

মায়াকে প্রকৃতি ও অব্যক্ত বলা হয়। তবে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি ও শাঙ্কর দর্শনের মায়া এক নয়।

১। উৎসাহী পাঠক ডঃ অনিলকুমার রায়চৌধুরী লিখিত 'The Doctrine of Maya' গ্রন্থে এইসব প্রমাণ পাবেন।

২। মায়া এবং অবিদ্যা এক, না ভিন্ন, এ বিষয়ে অদ্বৈতবেদান্তীদের মধ্যে মতভেদ আছে। বিবরণ সম্প্রদায় মায়া ও অবিদ্যা অভিন্ন বলে মনে করেন।। শঙ্করাচার্যেরও এমত বলেই মনে হয়। এই মত অনুসারে আবরণশক্তির প্রাধান্য অবিদ্যায় এবং বিক্ষেপ শক্তির প্রাধান্য মায়ায়। ব্রহ্মই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের আশ্রয় এবং বিষয়। ভামতী সম্প্রদায় অবিদ্যাকে মূলা এবং তূলা এই দুভাগে ভাগ করেছেন। মূলাবিদ্যাই মায়া, জীবের উপাধি অবিদ্যা তূলাবিদ্যা। মূলাবিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্ম, তূলাবিদ্যার আশ্রয় জীব।

৩। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য ১।৪।৩

অনির্বচনীয়। মায়া অনির্বচনীয় এইজন্য যে, সৎ ও অসৎ কোন প্রত্যয় দিয়েই একে বোঝা যায় না। সুতরাং মায়া অনাদি, অনির্বচনীয়, মিথ্যাভূত ও ভাবরূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যা।

শঙ্করের মায়াবাদ পরস্পর বিরুদ্ধ উপনিষদ বাক্যের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া ছাড়াও কয়েকটি অত্যন্ত জটিল দার্শনিক সমস্যারও যুক্তিযুক্ত সমাধান দেয়। (১) সত্য যদি অদ্বৈত হয়, তবে জগৎ-বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দেওয়া খুবই কষ্টকর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে অদ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা এই ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে স্পিনোজা, হেগেল, ব্রেডলি প্রভৃতি অনেকেই এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। আমাদের বিশ্বাস, একমাত্র শঙ্করই এই বিষয়ে যা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত, তা যতই মানসিক প্রবণতা বিরোধী হোক না কেন গ্রহণ করতে একটুও পশ্চাৎপদ হননি। যুক্তি অনুধাবনের এই বলিষ্ঠতা অন্য কোন দার্শনিকের মধ্যেই দেখা যায় না। আত্মা যদি অদ্বিতীয় ও একান্ত সত্য হয়, তবে অনাত্মা এই জগৎ মিথ্যা বা মায়া ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না। আত্মা ও অনাত্মা উভয়ই সত্য হলে অদ্বৈতবাদ থাকে না। আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করবো আবার অনাত্মা জগতকেও সত্য বলবো, এ কখনই হতে পারে না। আমরা পূর্বেই আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে, একমাত্র আত্মাই সমস্ত অভিজ্ঞতায় অবাধিত বা নিত্য বর্তমান। সুতরাং আত্মাই পরমার্থ সত্য একথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। যা থাকেনা তা কি কখনও সত্য হতে পারে? আর সত্যই বা কি কখনও না-ই এমন হতে পারে? এই যদি প্রকৃত অবস্থা হয়, তবে অনাত্মা জগৎ মিথ্যা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। জগৎ স্বপ্ন বা রজ্জুতে প্রতিভাত সর্পের মত কোন ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতার বিষয় নয়, বন্ধ্যাপুত্রের মত অসৎ নয়, আবার আত্মার মত নিত্য অবাধিতও নয়। একে ব্যবহারিক মিথ্যা ছাড়া আর কি বলা যাবে?

সত্য যদি অদ্বৈত ও চৈতন্য স্বরূপ হয়, তবে জগৎ মিথ্যা না হয়ে পারে না।

(২) মায়াবাদের আর এক নাম বিবর্তবাদ। আমরা সাংখ্যদর্শন আলোচনার সময় বলেছি, অসৎকার্যবাদ অপেক্ষা সৎকার্যবাদই অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য, আবার সৎকার্যবাদের দুটি রূপের মধ্যে পরিণামবাদ থেকে বিবর্তবাদই অধিকতর সঙ্গত। আমরা পুনরুক্তি পরিহারের জন্য প্রাসঙ্গিক সমস্ত কথা আবার বলছি না। পাঠক অনুগ্রহ করে সাংখ্যদর্শন অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত এই প্রসঙ্গ অনুধাবন করবেন। সৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য কারণে সৎ বা বর্তমান থাকে। যার মধ্যে যে বস্তুর সম্ভাবনা নেই, তার থেকে সে বস্তুর উদ্ভব হতে পারে না। কাঠে তৈলের কোন সম্ভাবনা নেই বলেই কাঠ থেকে তৈল হয় না। কিন্তু তিলে তৈলের সম্ভাবনা আছে, তাইত তিল থেকে তৈল পাই। কার্য যদি বস্তুতঃ কারণেই থাকে, তবে কার্যকে কারণের বিবর্ত বা প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না। সর্প যেমন রজ্জুর বিবর্ত বা প্রকাশ, কার্যও তেমনি কারণের বিবর্ত বা প্রকাশ।

কার্য-কারণ সম্পর্কের প্রকৃতি আলোচনা করে বিবর্তবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায়। বিবর্তবাদের আর এক নাম মায়াবাদ।

সুতরাং কার্য জগতকে কারণ ব্রহ্মের বিবর্ত বা মায়া ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। উপনিষদেও 'বাচারম্ভণো বিকারনামধেয়ং মৃত্তিক্যেত্যেব সত্যম্' প্রভৃতি বাক্যে মৃত্তিকা নির্মিত বিভিন্ন বস্তুতে বা কার্যে মৃত্তিকা বা কারণের সত্যতাই ঘোষিত হয়েছে। কারণই সত্য, কার্য তার বিবর্ত মাত্র।[১]

(৩) জগতের যে কোন বস্তুই অনির্বচনীয় স্বভাব। সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না বলে জাগতিক বস্তু অনির্বচনীয়। যা নিত্য তাই ত সৎ। জাগতিক বস্তু ত নিত্য নয়। তবে তা সৎ হবে কি করে? কিন্তু সেজন্য কি জগতের বস্তু অসৎ? তাও ত নয়। বন্ধ্যাপুত্রের মত যে সমস্ত জিনিস কখনই প্রতিভাত হয় না, তা-ই ত অসৎ। জাগতিক বস্তু ত আমরা সকলেই দেখি, তবে তা অসৎ হবে কেন? সুতরাং যে কোন জাগতিক বস্তুই সৎ বা অসৎ নয় বলে অনির্বচনীয়। যে কোন একটি জাগতিক বস্তু অন্য আর একটি জাগতিক বস্তুর সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু অনির্বচনীয় জগৎ কি করে হল? যা অনির্বচনীয় তা সৎ বা অসৎ কারুরই সৃষ্টি হতে পারে না। একমাত্র অনির্বচনীয়ই অনির্বচনীয়ের কারণ হতে পারে। জগতের অনির্বচনীয় কারণ আবার যদি সাদি হয়, তবে তারও একটি অনির্বচনীয় কারণ খুঁজতে হবে এবং এমনি করে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। এই অনবস্থা পরিহারের জন্য অনির্বচনীয় জগৎ অনির্বচনীয় অনাদি মায়ার সৃষ্টি বলেই স্বীকার করা সঙ্গত।

জাগতিক বস্তু অনির্বচনীয় স্বভাব। সুতরাং এদের কারণ অনির্বচনীয় মায়াই হবে।

(৪) জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব স্বয়ংসিদ্ধ নয়। চৈতন্য ভিন্ন এদের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। কিন্তু চৈতন্য স্বপ্রকাশ, অন্য বস্তু নিরপেক্ষ। আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি, চৈতন্য ছাড়া বিষয় থাকতে পারে না, কিন্তু বিষয় ছাড়া (সুষুপ্তি অবস্থায়) চৈতন্য থাকতে পারে। সুতরাং বিষয়ের অস্তিত্ব চৈতন্যসিদ্ধ, কিন্তু চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বয়ংসিদ্ধ। চৈতন্য সব সময়ই প্রকাশিত। স্বয়ংসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ চৈতন্য যদি সত্য হয়, তবে তন্নির্ভর বস্তু কি হবে? কখনই চৈতন্যের মত সত্য হবে না। অবশ্য বন্ধ্যাপুত্রের মত অসৎ বা স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতার বিষয় বা রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির বিষয়ের মত প্রতিভাস কাল মাত্রও স্থায়ী হবে না। শঙ্কর এই জাতীয় বস্তুর নামই দিয়েছেন মিথ্যা। একে মিথ্যা ছাড়া আর কি-ই বা বলা যাবে?

জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব স্বয়ংসিদ্ধ নয়, চৈতন্য সিদ্ধ। চৈতন্য স্বয়ং সিদ্ধ। সুতরাং চৈতন্য সত্য, জগৎ মিথ্যা।

এই প্রসঙ্গে পরিষ্কার করে বলা দরকার, শঙ্কর বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদীদের মত মনের ভাব বাহ্য বিষয়াকারে প্রকাশিত হয়, এমন কথা কোথায়ও স্বীকার করেননি। বরং তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করেছেন। শঙ্কর জ্ঞানকে বস্তুতন্ত্র বলেছেন। সুতরাং তাঁর মতে সাধারণজ্ঞান কখনই বিষয় ছাড়া হতে পারে না। এই মত বিজ্ঞানবাদ হবে কি করে? শঙ্করের মায়াবাদ শূন্যবাদও নয়। শঙ্কর বলেছেন, অধিষ্ঠানের সত্যতা

শঙ্করের মায়াবাদ বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ থেকে স্বতন্ত্র।

১। বৃহদারণ্যক সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য ২।১।১৪-২০, ছান্দোগ্য ৬।২, তৈত্তিরীয় ২।৬, বৃহদারণ্যক ১।২।১, গীতা ২।১৬।

স্বীকার না করলে জগৎ কোথায় নিষিদ্ধ বা নাই বলা হবে? জগতের নিষেধ বা নাই বলতে হলে কোথায় জগৎ নাই তা নিশ্চয়ই বলা দরকার।[১] শূন্যবাদীরা একথার জবাব দিতে পারেন না। শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মে জগৎ নিষিদ্ধ হয়; ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান। আর একটি কথা, শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা হলেও স্বপ্নের মত অলীক নয়। আমরা আগেই বলেছি, শঙ্করের মতে স্বাপ্ন-আভজ্ঞতার বিষয় প্রাতিভাসিক মিথ্যা, কিন্তু জগৎ ব্যবহারিক মিথ্যা।

মায়াসংযুক্ত ব্রহ্ম থেকে বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টিক্রম। পঞ্চীকরণের প্রকৃতি।

মায়াসংযুক্ত ব্রহ্ম থেকে কি ক্রমানুসারে বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে, এ বিষয়ে সমস্ত উপনিষদেই এক রকম বিবরণ পাওয়া যায় না। একটি বিশিষ্ট বিবরণ অনুসারে আত্মা বা ব্রহ্ম থেকে প্রথমতঃ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ এবং ক্ষিতি এই ক্রমানুসারে পঞ্চমহাভূতের আবির্ভাব ঘটে। এই পঞ্চমহাভূত পাঁচ প্রকার বিভিন্নভাবে মিশ্রিত হয়ে পঞ্চভূতের সৃষ্টি করে। ভৌত আকাশ ½ ভূত আকাশ এবং বাকি চারটি ভূতের প্রত্যেকটির ⅛ অংশ থেকে সৃষ্টি। এমনি করে অন্যান্য ভূত ও সেই মহাভূতের অর্ধাংশ এবং অন্যান্য মহাভূতের প্রত্যেকটির এক অষ্টমাংশের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। এই প্রক্রিয়ার নাম পঞ্চীকরণ। শঙ্করাচার্য এই প্রক্রিয়া স্বীকার করেছেন।

বিভিন্ন খ্যাতিবাদ খণ্ডন করে শঙ্করপন্থীরা অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় সৎ ও অসৎ-বিবিক্ত অনির্বচনীয়, এই ধারণার ওপর নির্ভর করেই শঙ্করের জগৎ-মিথ্যাত্ব-ধারণা গড়ে উঠেছে। রজ্জুতে সর্প দর্শনরূপ ভ্রান্তজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় সর্প, শঙ্করের মতে অসৎ নয়। বন্ধ্যাপুত্রের মত অসৎ জিনিস কখনই প্রতিভাত হয় না এবং তাতে লোকে ভয়ও পায় না। রজ্জুতে-সর্প-দর্শন কালে সর্প প্রতিভাত হয় এবং ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সর্পকে ভয় করে ছুটেও পালায়। সুতরাং এই সর্প অসৎ নয়। যা সৎ তা কখনই না-ই হতে পারে না। কিন্তু আলো নিয়ে এলেই রজ্জুতে প্রতিভাত সর্প আর থাকে না। সুতরাং এই সর্পকে সৎও বলা যাবে না। কোন জিনিস একই সঙ্গে সৎ ও অসৎ দুইই হতে পারে না। সুতরাং এই সর্প সদসৎও নয়। অর্থাৎ এই সর্প সৎ নয়, অসৎ নয়, আবার সদসৎও নয়। শাঙ্কর-দর্শনে এরই নাম অনির্বচনীয়। শঙ্করের মতে জগতেরও এই প্রকৃতি। ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে শঙ্করের এই ব্যাখ্যা অনির্বচনীয়খ্যাতি নামে পরিচিত। অন্যান্য দার্শনিকেরা এই মত স্বীকার করেন না। বৌদ্ধেরা অসৎখ্যাতি, নৈয়ায়িকেরা অন্যথাখ্যাতি, মীমাংসকেরা অখ্যাতি এবং রামানুজ সৎখ্যাতি প্রচার করেছেন। বৌদ্ধদের মতে যা অসৎ ভ্রান্তজ্ঞানে তা-ই প্রকাশিত হয়, নৈয়ায়িকদের মতে অন্যথা বস্তু এইখানে ভ্রান্তজ্ঞানে ভাসে, ভাট্ট মীমাংসকদের মতে ভ্রান্তজ্ঞানে প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির সমন্বয় হয় এবং এদের ভেদ উপলব্ধি হয় না, রামানুজ মতে ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়ও সৎ বস্তু। আমরা রামানুজ ভিন্ন অন্যান্য দার্শনিকদের মত বিভিন্ন অধ্যায়ে যথাস্থানে আলোচনা করেছি। রামানুজের মত রামানুজ দর্শন আলোচনাকালে

১। ব্রহ্ম সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য ২।২।৩১

বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করবো। এই সমস্ত মত শঙ্কর-মত বিরোধী। এদের যে কোন একটা সত্য হলে শঙ্করের জগৎমিথ্যাত্ব মত অগ্রাহ্য হয়ে যাবে। সেইজন্য শঙ্করপন্থীরা এই সমস্ত মত বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে এই খণ্ডন-চেষ্টার একটি চমৎকার প্রকাশ পাওয়া যাবে। উৎসাহী পাঠক তা পড়লে উপকৃত হবেন। আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিপুলাকার বলে আমরা তা উদ্ধৃত করছিনা।[১]

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শঙ্কর রিয়ালিষ্ট, কিন্তু পরমার্থতঃ তিনি অধ্যাত্মবাদী।

শঙ্কর নিঃসন্দেহে অধ্যাত্মবাদী। কারণ, তাঁর মতে আত্মাই পারমার্থিক সত্তা ও সত্য। কিন্তু বস্তু ব্যক্তি-জ্ঞানের সৃষ্টি এমন বিজ্ঞানবাদী ভাববাদ তিনি কখনই প্রচার করেন নি।[২] ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ সত্য। সুতরাং এইদিক থেকে শঙ্কর রিয়ালিস্ট বা বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী। পারমার্থিক দৃষ্টিতে একমাত্র আত্মাই সত্য। সুতরাং এই দিক থেকে শঙ্কর অধ্যাত্মবাদী।

(৩) জীব ব্রহ্মস্বরূপ

শঙ্কর অদ্বৈতবাদী। তাঁর মতে ভেদ অসিদ্ধ।

শঙ্করাচার্য আপোষহীন অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। সুতরাং তাঁর মতে ভেদ বলে কিছু থাকতে পারে না। ভেদ-খণ্ডন অদ্বৈতদর্শনে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। উৎসাহী পাঠক ডঃ অনিলকুমার রায়চৌধুরী লিখিত 'Doctrine of Maya' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা পাবেন। শঙ্করের মতে ভেদ নয়, অভেদ বা অদ্বৈতই আসল কথা। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ নেই। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম।

জীব এমনিতে আত্মা এবং অনাত্মার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। তবে জীব স্বরূপতঃ চৈতন্য মাত্র।

জীব এমনিতে আত্মা এবং অনাত্মার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। আত্মা এবং অনাত্মা সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব। আমাদের অভিজ্ঞতা এবং লোক-ব্যবহার সবই আত্মা এবং অনাত্মার একীকরণ অধ্যাসের ফল (ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর ভাষ্য ১।১।১)। অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধি সংযুক্ত হয়ে আত্মা ভোক্তা বিষয়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং তার বার বার জন্ম হয়। আমরা যখন জীবের জন্ম ও বৃদ্ধির কথা বলি, তখন আসলে আত্মার উপাধি অন্তঃকরণ প্রভৃতির যে জন্ম ও বৃদ্ধি হয়, এই কথাই বোঝাতে চাই। আত্মা অনিত্য নয়। সুতরাং তাঁর জন্ম, মৃত্যু বা বৃদ্ধি কিছুই সম্ভব নয়। অনাত্মার সঙ্গে একীকরণ বা অধ্যাসের জন্যই অনাত্মার

১। এই প্রসঙ্গের একটি চমৎকার আলোচনা ডঃ সুশীল মৈত্র লিখিত 'Studies in Philosophy and Religion' গ্রন্থে রয়েছে। অল্প পরিসরে এমন সুন্দর আলোচনা আমাদের চোখে আর পড়েনি।

২। "Samkara is an ontological idealist and not an epistemological one. He rejects the theory which identifies the essence of a thing with our perception of it. He does not say that the world depends on the perceiver for its existence. To say that the self is the foundational reality is not to say that our awareness constitutes the reality of the object." Radhakrishnan: History of Philosophy, East and West P279.

জন্ম, মৃত্যু ও বৃদ্ধিকে আমরা আত্মার জন্ম, মৃত্যু ও বৃদ্ধি বলে মনে করি। এরই নাম বন্ধন। অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধি মুক্ত হলে জীব চৈতন্যরূপে অবস্থান করে। এই চৈতন্য জ্ঞানস্বরূপ। এটা কোন জ্ঞান-প্রক্রিয়া নয়, একে জ্ঞান-তত্ত্ব বলা যেতে পারে। জ্ঞান-প্রক্রিয়া শঙ্করদর্শনে বৃত্তিজ্ঞান নামে পরিচিত। ব্রহ্ম যে অর্থে জ্ঞানস্বরূপ, বৃত্তিজ্ঞান সেই অর্থে জ্ঞান নয়। ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলার সময় জ্ঞানকে একটি তত্ত্ব (metaphysical entity) বলে মনে করা হয়। কিন্তু বৃত্তিজ্ঞান বলতে জ্ঞান-প্রক্রিয়া বোঝায়। অন্তঃকরণ বিষয়াকারে পরিণত হলে তা স্বাক্ষী-ভাস্বর হয়। এরই নাম বৃত্তিজ্ঞান। অন্তঃকরণ পঞ্চভূতের সৃষ্টি। তবে পঞ্চভূতের মধ্যে অন্তঃকরণে তেজসেরই প্রাধান্য। সেইজন্য অদ্বৈতদর্শনে অন্তঃকরণকে তৈজস বলা হয়। ইন্দ্রিয় বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হলে ইন্দ্রিয়পথে অন্তঃকরণ বহির্গত হয় এবং বিষয়াকার লাভ করে। এই বিষয়াকারে রূপায়িত অন্তঃকরণ সাক্ষী-চৈতন্য ভাস্বর হলেই বৃত্তিজ্ঞান জন্মে। সাক্ষী স্বয়ংপ্রকাশ, নিজেই ভাস্বর।[১] সাক্ষীকে প্রকাশের জন্য অন্য কোন জ্ঞানের দরকার হয় না। আমরা এ বিষয় পূর্বে প্রমা, প্রমাণ ও প্রমেয় আলোচনাকালে বিস্তারিতভাবে পরিবেশন করেছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

জীব ও চৈতন্য।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, জীব অন্তঃকরণ বিশিষ্ট আত্মা এবং অন্তঃকরণ মুক্ত আত্মাই জীবের স্বরূপ[২] ; জীব চৈতন্যস্বভাব, অন্তঃকরণ তার উপাধি মাত্র। অনাত্মা বা শরীর আত্মার মতই জীবে বর্তমান। তবে শরীর আসলে মায়া বা মিথ্যা। শরীর দ্বিবিধ—স্থূল এবং সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করি। ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্তঃকরণ প্রভৃতি মিলে সূক্ষ্ম শরীর গঠন করে। স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর উভয়ই মায়াসৃষ্ট, মিথ্যা। আমরা অজ্ঞানের জন্য এই শরীরকে জীবের স্বরূপাঙ্গ বলে মনে করি। আসলে জীব স্বরূপতঃ চৈতন্যস্বভাব। আমরা পূর্বেই দেখেছি, অদ্বৈতমতে চৈতন্য আত্মার স্বরূপ এবং আত্মাই ব্রহ্ম। জীবও চৈতন্য-স্বরূপ হওয়ায় আসলে আত্মা বা ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। সাংখ্যকারেরা যে আত্মাকে বহু বলেছেন, তা খুবই অসঙ্গত হয়েছে। দেহের বিভিন্নতার জন্যই জীব বিভিন্ন বলে মনে হয়।

'তত্ত্বমসি' বাক্যের অদ্বৈত ব্যাখ্যা।

স্বরূপতঃ চৈতন্যস্বভাব সমস্ত জীবই এক ও অভিন্ন। উপনিষদে 'তত্ত্বমসি' বাক্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নত্বই ঘোষিত হয়েছে। তৎ বলতে চৈতন্যরূপ পরামাত্মা বা ব্রহ্ম এবং ত্বম্ বলতে জীবাত্মা বুঝতে হবে। জীবের আসল রূপ তাঁর আত্মা বা চৈতন্যেই প্রকাশিত। সুতরাং স্বরূপের দিক থেকে জীবে ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নেই। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—অভেদ বাক্য ত নিরর্থক। তবে তৎ (সেই) ত্বম্ (তুমি), একথা বলে লাভ কি? রাম রাম একথা ত কেউ বলে না। এই ক্ষেত্রে শঙ্কর বলেন,

১। পঞ্চদশী ৯।৩২

২। বেদান্ত পরিভাষা ২০ পৃষ্ঠা

সাধারণতঃ জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন বলে মনে করা হয়। 'তত্ত্বমসি' বাক্যে এই ভিন্নত্ববোধ যে মিথ্যা তা-ই নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং এই বাক্য নিরর্থক হবে কেন?

জীব যে স্বরূপতঃ চৈতন্য-স্বভাব, শঙ্কর তা জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থা বিশ্লেষণ করেও দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, জাগ্রত অবস্থায় চৈতন্য ও বিষয় দুইই থাকে, স্বপ্নকালে চৈতন্য ও বিষয়ের স্মৃতি বর্তমান, কিন্তু সুষুপ্তিকালে শুধু চৈতন্যই বর্তমান। সেখানে ত কোন সাধারণ বিষয় নেই। আমরা সুষুপ্তিতে যে আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করি তা আত্মচৈতন্যেরই আনন্দ। কারণ, সেই অবস্থায় আত্মচৈতন্য ভিন্ন আর ত কিছুই থাকে না। বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় অবাধিত যে আত্মচৈতন্য, তাকেই জীবের স্বরূপ বলে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, যা বাধিত বা নাই হয়ে যায় তা'ত কখনই সত্য হতে পারে না। সুষুপ্তিতে জীবাত্মার স্বরূপের যে আভাস পাওয়া যায়, সাধক সমাধিকালে তূরীয় অবস্থায় তাই সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন। জীব যে স্বরূপতঃ চৈতন্য ও আনন্দরূপ আত্মা এই উপলব্ধির নামই মুক্তি। জীব স্বরূপতঃই চৈতন্য ও আনন্দরূপ আত্মা বলে জীব স্বরূপতঃই মুক্ত। অর্থাৎ জীব স্বরূপে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা।[১]

বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় অবাধিত আত্মচৈতন্য জীবের স্বরূপ।

জীবের বন্ধন ও মুক্তি

জীব স্বরূপতঃ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা। কিন্তু অজ্ঞানজন্য জীব এই স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং অনাত্মা দেহের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম বলে মনে করে। ফলে দেহের জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক সবই নিজের জন্ম, মৃত্যু, রোগ ও শোক বলে মনে হয়। এরই নাম বন্ধন। জীব-স্বরূপের অজ্ঞানই এই বন্ধনের কারণ।

জীব স্বরূপতঃ মুক্ত। তবে অজ্ঞানজন্য জীব তার স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং তাতেই হয় বন্ধন।

শঙ্কর বলেন, এই অজ্ঞান দূর করতে হলে জীব-স্বরূপের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কিন্তু এই জ্ঞান অর্জন খুব সহজ ব্যাপার নয়। এই জন্য বিশেষ প্রস্তুতি দরকার।

১। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে অদ্বৈতবেদান্তীরা প্রতিবিম্ববাদ এবং অবচ্ছেদকবাদ নামে মতবাদ প্রচার করেছেন। জলে একই সূর্যের যেমন বিভিন্ন প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনই একই আত্মা অবিদ্যায় বিভিন্নরূপে প্রতিবিম্বিত হয়। এর নাম প্রতিবিম্ববাদ। বিবরণ সম্প্রদায় এ মত গ্রহণ করেন। অবচ্ছেদকবাদ মতে একই আকাশ যেমন বিভিন্ন বস্তুতে অবিচ্ছিন্ন হয়ে ঘটাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতি নাম পরিগ্রহ করে, তেমনই একই আত্মা দেহ ভেদে ভিন্ন রূপ নেয়। এই মতবাদের নাম অবচ্ছেদকবাদ। ভামতী সম্প্রদায় এমত প্রচার করেন। এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী লিখিত 'অদ্বৈতবাদ' গ্রন্থে পাওয়া যাবে। সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, জীব ব্রহ্মের অবচ্ছেদ বা প্রতিবিম্ব নয়, অধিকারী ব্রহ্মের আবিদ্যক প্রকাশ। কর্ণ যেমন কুন্তীপুত্র থেকেই রাধাপুত্র হয়েছিল, ব্রহ্মও তেমনি অবিকৃত থেকেও অবিদ্যাপ্রভাবে জীব আখ্যা লাভ করেন।

অনেকে বলেন, কর্ম-মীমাংসা-নির্দিষ্ট যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান এই প্রস্তুতির অঙ্গ। শঙ্কর একথা বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, যাগযজ্ঞ কর্ম উপাস্য ও উপাসকের ভেদবুদ্ধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ভেদবুদ্ধি অজ্ঞানজন্যই হয়ে থাকে। আসলে ত কোন ভেদ নেই। সুতরাং যে যাগযজ্ঞ অজ্ঞানজন্য ভেদবুদ্ধি ভিত্তিক সেই যাগযজ্ঞ কখনই সম্যক জ্ঞানলাভের সহায়ক হতে পারেনা।[১] তা ছাড়া, যাগযজ্ঞের ফল অভ্যুদয় বা স্বর্গলাভ। এই ফল ক্ষণস্থায়ী মাত্র। মুক্তি নিত্য-সিদ্ধ-স্বভাব। সুতরাং কর্মকাণ্ড এই স্বভাব উপলব্ধির পক্ষে সাক্ষাৎভাবে প্রয়োজনীয় নয়। শঙ্করের মতে আত্যন্তিক জ্ঞানলাভের জন্য চতুর্বিধ অভ্যাস অর্জন করা উচিত। নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক, ইহামুত্রার্থ ফলভোগ-বিরাগ, সমদমাদি সাধনসম্পদ, মুমুক্ষুত্ব—এই চতুর্বিধ অভ্যাস। নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর পার্থক্য করা, এই জগৎ ও পরজগতের সর্বকর্মফল ত্যাগ, ইন্দ্রিয়-সংযম এবং সন্তোষ প্রভৃতি সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা এবং সর্বশেষে মুক্তির জন্য ঐকান্তিকতা আত্যন্তিক জ্ঞানলাভের প্রস্তুতিপর্ব সূচনা করে।

শঙ্কর মতে কর্ম মীমাংসার সঙ্গে উত্তর মীমাংসার সম্পর্ক ও জ্ঞানলাভের প্রস্তুতি পর্ব।

এইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে মুমুক্ষু ব্রহ্মজ্ঞের কাছে গিয়ে শ্রবণ করবেন উপনিষদের বাণী 'তত্ত্বমসি'। শুনে এই ব্যাপারের অসম্ভাবনা দূর করবেন এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবেন যুক্তি বা মনন করে এবং শেষে এই তত্ত্বে গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়ে ধ্যানমগ্ন হবেন বা নিদিধ্যাসন করবেন। ক্রমশঃ জ্ঞানের আলোতে তাঁর অজ্ঞান অপসৃত হবে এবং তিনি উপলব্ধি করবেন 'সোঽহম্' (আমিই সেই আত্মা বা ব্রহ্ম)। আকাশে মেঘ কেটে গেলে সূর্যের প্রকাশ যেমন অবারিত হয়, অজ্ঞান অপসৃত হলে আত্মচৈতন্য তেমনি ভাস্বর হয়ে ওঠে। এই মুক্তি কোন সাধ্য বা লভ্য জিনিস নয়। মুক্তি নিত্য সিদ্ধ। জীব নিত্যই স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ আত্মা। শুধু ভ্রান্তির জন্য জীব একথা বিস্মৃত হয়। মুক্তি বিস্মৃতি-বিদূরণ, নতুন কিছু প্রাপ্তি নয়। সেইজন্যই শঙ্কর-দর্শনে মুক্তির উপলব্ধিকে প্রাপ্তপ্রাপ্তি বলে। মুক্তি জীবের নিত্যপ্রাপ্ত স্বরূপ। বিস্মৃতি অপসারণের পর এই প্রাপ্ত জিনিসেরই পুনর্প্রাপ্তি হয়। আমরা যেমন কখনও কাঁধে গামছা রেখে বাড়ীময় খুঁজে বেড়াই এবং কেউ গামছার অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত করে দিলে নতুন কিছু পেয়েছি বলে মনে করি না, তেমনি আমরা যে নিত্যই মুক্ত তা বিস্মৃত হয়েছি এবং ব্রহ্মজ্ঞ যখন এ বিষয়ে আমাদের অবহিত করেন, তখন নতুন কিছু পেলাম বলে মনে করতে পারি না।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-এর তাৎপর্য।

মুক্ত হলেও জীবের দেহ থাকতে পারে। কিন্তু সে যে দেহের সঙ্গে অভিন্ন, এই বোধ আর তাঁর থাকে না। জগৎ তখনও তাঁর কাছে দৃশ্য হতে পারে, কিন্তু তিনি তখন জগতের ভোজবাজিতে বিভ্রান্ত হন না। জাগতিক বস্তুর প্রতি কোন আকর্ষণ তিনি উপলব্ধি করেন না।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তি দুইই সম্ভব।

১। বেদান্ত সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য ১।১।১, ১।১।৪

এই অবস্থায় তিনি জগতে থেকেও জগতের নন। এই অবস্থাকে জীবন্মুক্তি বলে।[১] বৌদ্ধ, সাংখ্য, জৈন প্রভৃতি দার্শনিকদের মত শঙ্করও বলেন, পরিপূর্ণতা বা মুক্তি এই জীবনেই লাভ করা সম্ভব। মুক্তি জীবাত্মার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থান বোঝায় বলে পরিপূর্ণ আনন্দের অবস্থা সূচনা করে।

এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—দেহ যদি অজ্ঞানজন্য হয়, তবে মুক্তিতে অজ্ঞান নষ্ট হলেও দেহ থাকবে কেন? এই প্রসঙ্গে শঙ্করপন্থীরা বলেন, মানুষের কর্ম ত্রিবিধ—প্রারব্ধ, সঞ্চিত এবং সঞ্চীয়মান। কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। যে কর্ম ফল দিতে শুরু করেছে তা প্রারব্ধ কর্ম, যে কর্মফল গচ্ছিত আছে তা সঞ্চিত কর্ম এবং যে কর্ম এখন করা হচ্ছে তা সঞ্চীয়মান কর্ম। জ্ঞান সঞ্চিত এবং সঞ্চীয়মান কর্মফল নষ্ট করতে পারে, কিন্তু যে প্রারব্ধ কর্মফল দিতে শুরু করেছে তাকে রোধ করবে কে? দেহ প্রারব্ধ কর্মের ফল। একটি চক্র আবর্তিত করলে এমনিতেই এক সময় তার গতিরুদ্ধ হয়। তেমনি প্রারব্ধ কর্মফল নিঃশেষিত হলে এমনিতেই দেহ বিনষ্ট হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত মুক্তি হলেও দেহ থাকে। দেহের বিনষ্টি হলে বিদেহ মুক্তিলাভ হয়।

মুক্তিতে অজ্ঞান নষ্ট হলেও দেহ থাকার কারণ।

জীব মুক্ত হয়েও কর্মফল-বাসনা ত্যাগ করে কাজ করতে পারে এবং তাতে তাঁর বন্ধনের আশঙ্কা থাকে না। শঙ্কর গীতা অনুসরণ করে বলেন, সকাম কর্মই বন্ধনের হেতু, নিষ্কাম কর্ম বা কর্মসন্ন্যাস বা বৈরাগ্য মানুষকে কখনই বদ্ধ করে না। যে ব্যক্তি আত্যন্তিক জ্ঞান লাভ করেননি তাঁর পক্ষে নিষ্কাম কর্ম আত্মশুদ্ধির সহায়ক এবং যিনি জ্ঞান লাভ করে মুক্ত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে নিষ্কাম কর্ম যাঁরা এখনও মুক্ত হননি তাঁদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন।[২]

কর্মসন্ন্যাসের প্রকৃতি।

মুক্ত জীব সমাজের আদর্শ স্বরূপ এবং তাঁর কার্যাবলী সর্বসাধারণের অনুকরণযোগ্য। সাধারণ লোক যাতে বিপথগামী হয়, এমন কাজ করা মুক্ত জীবের পক্ষে একান্ত অনুচিত।[৩] শঙ্করের মতে সমাজসেবা মুক্ত জীবের পক্ষে বর্জনীয় নয়, কর্তব্য। শঙ্কর নিজের জীবনে এই আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন। সেইজন্যই তিনি বৌদ্ধধর্মের প্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলেন হিন্দুধর্মকে, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিভিন্ন মঠ। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ[৪] এবং বালগঙ্গাধর তিলকের[৫] মত অদ্বৈত অনুসরণকারীরাও মুক্ত জীবের সমাজ সেবার ওপর জোর দিয়েছেন।

মুক্তজীবের কর্ম

১। শঙ্করের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ১।১।৪, শঙ্করের কঠ উপনিষদের ভাষ্য ৬।১৪

২। শঙ্করের গীতাভাষ্য ৪।৪, ৩।২০-২৬।

৩। পূর্ববৎ

৪। Practical Vedanta

৫। গীতা রহস্য

মুক্ত জীব শঙ্করের মতে ব্রহ্ম স্বরূপ। উপনিষদে 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তিনি ব্রহ্মই হয়েছেন) সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। সুতরাং এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তা ছাড়া, জীব ত স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ আত্মা, ব্রহ্মও তাই। সুতরাং জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। জীব-স্বরূপ-জ্ঞানই মুক্তি বলে মুক্তিতে জীব-ব্রহ্মৈক্য উপলব্ধিই স্বাভাবিক।

মুক্তিতে জীব-ব্রহ্মৈক্য উপলব্ধি হয়।

অনেক সমালোচক বলেন, অদ্বৈতদর্শনে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য হওয়ায় এবং সমস্ত ভেদ মিথ্যা বলে ন্যায়-অন্যায়ের ভেদও মিথ্যা হবে। এই মতবাদ সমাজের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। উত্তরে বলা যায়, শঙ্কর ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ভেদ ত অস্বীকার করেন নি। আত্যন্তিক জ্ঞান লাভ করে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জীব ব্যবহারিক দৃষ্টিকেই সত্য বলে জানে এবং এই অবস্থায় তাঁর কাছে ন্যায়-অন্যায়ের ভেদ সুস্পষ্টভাবেই বর্তমান। মুক্ত জীবের কাছে ন্যায়-অন্যায়ের ভেদ নেই। তাঁর কাছে ত জগতও নেই। সুতরাং তাঁর ন্যায়-অন্যায়-ভেদবুদ্ধি না থাকলে জগতের লোকের ক্ষতি কি? অবশ্য তিনি কখনই দুষ্কর্ম করতে পারেন না, কারণ সকাম কর্ম তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ।[১]

অদ্বৈত দর্শনে নীতির স্থান।

শঙ্কর ও বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্মের গ্রাস থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করাই ছিল শঙ্করাচার্যের জীবনব্রত। হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই একথা স্বীকার করেন। বৌদ্ধদার্শনিকেরা বলেছেন, পূর্বমীমাংসা দর্শনের ভাষ্যকার কুমারিল ভট্ট এবং অদ্বৈতবাদী শঙ্করই ছিলেন বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের প্রধান শত্রু। শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে অদ্বৈতমত প্রতিপাদনের জন্য এই মতবিরোধী সমস্ত মতই খণ্ডন করেছেন। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধমত খণ্ডনও উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধধর্মের গ্রাস থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করাই ছিল শঙ্করের জীবনব্রত। শঙ্কর বৌদ্ধমত খণ্ডন করেছেন।

অনেক সমালোচক বলেন, শঙ্কর বৌদ্ধচিন্তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। পদ্মপুরাণে[২] মায়াবাদকে অসৎশাস্ত্র এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলে অভিযোগ করা হয়েছে। বৌদ্ধেরাও অদ্বৈতমতের সঙ্গে বিজ্ঞানবাদী এবং শূন্যবাদী বৌদ্ধমতের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এবং ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া অদ্বৈতমতকে বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের সংমিশ্রণ বলে উল্লেখ করেছেন। শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্ম না-কি শূন্যবাদীদের শূন্যের অনুরূপ। শঙ্কর অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠার জন্য বৌদ্ধ-আলোচনা-শৈলী ব্যবহার করেছিলেন। শঙ্করের গুরুদেব গৌড়পাদ তাঁর মাণ্ডুক্য কারিকায় বৌদ্ধদের ব্যবহৃত অনেক শব্দ ও উপমা ব্যবহার করেছেন।

অনেকে বলেন, শঙ্কর প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ এবং তাঁর মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ।

১। এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা ডঃ রাধাকৃষ্ণন লিখিত 'Indian Philosophy' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ৬১২-৩৪ পৃষ্ঠায় এবং ডঃ অনিলকুমার রায়চৌধুরী লিখিত 'The Doctrine of Maya' গ্রন্থের 'Ethics of the Vedanta' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২। মায়াবাদম্ অসচ্ছাস্ত্রম্ প্রচ্ছন্নম্ বৌদ্ধমেব চ।

বৌদ্ধমতের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্যও তাঁর বক্তব্যে লক্ষ্য করা যায়। এই বৌদ্ধ প্রভাবিত গুরুর শিষ্য শঙ্করের পক্ষেও বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত হওয়া স্বাভাবিক।

আমাদের মনে হয়, শঙ্করের মতবাদ উপনিষদ এবং ব্রহ্মসূত্র থেকেই গৃহীত। বৌদ্ধ প্রভাব থেকে এর উৎপত্তি দেখান আমাদের মতে আতিশয্য দেখান ছাড়া কিছু নয়।

শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ এবং মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ, এমত খণ্ডন।

শঙ্করের মতবাদ এবং বৌদ্ধ মতবাদ উভয়ই উপনিষদ থেকে নিঃসৃত, একথা বিস্মৃত হলে চলবে না। সেইজন্য এদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু তা অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত, একথা প্রমাণ করে না। বৌদ্ধদের সঙ্গে আলোচনাকালে বৌদ্ধদের বিচারশৈলী শঙ্করের পক্ষে গ্রহণ করা অস্বাভাবিক কি? প্রতিপক্ষের অস্ত্র দিয়েই যদি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়, তবে তার চেয়ে বাহাদুরী আর কি আছে? শঙ্কর বৌদ্ধদের জন্যই তাঁদের বিচার-শৈলী গ্রহণ করেছিলেন। শূন্যবাদীদের শূন্য কখনই অদ্বৈতবেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম হতে পারে না।

শঙ্করের ব্রহ্ম নির্গুণ হলেও শূন্য নয়।

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ হলেও শূন্য নয়, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। পূর্ণ ব্রহ্ম শূন্য হতে যাবে কেন? সুতরাং যাঁরা, শাঙ্করমত বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত বলে মনে করেন, তাঁরা খুব সঙ্গত কথা বলেন বলে মনে করি না।[১]

মন্তব্য

শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মত সুসংগত অদ্বৈতবাদ পৃথিবীর দর্শনের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই।

উপনিষদে সমস্ত অস্তিত্বের মূলীভূত ঐক্যের যে আভাস দেওয়া হয়েছে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ তারই দার্শনিক বিবৃতি। পৃথিবীর দর্শনের ইতিহাসে এমন সুসংগত অদ্বৈতমত আর দ্বিতীয় নেই। উইলিয়ম জেম্‌স্ সত্যিই বলেছেন, "The paragon of all monistic systems is the Vedanta philosophy of Hindostan".[২] জগৎ, জীব প্রভৃতি সবই এক আত্মতত্ত্ব দিয়ে এই দর্শনে ব্যাখ্যাত হয়েছে। চিন্তার বলিষ্ঠতায়, যুক্তির নিরন্ধ্র সন্নিবেশে, মানুষের মহত্ত্ব কল্পনায় এই অদ্বৈতদর্শন পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। সাধারণলোক হৃদয়দৌর্বল্যের জন্য এই মতবাদের সমস্ত কথা বুঝতে পারে না, গ্রহণ করতে দ্বিধা করে, কিন্তু যুক্তিবাদী মন এই দর্শনের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলতে পারে না। অদ্বৈতবাদ আমাদের জীবনে দৃঢ়তা আনে, চিত্ত উন্নত করে এবং সংস্কৃতিতে সুষমা সংযোগ করে। বাইরের জগতে ভারতীয় দর্শনের পরিচয় ত অদ্বৈতবাদরূপেই। স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি প্রখ্যাত অদ্বৈতপ্রচারকেরা এই মতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছেন এবং আমাদের জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণ করেছেন।

১। এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা ডঃ অনিলকুমার রায়চৌধুরী লিখিত 'The Doctrine of Maya' গ্রন্থের 'Is Samkara a crypto-Buddhist?' এই শিরোনামায় পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে বলা ভালো যে, বসুবন্ধু 'বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা সিদ্ধি' গ্রন্থে ৩০নং কারিকায় বলেছেন, 'স এবানস্রবো ধাতুরচিন্ত্যঃ কুশলো ধ্রুবঃ। সুখো বিমুক্তকায়োঽসৌ ধর্মাখ্যোঽয়ং মহামুনেঃ॥ ধ্রুব সুখস্বরূপ বিশুদ্ধবিজ্ঞান অদ্বৈতবাদীদের চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

২। James: Pragmatism ১৫১ পৃষ্ঠা।

খ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

ভূমিকা

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ রামানুজের নামের সঙ্গে সংযুক্ত। দর্শনের পরব্রহ্মবাদ এবং ধার্মিকের ঈশ্বরবাদ সমন্বিত করাই এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য। রামানুজের মতে দার্শনিকের চরম তত্ত্বই ভক্তের ভগবান। ভাগবতের ঈশ্বরবাদ এবং উপনিষদের সপ্রপঞ্চমত বা ব্রহ্ম-পরিণামবাদ[১] একত্রিত করে এই মতের প্রতিষ্ঠা। এই দর্শনের ভক্তিবাদ মুখ্যতঃ ভাগবতভিত্তিক। অবশ্য এই জাতীয় চিন্তা রামানুজ-দর্শনেই প্রথম প্রকাশিত হয়নি। ভগবদ্গীতা, মহাভারতের নারায়ণীয় অধ্যায় এবং বিষ্ণুপুরাণে এই চিন্তার আভাস পাওয়া যায়।

দর্শনের পরব্রহ্মবাদ এবং ধার্মিকের ঈশ্বরবাদ সমন্বিত করে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা।

এই মতবাদের উৎস দ্বিবিধ। একদিকে বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, ভগবদ্গীতা, পুরাণ প্রভৃতি; অন্যদিকে তামিল ভাষায় লিখিত দক্ষিণ ভারতের সাহিত্য। এইজন্যই রামানুজ-দর্শনের নাম উভয় বেদান্ত। বিশিষ্টাদ্বৈতমতের রামানুজ-পূর্ব প্রবক্তাদের মধ্যে নাথমুনির (১০০০ খ্রীষ্টাব্দ) নাম সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। তাঁর সমস্ত গ্রন্থই লুপ্ত হয়ে গেছে। নাথমুনির পৌত্র আলবান্দার বা যামুনাচার্য (১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ) বিশিষ্টাদ্বৈতমত অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে প্রচার করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে আগম প্রামাণ্য, মহাপুরুষ-নির্ণয়, গীতার্থ সংগ্রহ, সিদ্ধিত্রয়ই সর্বাধিক প্রচলিত। শ্রীস্তুতি এবং বিষ্ণুস্তুতি নামে তাঁর দুটি স্তোত্রগ্রন্থও আছে। সর্বত্রই তিনি শিব অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। রামানুজ বা যতিরাজ যামুনাচার্যের শিষ্যের শিষ্য বলে কথিত। তিনি ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত ভগবদ্গীতার একটি ভাষ্য আছে। বেদার্থ সংগ্রহও তিনিই রচনা করেছিলেন। এই সমস্ত গ্রন্থেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হয়েছে। বেদান্তসার, বেদান্তদীপ, নিত্যগ্রন্থ প্রভৃতি আরও কয়েকটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। রামানুজের পরবর্তী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মধ্যে সুদর্শন সুরীর (১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ) নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি রামানুজের শ্রীভাষ্য বেদার্থ সংগ্রহ-এর টীকা রচনা করেছিলেন। এঁর পরই বেঙ্কটনাথ বা বেদান্তদেশিক (১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ)-এর আবির্ভাব। তিনিই রামানুজ দর্শনকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। একদিকে তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের চেয়ে অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে অদ্বৈতমত খণ্ডন করেছিলেন, অন্যদিকে বিশিষ্টাদ্বৈতমত সুসমঞ্জস ও সুসঙ্গত করে প্রচার করেছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠার দিক থেকে রামানুজের পরেই তাঁর স্থান। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে শ্রীভাষ্যের অসম্পূর্ণ টীকা তত্ত্বটীকা, রামানুজের গীতাভাষ্যের টীকা তাৎপর্যচন্দ্রিকা, ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন,

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রধান প্রধান গ্রন্থ।

১। শ্রীভাষ্য ১।৪।২৭

তত্ত্বমুক্তাকলাপ এবং এদের ওপর নিজেরই টীকা সর্বার্থ-সিদ্ধি এবং শতদূষণী সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। শ্রীনিবাসাচার্য (১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিত যতীন্দ্র-মত-দীপিকা বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনের একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়গ্রন্থ।

১। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে প্রমা, প্রমাণ ও প্রমেয়

অন্যান্য দার্শনিকদের মতই রামানুজ মনে করেন, জ্ঞান হতে গেলেই জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয় আবশ্যক। তিনি আরও বলেন, সমস্ত জ্ঞানই বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান, নির্বিশেষ বস্তুর কোন জ্ঞান হয় না। রামানুজের এ কথা অনেক দার্শনিকই মানেন না। রামানুজ নির্বিকল্পক এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষের পার্থক্য স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি বলেন, নির্বিকল্পক এবং সবিকল্পক উভয় প্রত্যক্ষেরই বিষয় বিশিষ্ট বস্তু। তবে কোন বিশিষ্ট বস্তু যখন আমরা প্রথম গ্রহণ করি (প্রথম পিণ্ডগ্রহণবৎ) এবং এই বস্তুর কোন পূর্ববর্তী সংস্কার থাকে না, তখন নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়। যখন একটি শিশু প্রথম গরু দেখে, তখন সে তা কোন না কোন বিশেষণে বিশেষিত অবস্থায়ই দেখে। এই দেখা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। পরে যখন সে পুনরায় গরু দেখে তখন এই দেখা পূর্বের দেখার সংস্কার-সংযুক্ত হয়, এইভাবে পুরাতনের আলোকে নতুনকে জানাই রামানুজ মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। 'এইটি একটি গরু' এই বাক্য রামানুজ-সম্মত নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রকাশ করে এবং 'এইটিও একটি গরু' এই বাক্য প্রকাশ করে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। ন্যায় বৈশেষিক মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বাক্যাকারে প্রকাশ করা যায় না, রামানুজ মতে যায়। শঙ্করমতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে কোন বিশিষ্ট বস্তু প্রকাশিত হয় না; যে জ্ঞান বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধবিষয়ক নয় তা-ই নির্বিকল্পক জ্ঞান। এইক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, শঙ্কর এবং রামানুজের নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের ধারণার এই পার্থক্য থেকেই তাঁদের ব্রহ্ম বা আত্যন্তিক সত্তা সম্বন্ধে ধারণায় পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। রামানুজমতে নির্বিশেষ বস্তুর জ্ঞানই হয়না বলে চরম সত্তা বা ব্রহ্ম নির্বিশেষ হতে পারে না, তিনি বিশিষ্ট। শঙ্কর মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অবিশিষ্ট সত্তা প্রকাশ করে, সমস্ত বিকল্পই মিথ্যা। সুতরাং চরম সত্তা ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও নির্গুণ।

শঙ্কর ও রামানুজ মতে নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যার পার্থক্য।

এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে—রামানুজ যদি সবিকল্পক প্রত্যক্ষের এইরূপ ব্যাখ্যা দেন, তবে তাঁর মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যভিজ্ঞার পার্থক্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, প্রত্যভিজ্ঞার ক্ষেত্রে একই বস্তু (যেমন গরু) অতীতে এবং বর্তমানে দুবার প্রত্যক্ষ হয় এবং তখন আমরা বলি 'এই সেই গরু'। কিন্তু সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বেলায়, একই জাতীয় দুটি ভিন্ন বস্তু প্রত্যক্ষ হয় এবং আমরা বলি 'এইটিও একটি গরু।' সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বেলায় প্রত্যক্ষের বিষয়ের দেশ-কালের পার্থক্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য করা হয় না, কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞার ক্ষেত্রে

রামানুজ মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের সঙ্গ প্রত্যভিজ্ঞার পার্থক্য।

প্রত্যক্ষের বিষয়ের দেশ-কালের পার্থক্য বিবেচনা করা হয়। কারণ, প্রত্যভিজ্ঞার ক্ষেত্রে একই বস্তু দুবার ভিন্ন স্থানে এবং সময়ে প্রত্যক্ষ করা হয়।

রামানুজ মতে জ্ঞানের প্রকৃতি জানতে হলে রামানুজ সত্তার যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তা জানা দরকার। চেতন এবং জড় ছাড়াও তিনি আর একপ্রকার সত্তার কথা বলেছেন, যা অজড়, কিন্তু চেতন নয়। জ্ঞান এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। জ্ঞান জড় নয়, কারণ অন্যের সাহায্য ছাড়া জ্ঞান নিজেকে এবং অন্য বস্তুকে প্রকাশিত করতে পারে, কিন্তু জড় তা পারে না। তবে জ্ঞান যা প্রকাশিত করে তা নিজের জন্য নয়, পরের জন্য। অর্থাৎ, জ্ঞান প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু জানতে পারে না। চৈতন্য জানতে পারে এবং নিজেকে ছাড়া অন্য কিছুই প্রকাশ করতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান চেতনও নয়। একটি দীপশিখার সঙ্গে জ্ঞানের তুলনা করা যেতে পারে। দীপশিখা যেমন ঘট প্রভৃতি বস্তু এবং নিজেকে প্রকাশিত করতে পারে, কিন্তু কিছুই জানতে পারে না এবং দীপশিখা যা প্রকাশ করে তা জানে মানুষেরা, তেমনি জ্ঞান প্রকাশ করে, কিন্তু জ্ঞান জানে না, জানেন জীব বা ঈশ্বর। রামানুজ মতে জ্ঞান জীব বা ঈশ্বরে গুণ বা ধর্ম রূপে বর্তমান। একে ধর্মভূতজ্ঞান বলে। রামানুজ বলেন, ধর্মভূতজ্ঞান ছাড়া আর একপ্রকার জ্ঞান আছে। এই জ্ঞানকে ধর্মীজ্ঞান বলা যায়। এই অর্থে জীব এবং ঈশ্বরই জ্ঞান। ধর্মীজ্ঞান এবং ধর্মভূতজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝান যেতে পারে। ধর্মীজ্ঞান যেন দীপশিখা এবং ধর্মভূতজ্ঞান যেন দীপশিখাগত কিরণমালা। কিরণমালা যেমন দীপশিখাতে থাকে, ধর্মভূতজ্ঞানও তেমনি ধর্মীজ্ঞানেই থাকে। দীপশিখা থেকেই যেমন কিরণমালা বহির্গত হয়ে বস্তু প্রকাশ করে, ধর্মভূতজ্ঞানও তেমনি ধর্মীজ্ঞান থেকেই বহির্গত হয়ে বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ করে। ধর্মভূতজ্ঞান সব সময়ই থাকে। সুষুপ্তি অবস্থাতেও এই জ্ঞান বর্তমান। তবে তখন বিষয় থাকে না বলে নিজেকে প্রকাশিত করে না। রামানুজ মতে জ্ঞান যখন বিষয় প্রকাশ করে তখন নিজেকেও প্রকাশ করে। ফলে, যখন আমরা বিষয় জানি তখনই জ্ঞান জানি এবং যখন বিষয় জানি না তখন জ্ঞানও জানি না। সুষুপ্তি অবস্থায় জীব তার অপ্রকাশিত ধর্মভূতজ্ঞান নিয়ে আত্ম-সচেতন হয়ে বর্তমান থাকে। স্বপ্নকালে স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয় থাকে। সুতরাং তখন ধর্মভূতজ্ঞান নিজেকেও প্রকাশিত করে, আবার বিষয়ও প্রকাশিত করে। ফলে, স্বপ্নে আমরা যেমন একপ্রকার বিষয় জানি, তেমনি জ্ঞানও জানি। কিন্তু জাগ্রত কালের চেয়ে স্বপ্নকালে ধর্মভূতজ্ঞানের প্রকাশ ক্ষমতা বেশী বাধা প্রাপ্ত হয় বলে স্বপ্নকালের বিষয় জাগ্রত কালের বিষয়ের মত স্পষ্ট হয় না। মোক্ষকালে জ্ঞানের সমস্ত বাধা অপসারিত হয়। সেজন্য মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ হন। জৈনদের কেবল জ্ঞানের সঙ্গে এই মতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

জ্ঞান জড়ও নয়, চেতনও নয়, তবে অজড়।

ধর্মীজ্ঞান এবং ধর্ম-ভূতজ্ঞানের পার্থক্য।

জ্ঞান কখনও শুধু মনের সাহায্যে আবার কখনও মনের সাহায্যে কোন ইন্দ্রিয় মাধ্যমে কার্যকরী হয়। রামানুজ বলেন, জ্ঞান-প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় জীব থেকে, তারপর

মনে পৌছায় এবং সর্বশেষে কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এইভাবে ইহা যখন বিষয়-সংযুক্ত হয় তখন ইহা বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হয় এবং জীবের নিকট নিজেকে প্রকাশিত করে। অদ্বৈতমতের অন্তঃকরণের সঙ্গে রামানুজ দর্শনের ধর্মভূতজ্ঞানের কিছু সাদৃশ্য আছে। অদ্বৈতমতের অন্তঃকরণ যেমন ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত হয়ে বিষয়াকারে আকারিত হয়, রামানুজ মতে ধর্মভূতজ্ঞানও তেমনি বিষয়াকারে আকারিত হয়। কিন্তু অদ্বৈতমতে অন্তঃকরণ জড় এবং তা স্বাক্ষীভাস্বর হলেই জ্ঞানপদবাচ্য হয়। কিন্তু রামানুজ মতে ধর্মভূতজ্ঞান নিজেই জ্ঞান।

অদ্বৈতমতের অন্তঃকরণের সঙ্গে রামানুজের ধর্মভূতজ্ঞানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।

ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, রামানুজমতে জ্ঞানের পূর্বেই জ্ঞানের বিষয় থাকে এবং বিষয় না থাকলে জ্ঞান হয় না। সুতরাং রামানুজমতে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতা বা জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়, জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তাসম্পন্ন। এইদিক থেকে রামানুজ বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী (Realist)। তিনি বলেন, যা-ই আমরা জানি তা-ই সৎ এবং আমাদের জ্ঞান সর্বদাই যথার্থ ;[1] বিষয় না থাকলে জ্ঞানই হতে পারে না। রামানুজের এই মত সংখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। **রামানুজ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী।** অর্থাৎ তিনি জ্ঞান স্বতঃই প্রমাণ বা যথার্থ বলে মনে করেন। এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—জ্ঞান যদি স্বতঃই প্রমাণ হয়, বিষয় ছাড়া যদি জ্ঞান হতেই না পারে, তবে আমাদের ভ্রান্ত জ্ঞান হয় কেন? কখনও কখনও রজ্জুকে আমরা ভুল করে সর্প বলে জানি কেন?

বিষয় ছাড়া জ্ঞান হয় না। সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ই সৎ। এই মতের নাম সংখ্যাতিবাদ।

রামানুজ এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তেজ, অপ, ও ক্ষিতি ভূতের সমাহারে যেমন রজ্জুর সৃষ্টি তেমনি সর্পেরও সৃষ্টি। সুতরাং সর্প ও রজ্জুর মধ্যে উপাদানগত সাদৃশ্য আছে। যখন আমরা রজ্জুকে সর্প বলে জানি তখন রজ্জু ও সর্প উভয়েতেই বর্তমান এই সাধারণ উপাদানই জানি, সর্প অংশের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় এবং এর যে অন্যদিকও আছে তা অস্বীকৃত হয়। সুতরাং ভ্রমের ক্ষেত্রে যা আছে (সৎ) তাই জানি, যা নাই (অসৎ) জানি না। অর্থাৎ ভ্রমও সংখ্যাতি।

ভ্রমের বিষয়ও সৎ কেন, এ বিষয়ে রামানুজের ব্যাখ্যা।

পাণ্ডুরোগী যখন শ্বেতশঙ্খকে পীত শঙ্খ বলে জানে তখন রামানুজমতে শঙ্খে সত্যই পীতত্ব থাকে। রামানুজ এই জ্ঞান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, পাণ্ডুরোগীর নয়ন-রশ্মি নয়ন থেকে যখন শঙ্খে পতিত হয় তখন তার নয়নগোলকের পীতত্বও শঙ্খে যায় এবং শঙ্খ বস্তুতঃই পীত হয়। সুতরাং পাণ্ডুরোগী যে পীতশঙ্খ দেখে সে শঙ্খ সৎ, অসৎ নয়। এখানে প্রশ্ন উঠবে—পীতশঙ্খে সত্যই যদি পীতত্ব জন্মে, তবে সকলেই শ্বেতশঙ্খকে পীতশঙ্খ রূপে জানে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে রামানুজ বলেন, সকলেই শঙ্খে পীতত্ব সঞ্চারের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে না, সেজন্যই

শ্বেতশঙ্খকে পীতশঙ্খ রূপে প্রত্যক্ষ করার সময় কিভাবে শঙ্খে পীতত্ব উৎপন্ন হয়, এ বিষয়ে রামানুজের ব্যাখ্যা।

১। যথার্থম্ সর্ব বিজ্ঞানম্ ইতি বেদ বিদাম্ মতম্—প্রকরণ পঞ্চিকা, ৩২ পৃঃ

জানেনা। বক্তব্য তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। ছোট পাখি যে পথে আকাশে চলে সে পথ ছোট পাখি জানে; কিন্তু সকলে ত জানেনা। তেমনি পাণ্ডুরোগীই শ্বেতশঙ্খে পীতত্ব জানে, অন্যে জানেনা।

রামানুজ মতে স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুর প্রকৃতি।

স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে রামানুজ বলেন, পরম পুরুষ জাগ্রত অভিজ্ঞতার বিষয়ের মতই স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয় সৃষ্টি করেন।[১] জীব যাতে কর্মানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করতে পারে তার জন্যই পরম পুরুষের এই সৃষ্টি।[২] তিনি আরও বলেন, স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু যে স্বপ্নকালে যথার্থভাবেই থাকে, বেদেও একথা ঘোষণা করা হয়েছে।[৩] সুতরাং বেদ-প্রামাণ্যের ভিত্তিতেও স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা প্রমাণ করা যায়।

এ সমস্ত ব্যাখ্যার মূল্য।

রামানুজের এই সমস্ত ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক মূল্য সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। তবে ভ্রমের বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যাখ্যা (Realistic explanation) দেবার জন্য রামানুজ যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, একথা সকলেই স্বীকার করবেন।

রামানুজ স্বতঃপ্রামাণ্য এবং পরতঃ অপ্রামাণ্যবাদী।

এখানে প্রশ্ন উঠবে—সত্য জ্ঞানের বিষয়ের মত ভ্রমের বিষয়ও যদি যথার্থই বিষয় হয়, তবে আমরা সত্য জ্ঞান বা প্রমা এবং ভ্রমে পার্থক্য করি কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে রামানুজ বলেন, প্রমা শুধু যথার্থ জ্ঞান নয়, ব্যবহারানুগুণও[৪] বটে। ভ্রমের বিষয়ের দ্বারা লোকব্যবহার হয় না বলেই ভ্রম প্রমা নয়। প্রমার বিষয়ের দ্বারা লোকব্যবহার হয়। ভ্রমে শুক্তিতে দৃষ্ট রজতের দ্বারা সমস্ত লোকের কোন ব্যবহার হতে পারে না, কিন্তু প্রমা ক্ষেত্রে জ্ঞাত শুক্তি ও রজতের দ্বারা লোকব্যবহার সিদ্ধ। সুতরাং লোক-ব্যবহারের অভাবের ভিত্তিতে জ্ঞানের অপ্রামাণ্য বা ভ্রমত্ব নির্ণয় করা যায়। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, রামানুজ-মতে জ্ঞানে স্বতঃই প্রামাণ্য, কিন্তু অপ্রামাণ্য পরতঃ বা অন্য-নির্ভর।

রামানুজ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন।

রামানুজ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে রামানুজের বক্তব্য আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। অনুমান সম্বন্ধে রামানুজের বক্তব্যে কোন নতুনত্ব নেই। শব্দ সম্পর্কে রামানুজ মুখ্যতঃ মীমাংসকদের বক্তব্য সমর্থন করেন। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় না এমন বিষয়ই শব্দপ্রমাণের সাহায্যে জানা যায়। অন্যান্য বেদান্তীদের মত রামানুজও বেদের অর্থবাদমূলক বাক্য এবং বিধি বাক্য উভয়েরই তাৎপর্য স্বীকার করেন। শঙ্করের সঙ্গে এই বিষয়ে রামানুজের মতের মিল লক্ষণীয়।

কিন্তু শব্দ প্রমাণ সম্পর্কে অন্যান্য কতকগুলো বিষয়ে শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে মতভেদ আছে। এখানে আমরা মতপার্থক্যের প্রধান দুটি মাত্র বিষয় আলোচনা

১। শ্রীভাষ্য ৩।২।৩
২। শ্রীভাষ্য ৩।২।৫
৩। বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪।৩।১০
৪। যতীন্দ্রমতদীপিকা ৩ পৃঃ

করবো। আমরা জানি, বেদের দুই ভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। প্রত্যেক বেদান্তীই এই দুইভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। শঙ্করাচার্য বলেছেন, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড দুই শ্রেণীর অধিকারই পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট। যে পুরুষ এখনও অবিদ্যায় আচ্ছন্ন তিনিই কর্মকাণ্ডের অধিকারী। যে পুরুষ অবিদ্যা অতিক্রম করার সাধনা করেন জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার তাঁরই। রামানুজ এমত গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড একই অধিকারীর জন্য নির্দিষ্ট এবং এদের মধ্যে কোন বিরোধিতাই নেই। রামানুজ-মতে জ্ঞানকাণ্ড ঈশ্বরের প্রকৃতি নিয়ে এবং কর্মকাণ্ড ঈশ্বরের উপাসনার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে।[১] সুতরাং কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড পরস্পর পরিপূরক। রামানুজ আরও বলেন, কর্মকাণ্ডে আদিষ্ট বিভিন্ন কর্ম ঈশ্বরের কৃপালাভের জন্যই করা উচিত, কর্মফলের জন্য নয়। রামানুজের এই মত শঙ্কর এবং মীমাংসা উভয় মত-বিরোধী। শঙ্কর জ্ঞানকাণ্ড উন্নত অধিকারী এবং কর্মকাণ্ড অনুন্নত অধিকারীর জন্য নির্দিষ্ট বলে মনে করেন। মীমাংসকেরা জ্ঞানকাণ্ডকে বেদের প্রধান অংশ বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে কর্মকাণ্ডই বেদের প্রধান অংশ। রামানুজ বেদ ছাড়াও পঞ্চরাত্রাগমকে শব্দ প্রমাণের অন্তর্গত করেন, শঙ্কর তা করেন না। শব্দপ্রমাণ প্রসঙ্গে শঙ্করের সঙ্গে রামানুজের এই দ্বিতীয় পার্থক্য। এইক্ষেত্রে লক্ষণীয়, পঞ্চরাত্রাগমে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে। রামানুজও বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন এবং তিনি বৈষ্ণব।

শব্দ প্রমাণ সম্পর্কে শঙ্কর ও রামানুজ মতের পার্থক্য।

২। ব্রহ্ম সম্বন্ধে রামানুজের ধারণা

রামানুজ বলেন, ব্রহ্মই চরম সত্য ও সত্তা; চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের দুটি অবিচ্ছিন্ন অংশ।[২] ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা, কারণ ব্রহ্ম অতিরিক্ত বা ব্রহ্ম ভিন্ন কোন সত্তা নেই। ব্রহ্মের অচিৎ অংশই বিশ্বের বিভিন্ন জড়বস্তুরূপে পরিণত হয়েছে, বিভিন্ন জীবাত্মা ব্রহ্মেরই চিৎ অংশ। সুতরাং সবকিছুই ব্রহ্মেই বিধৃত। এক ব্রহ্ম বহুকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে রামানুজের এই মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। এই মত অনুসারে ব্রহ্মের অদ্বৈত চিৎ ও অচিৎ অংশ বিশিষ্ট, ইহা নির্বিশেষ অদ্বৈত নয়। এই প্রসঙ্গে বলা ভাল, রামানুজের মতে নির্বিশেষ বস্তু বলে কিছু জানাই যায় না। তিনি বলেন, তথাকথিত নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে যে বিষয় পাওয়া যায় তা বিশিষ্ট বস্তু। সবিকল্পক এবং নির্বিকল্পক উভয় প্রকার প্রত্যক্ষের বিষয়ই বিশিষ্ট। এদের তফাৎ এই যে, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে বিশিষ্ট বস্তু প্রথম জ্ঞাত হয়, এইক্ষেত্রে এই বস্তুর কোন পূর্বসংস্কার কার্যকরী হয় না, কিন্তু সবিকল্পক প্রত্যক্ষে

রামানুজ মতে ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ-এর বিশিষ্ট ঐক্য প্রকাশ করে।

১। যতীন্দ্র-মত-দীপিকা ২৭ পৃ:

২। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ১।৯ এবং ১।১২ রামানুজমত সমর্থন করে বলে তিনি দাবী করেন।

যখন বিশিষ্ট বস্তু জ্ঞাত হয়, তখন এই বস্তুর পূর্বসংস্কার কার্যকরী হয়ে থাকে। শঙ্কর প্রভৃতি কোন কোন দার্শনিক নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে নির্বিশেষ বস্তু জানা যায় বলে যে ঘোষণা করেছেন তা অযৌক্তিক, অযথার্থ। সুতরাং নির্গুণ বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলে কিছু থাকতে পারে না, সগুণ বা বিশিষ্ট ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ও সম্ভব।[১] রামানুজ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে অন্যান্য প্রমাণ এদের দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা এবিষয় পূর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

রামানুজ ব্রহ্মের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ স্বীকার করেন না। তবে স্বগতভেদ স্বীকার করেন।

রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম কোন অভেদতত্ত্ব নয়; ব্রহ্মের সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ না থাকলেও স্বগতভেদ আছে। একই জাতির অন্তর্গত দুটি ব্যক্তির যে ভেদ, তাকে বলে সজাতীয় ভেদ, যেমন একটি গরুর সঙ্গে অন্য আর একটি গরুর তফাৎ। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বলে তাঁর সজাতীয় ভেদ থাকতে পারে না। দুটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির যে ভেদ তার নাম বিজাতীয় ভেদ। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু না থাকায় ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ সম্ভব নয়। একটি জিনিস বা ব্যক্তির বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গের যে ভেদ, তাকে বলে স্বগতভেদ। আমাদের হাত, পা প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গের ভেদ এই জাতীয়। ব্রহ্মের চিৎ ও অচিৎ অংশের মধ্যে ভেদ বর্তমান। চিৎ-এর মধ্যেও বিভিন্ন জীবের ভেদ বর্তমান। সুতরাং ব্রহ্ম স্বগতভেদযুক্ত। ব্রহ্মের সঙ্গে চিৎ ও অচিৎ অংশের সম্পর্ককে রামানুজ অপৃথকসিদ্ধি নামে অভিহিত করেছেন। রামানুজের অপৃথকসিদ্ধি সম্পর্ক অনেকটা নৈয়ায়িকদের সমবায় সম্পর্কের মত। দ্রব্য ও গুণের সম্পর্ককে নৈয়ায়িকেরা সমবায় সম্পর্ক বলেছেন, রামানুজ তার নাম দিয়েছেন অপৃথকসিদ্ধি সম্পর্ক। তবে এই দুই মতের পার্থক্য এই যে, সমবায় সম্পর্কে দুটি সম্বন্ধীর একটি আর একটি ছাড়া থাকতে পারে কিন্তু অপৃর্থকসিদ্ধি সম্পর্কে কেউ কাউকে ছাড়া থাকতে পারে না।

রামানুজের ব্রহ্ম অশেষ কল্যাণগুণের আকর এবং নিখিল দোষমুক্ত পুরুষোত্তম বাসুদেব।

রামানুজের মতে ব্রহ্ম অশেষ কল্যাণগুণের আকর পুরুষোত্তম বাসুদেব। উপনিষদে ব্রহ্মকে যখন নির্গুণ বলা হয়, তখন তাঁর কোন হেয় গুণ বা দোষ নেই, একথাই বোঝান হয়ে থাকে।[২] আসলে ব্রহ্মে নিখিল দোষ নিরস্ত বা নিষিদ্ধ হয়েছে। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এই জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক। প্রলয়কালে জগৎ ধ্বংস হয়ে গেলেও অব্যক্তরূপে জড় ও আত্মা ঈশ্বরের অংশরূপে অবস্থান করে। ঈশ্বরের চিৎ ও অচিৎ অংশ নিত্য। সুতরাং এদের কখনই ধ্বংস হতে পারে না। চিৎ ও অচিৎ অংশ অব্যক্তরূপে যখন ঈশ্বরে অবস্থান করে, তখন ব্রহ্মকে কারণ ব্রহ্ম বলা হয়। জগৎ সৃষ্টিকালে ঈশ্বরের অচিৎ অংশ জড়জগতে পরিণত হয় এবং চিৎ অংশ জীবাত্মা রূপে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মের এই ব্যাকৃতরূপকে কার্যব্রহ্ম বলে। উপনিষদের যে সমস্ত বাক্য বস্তু বৈচিত্র্য অস্বীকার করে এবং ব্রহ্মকে বচন-মনের-অতীত বলে বর্ণনা করে, তারা ব্রহ্মের অব্যক্তরূপের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে।[৩]

১। শ্রীভাষ্য ৭০-৭৫ পৃষ্ঠা ২। শ্রীভাষ্য ১০৩ পৃষ্ঠা ১।১।১ ৩। শ্রীভাষ্য ১।১।১, ১।১।২, ২।১।১৫

এইক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে—চিৎ এবং অচিৎ যদি ব্রহ্মের অংশ হয় এবং অচিৎ অংশ যদি জগতে রূপান্তরিত হয়, তবে ব্রহ্মও কি পরিণামী হয়ে পড়েন না? জগতের সমস্ত অসম্পূর্ণতা কি ব্রহ্মেরই অংশ হয়ে উঠবে না? এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে রামানুজ অংশ-অংশীর উপমা ব্যবহার না করে অন্য উপমা ব্যবহার করেন। কখনও বলেন, ব্রহ্ম আত্মা এবং চিৎ[1], অচিৎ তাঁর দেহ; আবার কখনও বলেন, ব্রহ্ম রাজা এবং চিৎ ও অচিৎ তাঁর প্রজা। আত্মা যেমন দেহ নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ নিয়ন্ত্রণ করে। ব্রহ্ম বিশ্বের অন্তর্যামী নিয়ামক পুরুষ। আত্মা যেমন দেহের পরিবর্তন এবং অপূর্ণতা বা পঙ্গুতার জন্য পরিবর্তিত এবং অপূর্ণ বা পঙ্গু বলে অভিহিত হয় না, ব্রহ্মও তেমনি অচিৎ-এর জগতে পরিণতির জন্য এবং জগতের অপূর্ণতার জন্য পরিণামী বা অপূর্ণ আখ্যাত হতে পারেন না। প্রজার সুখ, দুঃখ, ব্যর্থতা, হতাশা, অপূর্ণতা, পরিণতি প্রভৃতি যেমন রাজার সুখ, দুঃখ, ব্যর্থতা, হতাশা, অপূর্ণতা, পরিণতি প্রভৃতি বোঝায় না, তেমনই অচিৎ-এর জগতে পরিণতি ঈশ্বরকে পরিণামী করে তোলে না[2]।

রামানুজের মতে ব্রহ্মের অচিৎ অংশ জগতে পরিণত হয়। তবে কি ব্রহ্ম পরিণামী? এ বিষয়ে রামানুজের বক্তব্য।

ওপরে চিৎ ও অচিৎ-এর সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক প্রকাশের জন্য রামনুজপ্রচারিত বিভিন্ন উপমার আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, চিৎ ও অচিৎ-এর সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক কি অংশ-অংশীর সম্পর্ক, না দেহ ও আত্মার সম্পর্ক, প্রজা ও রাজার সম্পর্ক না সবই এক সঙ্গে, এ বিষয়ে রামানুজ নিশ্চিত করে কিছু বলেন নি। যখন যে উপমা ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে, তিনি তখনই সেই উপমা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, অংশ-অংশীর সম্পর্ক, দেহ-আত্মার সম্পর্ক এবং প্রজা-রাজার সম্পর্ক কখনই একজাতীয় সম্পর্ক নয়। সুতরাং চিৎ ও অচিৎ-এর সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্কটা ঠিক কী জাতীয়, তা সুস্পষ্ট করে রামানুজের বলা উচিত ছিল।

চিৎ ও অচিৎ অংশের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্কের যথার্থ প্রকৃতি অস্পষ্ট।

রামানুজের মতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আমাদের উপাস্য। তিনি ভক্তের ভগবান, করুণাঘন ও কৃপাসিন্ধু। তিনি কৃপা না করলে আমাদের পক্ষে দুস্তর দুঃখ-সাগর পার হয়ে মুক্তিলাভ অসম্ভব। সেইজন্যই ত আমরা সবাই তাঁর কৃপার ভিখারী। উপাসনায় ঈশ্বরকে তুষ্ট করে তাঁর কৃপার অধিকার অর্জন করতে হয়। তিনি অপাত্রে কৃপাবর্ষণ করেন না।

রামানুজ মতে ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং তিনি আমাদের উপাস্য। তাঁর কৃপাতেই আমাদের মুক্তি মেলে।

৩। রামানুজ দর্শনে জগৎ

রামানুজ কার্য ও কারণের সম্পর্ক-প্রসঙ্গে সৎকার্যবাদের সমর্থক। তবে তিনি শঙ্করের মত সৎকার্যবাদ বলতে বিবর্তবাদ বোঝেন না। তাঁর মতে সৎকার্যবাদের অর্থ পরিণামবাদ; কার্যকারণের পরিণতি বিশেষ। সুতরাং তিনি জগৎ-সৃষ্টি বিষয়ক

১। এই চিৎ বলতে সমস্ত জীবও বোঝায়।

২। শ্রীভাষ্য ২।১।১৪

ঔপনিষদিক বাক্যগুলোর পরিণামবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম উর্ণনাভের মত নিজের অভ্যন্তর থেকেই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আমরা আগেই বলেছি, রামানুজের মতে ব্রহ্মের দুই অংশ—চিৎ এবং অচিৎ। অচিৎ অংশ থেকে জড়জগতের সৃষ্টি। সেইজন্য অচিৎকে রামানুজ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ,[১] পুরাণ ও স্মৃতি অনুসরণ করে প্রকৃতি নামে অভিহিত করেছেন। সাংখ্যকারদের মত রামানুজও এই প্রকৃতিকে অজ এবং নিত্য বলে মনে করেন। কিন্তু সাংখ্যকর্তারা প্রকৃতিকে স্বনির্ভর স্বতন্ত্র সত্তা বলে উল্লেখ করলেও রামানুজ তা করেন না। তিনি বলেন, আত্মা যেমন ভেতর থেকেই দেহ নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি ব্রহ্ম তাঁর অংশ অচিৎকে নিয়ন্ত্রিত করেন। অচিৎ স্বনির্ভর নয়, ঈশ্বরের ওপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। প্রলয়কালে অচিৎ বা প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং অবিভক্তরূপে বিরাজ করে। ঈশ্বর এই প্রকৃতি থেকে জীবের প্রলয়-পূর্ববর্তী-জগতে-কৃত কর্মানুসারে বিচিত্র বস্তু বিশিষ্ট এই জগৎ সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে অবিভক্ত প্রকৃতি তেজ, অপ এবং ক্ষিতি এই ত্রিভূতাকারে ব্যক্ত হয়। এই ত্রিভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামে তিনটি গুণ প্রকাশ করে। ক্রমশঃ এই ত্রিভূত একত্র হয়ে আমরা জগতে যে সমস্ত স্থূল বস্তু দেখতে পাই তা সৃষ্টি করে।[২] জগতের প্রত্যেক বস্তুই এই ত্রিভূতের সংমিশ্রণের ফল। এই সংমিশ্রণের নাম ত্রিবৃৎকরণ।

রামানুজ সংকার্যবাদ বলতে পরিণামবাদ বোঝেন। তিনি ত্রিবৃৎকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেন।

ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, রামানুজের মতে ব্রহ্ম সত্যিই জগতের স্রষ্টা, জগৎ-সৃষ্টি সত্য এবং সৃষ্ট জগৎও সত্য। উপনিষদের যে সমস্ত বাক্য বস্তু-বৈচিত্র্য অস্বীকার করে, তাদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রামানুজ বলেন, বস্তু-বৈচিত্র্য অস্বীকার করা এই সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য নয়, বস্তুর অপৃথকস্থিতি[৩] অর্থাৎ ব্রহ্মের ওপর নির্ভর না করেই বস্তুর অবস্থান অস্বীকার করাই এই সমস্ত বাক্যের অভিপ্রায়। তিনি একটি উপমা ব্যবহার করে তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, সমস্ত স্বর্ণালঙ্কারই যেমন তাদের অস্তিত্বের জন্য স্বর্ণের ওপর নির্ভরশীল, তেমনই বিশ্বের সমস্ত বস্তুই অস্তিত্বের জন্য ব্রহ্মের ওপর নির্ভরশীল। ব্রহ্মের ওপর নির্ভরশীল নয় এমন বস্তু নেই।

রামানুজ মতে ব্রহ্ম সত্যই জগতের স্রষ্টা। জগৎ-সৃষ্টি সত্য এবং সৃষ্ট জগৎ ও সত্য।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঈশ্বরকে যে মায়াবী বলা হয়েছে, একথা রামানুজ অস্বীকার করেন না। তবে তিনি বলেন, ঈশ্বর যে শক্তির সাহায্যে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেন তা যাদুকরের যাদুশক্তির মতই আমাদের বুদ্ধির অতীত বলে, এই শক্তির অধিকারী ঈশ্বরকে মায়াবী বলা হয়। মায়া ঈশ্বরের বিচিত্রার্থ সৃষ্টিকারী শক্তি। ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টি যেমন সত্য তাঁর সৃষ্টি-শক্তি বা মায়াও তেমনি সত্য।[৪]

'মায়া' কথার অর্থ বিচিত্রার্থ সৃষ্টিকারী শক্তি।

১। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪।৫, ৪।১০ এবং ব্রহ্মসূত্রের রামানুজ ভাষ্য ১।৪।৮

২। শ্রীভাষ্য, বেদান্ত সার এবং বেদান্তদীপ ১।৪।৮—১০, ১।১।৩ এবং ২।১।১৫

৩। শ্রীভাষ্য ১।১।১, ১০১ পৃষ্ঠা

৪। শ্রীভাষ্য ৮৮ পৃষ্ঠা।

9858

রামানুজ শঙ্করের অর্থে জগতকে কখনই মায়া বা ভ্রান্তি বলেন না। তাঁর মতে যথার্থম্ সর্ব-বিজ্ঞানম্[১] (সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ); তথাকথিত ভ্রান্তির বিষয়ও অযথার্থ নয়। আমরা যখন ভুল করে অন্ধকারে রজ্জুতে সর্প প্রত্যক্ষ করি, তখনও সর্পকে কোন অযথার্থ বস্তু বলা যায় না। তেজ, অপ ও ক্ষিতি এই ত্রিভূত দিয়ে যেমন রজ্জুর, সৃষ্টি, তেমনি সর্পেরও সৃষ্টি। যখন আমরা রজ্জুকে সর্প বলে জানি, তখন সর্পের উপাদান ত্রিভূতই রজ্জুতে প্রত্যক্ষ করি। তবে সেখানে সর্পের উপাদান প্রাধান্য লাভ করে। জগতের প্রত্যেক জিনিসই ত্রিভূতের সৃষ্ট বলে একটি জিনিসের জায়গায় অন্য আর একটি জিনিস প্রত্যক্ষ করা খুব অযথার্থ কিছু নয়। রামানুজের এই মতবাদ সংখ্যাতি নামে পরিচিত। আমরা এমত পূর্বেই আলোচনা করেছি। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বুদিন[২] প্রভৃতি দার্শনিকেরা অনুরূপ মতবাদের প্রচারক। তাঁরা বলেন, কোয়াণ্টাম তত্ত্ব অনুসারে একটি বস্তুর উপাদান কোয়াণ্টাম অন্য সমস্ত বস্তুতেই থাকে, সুতরাং একটি জিনিসকে আর একটি জিনিস বলে জানলে উপাদানের দিক থেকে খুব অযথার্থ কিছু হয় না।

রামানুজ শঙ্করের মায়াবাদ গ্রহণ করেন না।

আমরা আগেই বলেছি, রামানুজের মতে মায়া ঈশ্বরের বিচিত্র বস্তু সৃষ্টি করার শক্তি। শঙ্করের মত তিনি মায়াকে কখনই অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলেন না। শুধু তাই নয়। রামানুজ শঙ্কর-স্বীকৃত অবিদ্যার বিরুদ্ধে সাতটি অনুপপত্তি বা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।[৩] এইবার আমরা অতি সংক্ষেপে এই সমস্ত অনুপপত্তি এবং এদের বিরুদ্ধে শঙ্করপন্থীদের উত্তর আলোচনা করবো।

শঙ্করের মায়াবাদের বিরুদ্ধে রামানুজের সপ্তানুপপত্তি এবং তাদের খণ্ডন।

(১) আশ্রয়ানুপপত্তি

রামানুজ বলেন, শঙ্কর-স্বীকৃত অবিদ্যার কোন আশ্রয় খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বলে তার মধ্যে অজ্ঞান থাকতে পারে না, আবার জীব অজ্ঞানের কার্য বলে অজ্ঞান তাতেও থাকতে পারে না। আশ্রয়হীন অবস্থায় কোন কিছুরই থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং অবিদ্যা অসিদ্ধ।

রামানুজ বলেন, অবিদ্যার আশ্রয় খুঁজে পাওয়া যায় না।

শঙ্করপন্থীরা এই অনুপপত্তির উত্তরে বলেন, অজ্ঞানের আশ্রয় ব্রহ্ম এবং জীব দুইই হতে পারে। অজ্ঞান বৃত্তিজ্ঞানের বিরোধী, কিন্তু ব্রহ্ম যে অর্থে জ্ঞানস্বরূপ তার বিরোধী নয়। ঘটের বৃত্তিজ্ঞান ঘট বিষয়ক অজ্ঞান দূর করে, কিন্তু অজ্ঞান সাক্ষী-চৈতন্য ভাস্বর, সাক্ষী-চৈতন্য অজ্ঞান দূর করে না। সুতরাং অজ্ঞানের আশ্রয় ব্রহ্ম হতে পারে। জীবের পক্ষেও অজ্ঞানের আশ্রয় হতে বাধা নেই। বীজ থেকে অঙ্কুর হয়, কিন্তু সেইজন্য

অজ্ঞানের আশ্রয় ব্রহ্ম ও জীব দুইই হতে পারে।

১। শ্রীভাষ্য ৮৩ পৃষ্ঠা।

২। Boodin's paper on Functional Realism: The Philosophical Review, March, 1934.

৩। এই সাতটি অনুপপত্তির বিস্তারিত আলোচনা এবং শঙ্করপন্থীদের তরফ থেকে এদের উত্তর ডঃ অনিলকুমার রায়চৌধুরী লিখিত 'The Doctrine of Maya' গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

অঙ্কুর কি বীজের আশ্রয় নয়? তেমনি জীব অজ্ঞানজন্য হলেও অজ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে।

(২) স্বরূপানুপপত্তি

শঙ্করাপন্থীরা অজ্ঞানকে চিৎ বা জ্ঞানে একটি দোষরূপে উল্লেখ করেছেন। রামানুজ বলেন, এই দোষের স্বরূপ কি তা বোঝা যায় না। ইহা জ্ঞান হতে পারে না। কারণ, জ্ঞানের মধ্যে আবার একটি জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। ইহা জ্ঞাতা হতে পারে না, কারণ ইহা চেতন নয়। আবার ইহা জ্ঞানের বিষয়ও হতে পারে না। কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় অদ্বৈতবাদীদের মনে একান্ত বিরুদ্ধ বলে একত্র অবস্থান করে না।

অজ্ঞান চিৎ-এ একটি দোষ রূপে কল্পিত। এই দোষের প্রকৃত নির্ণয় করা যায় না।

শঙ্করপন্থীদের বলেন, এই দোষ জ্ঞানের বিষয়ই বটে। এই বিষয় একান্ত মিথ্যা বলে পরমার্থতঃ জ্ঞানের সঙ্গে একত্র থাকার প্রসঙ্গই উঠতে পারে না। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের অঙ্গে সংযুক্তই ত থাকে। অবিদ্যা বা অজ্ঞান সাক্ষীভাস্বর বলে জ্ঞানের বিষয়।

শঙ্করপন্থীদের মতে এই দোষ জ্ঞানের বিষয়।

(৩) অনির্বচনীয়ানুপপত্তি

শঙ্করপন্থীরা অজ্ঞানকে সৎও নয়, অসৎও নয়, অনির্বচনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। রামানুজ বলেন, জাগতিক বস্তু হয় সৎ, নয় অসৎ, হবেই হবে; এমন কোন বিষয়ই নেই যা সৎও নয়, অসৎও নয়, অনির্বচনীয়। সুতরাং অনির্বচনীয় অজ্ঞান অদ্বৈতবাদীদের এক অসম্ভব কল্পনা। শঙ্করপন্থীরা বলেন, অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। অনির্বচনীয় বস্তুর অস্তিত্ব আমরা ভ্রান্তজ্ঞানের ক্ষেত্রে হামেশাই দেখতে পাই। অন্ধকারে রজ্জুকে যখন সর্পরূপে দেখি, তখন সর্পের প্রকৃতি কি? নিশ্চয়ই অসৎ নয়। বন্ধ্যাপুত্রের মত অসৎ জিনিস ত কখনই প্রতিভাত হয় না। অথচ সর্প যে প্রতিভাত হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। এই সর্প অসৎ নয়, কিন্তু তা বলে সৎও নয়। যা সৎ তা কখনই নাই এমন হতে পারে না। অথচ আলো নিয়ে এলে রজ্জুতে অন্ধকারে যে সাপ দেখি তা আর থাকে না। সুতরাং অন্ধকারে রজ্জুতে প্রতিভাত সর্প অবশ্যই সৎও নয়, অসৎও নয়। একে অনির্বচনীয় ছাড়া আর কি বলা যাবে?

অজ্ঞান সৎও নয়, অসৎও নয়, অনির্বচনীয়। রামানুজ অনির্বচনীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

ভ্রান্ত জ্ঞানের বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অনির্বচনীয় বস্তুর সম্ভাবনা নিশ্চয়।

(৪) তিরোধানানুপপত্তি

শঙ্করপন্থীদের মতে অজ্ঞান ব্রহ্মকে আবৃত করে। রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম ত স্বয়ং প্রকাশ। তিনি যদি আবৃত হন, তবে তার স্বয়ং প্রকাশত্ব বা স্বরূপই ত নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ ব্রহ্ম তিরোহিত হবেন।

অজ্ঞান ব্রহ্মকে আবৃত করলে ব্রহ্ম তিরোহিত হবেন।

সূর্য মেঘে ঢাকা পড়লে লুপ্ত হন না, ব্রহ্মও অজ্ঞানে আবৃত হলে তিরোহিত হন না।

শঙ্করপন্থীরা এই অনুপপত্তির জবাবে বলেন, সূর্য মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা পড়ে, কিন্তু মেঘের আবরণ ত সূর্যকে বিনষ্ট করতে পারে না। তেমনি অজ্ঞান ব্রহ্মকে আবৃত করলেও বিনষ্ট করে না।

(৫) প্রমাণানুপপত্তি

শঙ্কর অজ্ঞান প্রমাণের জন্য যে অনুমান করেছেন তো দোষদুষ্ট।

রামানুজ বলেন, শঙ্করপন্থীরা অজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য "প্রমাণজ্ঞানম্ স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত স্ববিষয়াবরণ......" প্রভৃতি যে অনুমান ব্যবহার করেছেন তা অনেকান্ত-দোষদুষ্ট। সুতরাং অজ্ঞান অপ্রমাণিত।

রামানুজের অভিযোগ খণ্ডন।

শঙ্করপন্থীরা বলেন, রামানুজের এই অভিযোগ অর্থহীন। আলোচ্য অনুমান অজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য প্রদর্শিত হয়নি, অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব প্রমাণ করাই এই অনুমানের উদ্দেশ্য। অজ্ঞান ত সাক্ষীভাস্বর। তার আবার স্বতন্ত্র প্রমাণের প্রয়োজন কি?

(৬) নিবর্তকানুপপত্তি

রামানুজ বলেন, নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক হতে পারে না।

শঙ্কর বলেন, নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান থেকেই অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। রামানুজ উপনিষদ এবং গীতা থেকে বিভিন্ন বচন উদ্ধার করে বলেন, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাত্মক জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি অসম্ভব। নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক বা মুক্তির নিদান হতে পারে না।

শঙ্কর পন্থীদের উত্তর।

শঙ্করপন্থীরা এই অনুপপত্তির বিরুদ্ধে বলেন, উপনিষদে এবং গীতায় সগুণ ব্রহ্মের কথা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদনই এদের মুখ্য তাৎপর্য। সাধক সহজে নির্গুণব্রহ্মের উপলব্ধি করতে পারে না। সেইজন্য সগুণ ব্রহ্মের কথা বলে তাঁকে উচ্চস্তরের জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত করা হয়। অনেক অদ্বৈতবাদীর মতে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মের অনুগ্রহেই সাধকের অদ্বৈত বাসনা জন্মে। সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য সগুণ ব্রহ্মের আলোচনা ও আরাধনা নিষ্প্রয়োজন নয়।

(৭) নিবর্ত্যানুপপত্তি

রামানুজ মতে অজ্ঞান নিবৃত্তি অসম্ভব।

রামানুজ বলেন, অজ্ঞানের নিবর্তক অদ্বৈতদর্শন যথাযথভাবে নির্দেশ করতে পারেনি বলে অজ্ঞাননিবৃত্তি অসম্ভব।

শঙ্কর এ অভিযোগ খণ্ডন করেন।

শঙ্করপন্থীরা এর জবাবে বলেন, নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানই ত অজ্ঞানের যথার্থ নিবর্তক। সুতরাং অজ্ঞানের নিবৃত্তি হবে না, এ প্রসঙ্গ অবান্তর।

৪। রামানুজ দর্শনে জীব, বন্ধন ও মুক্তির ধারণা

রামানুজের মতে জীব দেহবিশিষ্ট আত্মা। তার দেহ ও আত্মা উভয়ই সত্য। দেহ ব্রহ্মের অচিৎ অংশের সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, এই দেহ সসীম। আত্মা নিত্য, সৃষ্ট নয়। আত্মাও ব্রহ্মেরই অংশ। দেহ যেমন ব্রহ্মের অচিৎ-অংশজাত, আত্মা তেমনি ব্রহ্মের চিৎ-অংশ। সুতরাং আত্মা অসীম নয়। উপনিষদ-কথিত আত্মার সর্বব্যাপিতা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে চলবে না। আত্মা সর্বব্যাপী বলতে আত্মা এমনই সূক্ষ্ম যে, ইহা যে কোন অচেতন পদার্থে প্রবেশক্ষম, বুঝতে হবে।[১] রামানুজের মতে আত্মা অণুপরিমাণ। চৈতন্য আত্মার কোন আকস্মিক বা আগন্তুক গুণ নয়। নৈয়ায়িকেরা আত্মার চৈতন্য গুণ যে দেহসংযুক্তির ওপর নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছেন, তা অযৌক্তিক। অদ্বৈতবাদীরা চৈতন্যকে আত্মার স্বরূপ বলেছেন। একথাও অপ্রমাণিত। জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয় অযুক্ত শুধু চৈতন্য বলে কিছু থাকতে পারে না। চৈতন্য সব সময়ই কোন না কোন লোকের কোন না কোন বিষয়ে চৈতন্য। আসলে চৈতন্য আত্মার নিত্য গুণ, সর্বাবস্থাতেই আত্মায় চৈতন্যের অবস্থান। রামানুজের মতে চৈতন্য ধর্মভূতজ্ঞান। সুষুপ্তিতে, এমন কি মুক্ত অবস্থাতেও আত্মা 'অহম্' রূপে প্রতিভাত হয়। রামানুজের মতে আত্মা এবং অহম্ সমার্থক (স্বরূপেন এব অহমর্থঃ আত্মা; মুক্তৌ অপি অহমর্থঃ প্রকাশতে)।

রামানুজ মতে আত্মা এবং অহম্ সমার্থক।

রামানুজ বলেন, উপনিষদে পরমাত্মা ও জীবাত্মার যে অভেদের কথা বলা হয়েছে, তা একান্ত অভেদ নয়, বিশিষ্ট অভেদ। সসীম জীবাত্মা কি অসীম পরমাত্মার সঙ্গে একান্ত অভিন্ন হতে পারে? জীবাত্মা ত পরমাত্মা বা ব্রহ্মের চিৎ অংশ। অংশ ও অংশী কখনই এক হতে পারে না। তবে অংশের যেমন অংশী থেকে, গুণের যেমন দ্রব্য থেকে, দেহের যেমন আত্মা থেকে অপৃথকস্থিতি থাকতে পারে না, তেমনি জীবাত্মার পরমাত্মা বা ব্রহ্ম থেকে অপৃথকস্থিতি সম্ভব নয়। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিসের অভেদের কথা বলার কোন মানে হয় না, আবার দুটি সম্পূর্ণ অভিন্ন জিনিসের অভেদের কথা বলারও কোন প্রয়োজন হয় না। একই জিনিসের দুটি ভিন্ন রূপের অভেদের কথাই সঙ্গত ও তাৎপর্যপূর্ণ। "এই সেই দেবদত্ত" —এই বাক্যে একই দেবদত্তের বিভিন্ন সময়ে আবির্ভাব যে একই ব্যক্তির আবির্ভাব একথাই বোঝান হয়েছে। উপনিষদের বাক্য 'তত্ত্বমসি' (সেই ব্রহ্মই তুমি) এইভাবেই বুঝতে হবে। তৎ বলতে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, বিশ্বের স্রষ্টা ব্রহ্ম এবং ত্বম্ বলতে অচিৎবিশিষ্ট জীব-শরীরক ব্রহ্ম বোঝায়। সুতরাং তৎ ও ত্বম-এর অভেদ আসলে কতকগুলো গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম এবং অন্য কতকগুলো গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অভেদ; অর্থাৎ, বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট একই দ্রব্যের অভেদ বা বিশিষ্ট ঐক্য বোঝায়। রামানুজ-দর্শন এই জন্যই বিশিষ্টাদ্বৈত বা

'তত্ত্বমসি' বাক্য জীব ও ব্রহ্মের একান্ত অভেদ প্রতিপাদন করে না, বিশিষ্ট অভেদ প্রকাশ করে।

১। শ্রীভাষ্য ১।১।১

বিশিষ্টের অদ্বৈত বা অভেদ নামে পরিচিত।[১] জীব ব্রহ্মের অংশরূপে ব্রহ্মের সঙ্গে অপৃথকসিদ্ধি সম্পর্কে আবদ্ধ।

রামানুজের মতে কর্মের জন্যই আত্মার দেহ-বন্ধন। কর্মানুসারে আত্মা বিভিন্ন দেহ ধারণ করে। আত্মা দেহযুক্ত হলেই তার চৈতন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং দেহের দ্বারা সীমিত হয়। একটি ক্ষুদ্র দীপ যেমন সমগ্র কক্ষকেই আলোকিত করে, তেমনি আত্মা অনুপরিমাণ হলেও দেহের সমস্ত অংশই চেতন করে তোলে। তখন আত্মা নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে। আত্মা ও অনাত্মার এই একীকরণের নাম অহঙ্কার। শরীরে অহং বুদ্ধি অজ্ঞান-জন্যই হয়ে থাকে।[২] রামানুজ কখনও কখনও সকাম কর্মকেই অজ্ঞান বলেছেন।

রামানুজ কখনও কখনও সকাম কর্মকেই অজ্ঞান বলেন।

বন্ধন থেকে মুক্তি কর্ম এবং জ্ঞানের ফল। বর্ণাশ্রম অনুসারে বেদ বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে যে সমস্ত যাগযজ্ঞ কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন তা উদ্‌যাপন করাই রামানুজের মতে কর্ম। সমস্ত ফলবাসনা পরিত্যাগ করে এই সমস্ত কর্ম করাই প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। নিষ্কামভাবে কর্তব্য করলে জ্ঞানলাভের পথে অন্তরায় অতীত কর্মের সঞ্চিত ফল নষ্ট হয়। যথাযথভাবে যাগযজ্ঞ উদ্‌যাপনের জন্য মীমাংসাদর্শন আলোচনা করা দরকার। সেইজন্য রামানুজ মীমাংসাদর্শন-পাঠ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পক্ষে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছেন। মীমাংসাদর্শন পাঠ করে যাগযজ্ঞ করার পর এরা যে মুক্তি দিতে পারে না, এ বোধ জাগ্রত হয়। তখন মুমুক্ষু বেদান্ত পাঠ করেন। বেদান্ত পাঠ করে তিনি জানতে পারেন, ব্রহ্ম এই বিশ্বের স্রষ্টা, রক্ষক এবং সংহারক ; তাঁর নিজের আত্মা এবং দেহ অভিন্ন নয়, আত্মা অন্তর্যামী নিয়ামক ঈশ্বরের অংশ বিশেষ। তিনি আরও বোঝেন, শুধু বেদান্ত-পাঠ থেকে মুক্তি হয় না, ঈশ্বরের কৃপা হলেই মুক্তিলাভ সম্ভব।

বন্ধন থেকে মুক্তি কর্ম ও জ্ঞানের ফল। জ্ঞান উপাসনাত্মক।

জ্ঞান থেকেই যে মুক্তি হয়, উপনিষদ একথা ঠিকই বলেছেন। তবে এই জ্ঞান শাস্ত্রের আক্ষরিক জ্ঞান নয়। যদি তা-ই হত, তবে যে কোন লোক বেদান্তপাঠ করলেই ত মুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু তা ত আর হয় না। সেইজন্যই রামানুজ বলেন, মুক্তিলাভের পক্ষে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ঈশ্বরের ধ্রুবা স্মৃতি, ধ্যান, উপাসনা বা ভক্তি বোঝায়।[৩] পরম প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের নিত্য ধ্যান অভ্যাস করা মুক্তিলাভের সহায়ক। ঈশ্বরের নিত্য ধ্যান বা ভক্তি অভ্যাসের ফলেই ঈশ্বর-দর্শন বা সাক্ষাৎকার হয়। এই সাক্ষাৎকার দেহধারণের হেতু সমস্ত কর্ম এবং অজ্ঞান বিনষ্ট করে। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈশ্বর-দর্শন করেন, তিনি চিরকালের জন্য দেহের বন্ধন

জ্ঞান উপাসনা বা ভক্তি বোঝায়। মুক্ত আত্মা ব্রহ্ম সদৃশ হন, কিন্তু ব্রহ্মই হয়ে যান না।

১। শ্রীভাষ্য ১।১।১, ৯৪—৯৫ পৃষ্ঠা।   ২। পূর্ববৎ।

৩। "অতো…ধ্যানোপাসনাদি বাচ্যম্ জ্ঞানম্"," বেদনম্ উপাসনম্ স্যাৎ" "উপাসনা পর্য্যায়ত্বা ভক্তিশব্দস্য" —শ্রীভাষ্য ১।১।১

থেকে মুক্ত হন এবং তাঁর পুনর্জন্ম হয় না। এই ত মুক্তি। অবশ্য এইক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, শুধু মানবিক চেষ্টায় মুক্তিলাভ সম্ভব নয়; ঈশ্বরের কৃপা না হলে কিছুই হবে না। ঈশ্বরের নিত্য ধ্যান এবং উপাসনা করলে ঈশ্বর জীবের প্রতি তুষ্ট হয়ে তাঁকে সম্যকজ্ঞান প্রদান করেন। ঈশ্বরের এই কৃপা মিললেই মুক্তি মেলে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন, ঈশ্বর তাঁকে কৃপা করে দুঃখবন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। রামানুজ-দর্শনে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকে আর্ত-প্রপত্তি বলে। রামানুজ জীবন্মুক্তিতে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, দেহ মানেই বন্ধন, সুতরাং দেহ থাকতে মুক্তিলাভ অসম্ভব। মুক্তি মানেই বিদেহ মুক্তি। রামানুজ বলেন, মুক্ত আত্মা কখনই ঈশ্বর হয়ে যেতে পারেন না। অংশ কি কখনও অংশী হতে পারে? মুক্ত আত্মা সমস্ত দোষমুক্ত চৈতন্যের অধিকারী হন বলে এই দিক থেকে ব্রহ্ম-প্রকার বা ব্রহ্মসদৃশ হয়ে যান। উপনিষদে 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' বলতে এই ব্রহ্ম প্রকারতা লাভই বোঝায়।[১]

মন্তব্য

যুক্তির দিক থেকে ঈশ্বরের সঙ্গে জগৎ ও জীবের সম্পর্ক-ব্যাপারে রামানুজ-দর্শনে কিছু কিছু অসঙ্গতি থাকলেও আর্ত-প্রপত্তিতে মুক্তির কথা বলে রামানুজ সাধারণ লোকের অত্যন্ত প্রীতিভাজন হয়েছেন। বিশ্বের অন্তর্যামী-নিয়ন্তা, সমস্ত কল্যাণ গুণের আধার ঈশ্বরের কল্পনা; তাঁর প্রেমরূপ ও কৃপাকণা বিতরণ, মুক্তিতে ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন না হয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গলাভ প্রভৃতি রামানুজ-মত জনসাধারণের খুবই প্রিয়। সাধারণ লোক যুক্তির চেয়ে ভক্তিতেই মজে বেশী। এইজন্যই রামানুজের ভক্তিবাদ বা বৈষ্ণবদর্শন তাদের এত আদরের ধন।

রামানুজের ভক্তিবাদ সাধারণের খুব প্রিয়।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ মুখ্যতঃ যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান-প্রধান দর্শন, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মুখ্যতঃ হৃদয়ভিত্তিক ভক্তিমূলক ধর্ম। শঙ্করের আবেদন মুখ্যতঃ মানুষের বুদ্ধির দরবারে, রামানুজের হৃদয়ের দ্বারে। অসাধারণদের প্রিয় শঙ্কর, রামানুজ প্রিয় সাধারণের। দুয়েরই দরকার আছে। কারণ, সমাজ সাধারণ ও অসাধারণ সকলেরই।

শঙ্করের যুক্তিবাদ সকলের জন্য নয়। শঙ্কর প্রিয় অসাধারণদের, রামানুজ প্রিয় সাধারণের।

প্রমাণপঞ্জী

স্বামী মাধবানন্দ: শঙ্করের ভাষ্যসহ বৃহদারণ্যক উপনিষদ
মহাদেব শাস্ত্রী: শঙ্করের ভাষ্যসহ ভগবদ্‌গীতা
কালীবর বেদান্তবাগীশ: শঙ্করের শারীরক ভাষ্য

১। শ্রীভাষ্য ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Deussen : The System of Vedanta.

R. P. Singh : The Vedanta of Sankara

R. D. Ranade : A Constructive Survey of Upanisadic Philosophy.

Thibaut : Vedanta Sutra with the commentaries of Ramanuja and Sankara.

V. S. Ghate : The Vedanta (A comparative account of Sankara, Ramanuja, Nimbarka, Madhva and Vallava)

M. Hiriyanna : Outlines of Indian Philosophy ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ অধ্যায়।

রামানুজ : শ্রীভাষ্য (R. Venkatesvar Company)

Dr. Anil Kumar Raychoudhury : The Doctrine of Maya.

ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী : অদ্বৈত দর্শন

Dr. Nirod Baran Chakraborty : The Advaita Concept of Falsity—A critical study.

অন্যান্য যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তা যথাস্থানে পাদটীকায় উল্লেখ করেছি।

———

পরিশিষ্ট

ভগবদ্‌গীতায় নৈতিক স্বাতন্ত্র্যের রূপ

স্বাতন্ত্র্য ব্যতীত নীতিশাস্ত্র অর্থহীন। মানুষের কাজকর্মে স্বাতন্ত্র্য আছে বলেই মানুষকে তার কাজের জন্য দায়ী করা হয়। যে কাজে দায়িত্ব নেই তার নৈতিক বিচার চলে না। যে যে-কাজের জন্য দায়ী নয়, সে কাজের ভালোমন্দ দিয়ে তার বিচার করা চলবে কেন? মানুষ স্বেচ্ছায় কাজ করতে পারে। কর্মে-কর্মীর চরিত্র প্রকাশ পায়। সেইজন্যই মানুষের কাজের বিচার করে তার নৈতিক মান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং যে কর্মে স্বাতন্ত্র্য নেই, সে কর্ম নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় স্থান পায় না।

স্বাতন্ত্র্য ব্যতীত নীতিশাস্ত্র অর্থহীন।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা নৈতিক স্বাতন্ত্র্য-সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেছেন। অদৃষ্টবাদের দেশ বলে কুখ্যাত আমাদের ভারতবর্ষ। ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি, পুরুষকার এবং স্বাতন্ত্র্যের স্থান আমাদের শাস্ত্রে নেই। ভগবদ্‌গীতায় কর্মফলের মহিমা কীর্তন করে অদৃষ্টবাদের জয়ধ্বনি করা হয়েছে বলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস। এই অদৃষ্টবাদের দেশে কর্মফলের মহিমা কীর্তনকারী ভগবদ্‌গীতায় নৈতিক স্বাতন্ত্র্যের যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তার আলোচনা কৌতূহলোদ্দীপক হবে সন্দেহ নেই, সেইজন্যই এই সংযোজন করা হল।

ভগবদ্‌গীতায় অদৃষ্টবাদ প্রচারিত হয়েছে বলে লোকের বিশ্বাস। গীতায় স্বাতন্ত্র্যের ধারণা সেইজন্যই আলোচনাযোগ্য।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল—নৈতিক স্বাতন্ত্র্য বলতে বুঝবো কি? নৈতিক স্বাতন্ত্র্য দুটি ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। স্বাতন্ত্র্য বলতে—আত্মার স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে পারে—আবার মানুষের কর্ম-কৃতি এবং চেষ্টার (Freedom of will) স্বাতন্ত্র্যও হতে পারে। যদি স্বাতন্ত্র্য বলতে আত্মার স্বাতন্ত্র্য বুঝি,—তবে প্রশ্ন হবে—মানুষ কি স্বাধীন? আর যদি স্বাতন্ত্র্য বলতে মানুষের কর্ম-কৃতি এবং চেষ্টার স্বাতন্ত্র্য বুঝি—তবে প্রশ্ন হবে—মানুষের কর্ম-কৃতি ও চেষ্টায় কি স্বাতন্ত্র্য আছে?

পাশ্চাত্ত্য-দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করে দেখি—বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা (Rationalists) সাধারণতঃ নৈতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রথম ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছেন; দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন প্রত্যক্ষবাদী (Empiricists) এবং অপরোক্ষানুভূতিবাদী দার্শনিকেরা (Intuitionists)। স্পিনোজা, কাণ্ট, হেগেল এবং ইংরেজ হেগেলপন্থী দার্শনিকেরা স্বাতন্ত্র্য বলতে বুঝেছেন—আত্মার স্বাতন্ত্র্য। হিউম এবং মিলের মত প্রত্যক্ষবাদী

'নৈতিক স্বাধীনতা' কথাটির নিহিতার্থ।

দার্শনিকেরা এবং মার্টিনিউ সাহেবের মত অপরোক্ষানুভূতিবাদী দার্শনিকেরা স্বাতন্ত্র্য বলতে বুঝেছেন—ব্যক্তির কর্মকৃতি এবং চেষ্টার স্বাতন্ত্র্য। যুক্তিবাদী দার্শনিকদের কাছে মুখ্য প্রশ্ন—আমরা কি স্বাধীন? প্রত্যক্ষবাদী এবং অপরোক্ষনুভূতিবাদী দার্শনিকদের কাছে প্রশ্ন—বিভিন্ন সম্ভাব্যতার (possibility) মধ্যে কোন একটিকে বেছে নেবার ক্ষমতা কি মানুষের আছে?

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে স্বাতন্ত্র্যের অর্থ নিয়ে মতভেদ।

যুক্তিবাদী দার্শনিকপ্রধান কাণ্টের স্বাধীনতাপ্রত্যয় (Concept of freedom) এস্থলে বিশেষভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। ভগবদ্গীতায় নৈতিক স্বাধীনতার রূপ অনেকাংশে কাণ্টের স্বাধীনতা-প্রত্যয়-সদৃশ। কাণ্ট কার্যকারণনির্দিষ্ট জাগতিক বস্তুনিচয়ের বাইরে স্থান নির্দেশ করেছেন মানুষের স্বরূপের। কাণ্টের মতে প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তুই কার্যকারণ-নিয়মাধীন। প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীন কারণের কোন স্থান নেই। সমস্ত কার্যই কারণ-নিয়ন্ত্রিত। কার্য কারণ ব্যতিরেকে অসম্ভব, কারণ পুনরায় অন্য কোন কারণনিয়ন্ত্রিত কার্যস্বরূপ। একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। মানুষ স্বাধীন কারণ (Free cause); তার কারণত্ব অন্য কারণ হয়ে কার্যরূপ গ্রহণ করে না। প্রাকৃতিক বস্তু স্বাতিরিক্ত অন্যবস্তু। মানুষ কিন্তু অন্যবস্তু নয়; মানুষ স্বয়ংসাধ্য (end in itself)। এই ধারণাকে ভিত্তি করেই কাণ্টের নীতিশাস্ত্র গড়ে উঠেছে।

কাণ্টের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে ধারণা।

যেহেতু মানুষ স্বাধীন কারণ, সুতরাং সে স্বয়ংসাধ্য ; অন্যবস্তু দ্বারা সাধ্য নয়। কাণ্ট তাই নীতিশাস্ত্রের নিয়ম করেছেন—"নিজেকে এবং অন্য মানুষকে স্বয়ংসাধ্য ধরে নিয়ে কাজ করবে—অন্যবস্তু-সাধন মনে করে নয়।" (So act as to treat humanity, whether in thine own person or in the person of any other, as an end withal, never as means only).

কাণ্টের নীতিশাস্ত্রের নিয়ম।

কার্ণ্টের বিশ্বাস—সুখাদর্শের (Pleasure principle) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া পরাধীনতার নামান্তর। কাণ্ট পরাধীনতার পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন—"If the will seeks the law which is to determine it anywhere else than in the fitness of its maxims to be universal laws of its own dictation, consequently if it goes out of itself and seeks the law in the character of any its objects, then always results heteronomy. (Metaphysics of Morals, Vide Abbott's Kant's theory of Ethics p. 59). সুতরাং আমরা বলতে পারি, কাণ্টের মতে যুক্তির নির্দেশ মেনে চলাই একমাত্র স্বাতন্ত্র্য। কর্মফলের বাসনা ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম করে যাওয়াই কর্মজীবনের আদর্শ। কাজের জন্যই কাজ করতে হবে;

কাণ্ট বলেন, সুখাদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াই পরাধীনতা।

কাজেই কাজের সমাপ্তি এবং পরিপূর্তি। এস্থলে কাণ্টের নৈতিক স্বাধীনতার ধারণায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পূর্বে কাণ্ট স্বাতিরিক্ত কোন বস্তু-নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন স্ব-অধীনতাকেই নৈতিক স্বাতন্ত্র্য স্বরূপ বলে ঘোষণা করেছেন। এখন কিন্তু তিনি বলছেন—শুদ্ধ যুক্তির নির্দেশ মেনে চলাই স্বাধীনতা। সর্বপ্রকার অনুভূতির দাসত্বই পরাধীনতা। মানুষের ভেতর যুক্তি এবং অনুভূতি দুইই কাজ করে। অনুভূতির নিয়ন্ত্রণ অমান্য করে যুক্তির অনুগামী হওয়াই নৈতিক স্বাধীনতার মূল কথা। সুতরাং পূর্বে স্বাতন্ত্র্য এবং পরাধীনতার পার্থক্য নির্ভর করছিল—স্বনিয়ন্ত্রণ এবং স্বাতিরিক্ত বস্তু-নিয়ন্ত্রণের ওপর;—এখন তা নির্ভর করছে—আমাদের জীবনে ক্রীড়াশীল দুটি বিশেষ বৃত্তি—যুক্তি এবং অনুভূতির ওপর।

কাণ্টের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে শেষের মতটি বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য। এখানেই আমরা কাণ্টের এবং প্রাচীন বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে মতবাদের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাই। প্লেটো এবং স্পিনোজার মত বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব-মুক্তিই স্বাতন্ত্র্য। প্লেটো তাঁর Phaedo নামক গ্রন্থে এই মতবাদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—দেহের বন্ধন মুক্তি এবং সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়াসক্তি হতে মুক্তিই স্বাধীনতা। সেইজন্যই দার্শনিকেরা মৃত্যুকে ভয় না করে তাকে 'শ্যামসুন্দর' বলে আহ্বান করে থাকেন। তিনি আরও বলেন—দর্শন মানুষকে দেহের বন্ধন-মুক্তির জন্য জ্ঞানে দীক্ষা দিয়ে থাকে। বন্ধন অজ্ঞানতার ফল; সুতরাং মুক্তি জ্ঞানের অনুগামী।

কাণ্ট, প্লেটো ও স্পিনোজার মতের তুলনা।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক স্পিনোজা নৈতিক স্বাতন্ত্র্য অনুরূপ অর্থেই গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Ethica'র চতুর্থখণ্ডে ৫৭ নং সূত্রে বলেছেন—"A free man, that is to say, a man who lives all to the dictates of reason alone, is not led by the fear of death" (স্বাধীন মানুষ অর্থাৎ এমন মানুষ যিনি কেবলমাত্র যুক্তির নির্দেশ মেনে চলেন, তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হন না)।

স্পিনোজার মতে স্বাতন্ত্র্য।

নীতিশাস্ত্রবিদ সিজ্‌উইক স্বাতন্ত্র্যের দুটি রূপের সন্ধান দিয়েছেন—

(১) নির্বিকার স্বাতন্ত্র্য (Neutral Freedom) এবং (২) যৌক্তিক স্বাতন্ত্র্য (Rational Freedom)। ভালো এবং মন্দ দুই করবার (স্বাধীনতাকে বলা যেতে পারে—নির্বিকার স্বাতন্ত্র্য। কাণ্ট স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে যে দুটি ভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেছেন—তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে নির্বিকার স্বাতন্ত্র্য। দার্শনিক গ্রীনের মতবাদেও এই প্রকার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ যখন একমাত্র যুক্তির নির্দেশেই কাজ করে, তখন সে মুক্ত—স্বাতন্ত্র্যের এই ধারণার নাম যৌক্তিক স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে কাণ্টের দ্বিতীয় মতবাদ এবং বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের স্বাতন্ত্র্যের ধারণা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

সিজ্‌উইক্ মতে স্বাতন্ত্র্য দ্বিবিধ—নির্বিকার ও যৌক্তিক।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করা গেল। আশাকরি, এই আলোচনার আলোতে ভগবদ্‌গীতার নৈতিক স্বাধীনতার রূপ সহজবোধ্য হবে। ভগবদ্‌গীতায় স্বাধীনতা বলতে যৌক্তিক স্বাধীনতাই ধরা হয়েছে। মানুষ যখন যুক্তির নির্দেশ মেনে চলে, তখনই সে স্বাধীন। ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ভোগবাসনা হতে মুক্ত হয়ে দৈবী আত্মার (Rational Self) অনুগামী হওয়াই স্বাধীনতা। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের স্বাধীনতার ধারণার আলোকে গীতার স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণার আলোচনা। গীতার মতে ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ভোগবাসনা হইতে মুক্ত হয়ে দৈবী আত্মার অনুগামী হওয়াই স্বাধীনতা। এ বিষয়ে প্রমাণ।

দুঃখে অক্ষুভিত চিত্ত, সুখে স্পৃহাহীন, অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হতে মুক্ত ব্যক্তিই স্থিতধী। (২।৫৬)

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

যাঁহা হতে লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি লোকের নিকট হতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হতে মুক্ত—তিনিই ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তি (১২।১৫)।

দ্বাদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে অনাসক্ত ব্যক্তিকেই ভগবৎপ্রিয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

স্থিতপ্রজ্ঞ ও ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তির আলোচনাতেই মুক্তপুরুষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। যিনি ভক্তিমান এবং স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি নিসঃন্দেহে মুক্তপুরুষ। সুখে স্পৃহাহীন, দুঃখে নিরুদ্বিগ্নচিত্ত এবং সর্বব্যাপারে অনাসক্ত ব্যক্তিই মুক্ত। সহজভাবে বলতে গেলে যিনি বদ্ধ নন, তিনিই মুক্ত। "অনাসক্তি" গীতার মূল আদর্শ। সমস্ত গীতায় বারবার এই অনাসক্তির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

যে পুরুষ সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও নির্মম হয়ে বিচরণ করেন, তিনি শান্তি লাভ করেন। (২।৭১)

চতুর্থ অধ্যায়ে পাচ্ছি—

যিনি কর্ম ও ফলে আসক্তি ত্যাগ করে নিত্যানন্দে পরিতৃপ্ত হন, তিনি সমস্ত কর্মে প্রবৃত্ত হয়েও কিছুই করেন না। যিনি অনায়াসে যাহা প্রাপ্ত হন তাতেই সন্তুষ্ট হন, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত নন, মাৎসর্যকে দূর করেন এবং কার্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি, তিনি কর্ম করেও তাতে বদ্ধ নন। আর দৃষ্টান্ত দিয়ে লাভ নেই। আমরা বুঝতে পেরেছি—ভগবদ্‌গীতায় অনাসক্তিই স্বাধীনতার স্বরূপ।

পাশ্চাত্য বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা নৈতিক স্বাতন্ত্র্য বলতে আত্মার স্বাধীনতা বুঝেছেন। ব্যক্তির কর্ম-কৃতি এবং চেষ্টার স্বাধীনতা তাঁদের মতে স্বাধীনতা পদবাচ্য নয়। ভগবদ্‌গীতাতেও এই মতবাদেরই প্রকাশ দেখা যায়। গীতায় বার বার বলা হয়েছে—যিনি আত্মবান অর্থাৎ যিনি আত্মাকে জেনেছেন, তিনিই মুক্ত।

পাশ্চাত্য বুদ্ধিবাদীদের মতের সঙ্গে গীতার মতের সাদৃশ্য।

যে মানব আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তার কোন কর্তব্য কর্ম নেই। (৩।১৭)

বেদ সকল ত্রিগুণাত্মক, তুমি সুখ-দুঃখাদি-দ্বন্দ্ব-রহিত, নিত্য ধৈর্যশীল, যোগক্ষেম-রহিত আত্মবান হয়ে নিষ্কাম হও। (২।৪৫)

আত্মবান হয়ে মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষেরই আছে। আবার আত্মবান হওয়ার পথে মানুষই বাধাস্বরূপ।

বিবেকবুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে সংসার হতে উদ্ধার করবে, আত্মাকে কখনও অধঃপাতিত করবে না, আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু। (৬।৫)

ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ভোগবাসনা মানুষের আত্ম-প্রাপ্তিতে বাধা জন্মায়। মানুষ স্বচেষ্টায় অতিক্রমও করতে পারে এই বাধা। সুতরাং আমরা বলতে পারি, স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষ স্বরূপতঃ স্বাধীন। মনুষ্যত্বে বন্ধন নেই, বন্ধন মানুষের। অর্থাৎ মানুষের যা স্বরূপ—তার মনুষ্যত্ব—তা মুক্ত; মানুষের যা বাইরের জিনিস—তার আসক্তি—তাতেই বন্ধন।

গীতা ভাল করার ও মন্দ করার স্বাধীনতা স্বীকার করেছেন।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—গীতা যেমন আত্মপ্রাপ্তিতে মানুষের স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন, তেমনি কি মানুষের অধঃপাতে যাওয়ার স্বাতন্ত্র্যও স্বীকার করেছেন? অনেকে বলেন, যে স্বাধীনতায় অধঃপাতে যাওয়ার স্বাধীনতা নেই, তা একপ্রকার পরাধীনতার নামান্তর। পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রবিদ সিজ্‌উইক যাকে নির্বিকার স্বাধীনতা বলেছেন, ভগবদ্‌গীতায় তারই স্বীকৃতি আছে। ভগবদ্‌গীতায় এমন স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে—যাতে করে মানুষ ভালও করতে পারে, মন্দও করতে পারে;—আত্মপ্রাপ্তিও হয় আবার অধঃপতনও হতে পারে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে স্পষ্টই বলা হয়েছে—আত্মাই মানুষের বন্ধু—আত্মাই মানুষের শত্রু। মানুষ এমনভাবে কাজ করতে পারে যাতে আত্মা তার বন্ধু হয়, আবার এমন কাজও করতে পারে যাতে আত্মা তার শত্রু হয়। মানুষ নিজেকে উন্নীতও করতে পারে, অধঃপাতিতও করতে পারে।

মানুষ স্বেচ্ছায় পাপের পথ বা পুণ্যের পথ অবলম্বন করতে পারে। পাপপথাশ্রয়ী মানব নীতি-উপদেশে পুণ্য কার্যে ব্রতী হয়। মানুষের যদি এ স্বাধীনতা না থাকতো, তবে ভগবদ্‌গীতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হত। অর্জুন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে কর্তব্যকর্মে উদ্বুদ্ধ করেন। অর্জুনকে কর্তব্য-

মানুষ চেষ্টা করলে তার স্বভাবের পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

কর্মে উদ্বুদ্ধ করাই গীতার আসল উদ্দেশ্য। এতেই বোঝা যাচ্ছে—মানুষের স্বেচ্ছায় কাজ করবার স্বাধীনতা আছে। অর্জুন তাঁর ইচ্ছামত কাজ করতে পারতেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—ও রকম না করে এরকম করাই তোমার উচিত। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে—মানুষ উপদেশ প্রভাবে অন্যায় হতে ন্যায়পথে অগ্রসর হতে পারে। গীতায় সকলের জন্যই মুক্তির ব্যবস্থা আছে। হীন পতিত, ভণ্ড, পাষণ্ড—কারও

চিরকালের জন্য নরকভোগের নির্দেশ নেই। মানুষ চেষ্টা করলেই তার স্বভাবের পরিবর্তন করতে পারে। অপবিত্রের পক্ষে পবিত্রতা চেষ্টাসাধ্য, অসম্ভব অলীক স্বপ্ন নয়।

মানুষ তার ভাগ্যস্রষ্টা এবং ভগবান নীরব দর্শকমাত্র, এমন কথাও কিন্তু ভগবদ্গীতায় নেই। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

অন্তর্যামী ভগবান সর্বজীবের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করে নিজ শক্তি দ্বারা তাদের পরিচালিত করেন।

মানুষ নিঃসন্দেহে স্বাধীন, কিন্তু সর্বকর্মনিয়ন্তা ভগবান তার হৃদ্দেশে অবস্থিত আছেন এ কথাও মিথ্যা নয়।

এই শ্লোকে কিন্তু মানুষের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা হয়নি। বলা হয়েছে—মানুষ নিঃসন্দেহে স্বাধীন, কিন্তু সর্বকর্মনিয়ন্তা ভগবান তার হৃদ্দেশে অবস্থিত আছেন, একথাও অস্বীকার করা যাবে না। এখানে প্রশ্ন উঠবে—হৃদ্দেশস্থিত ভগবানের কাজ কি? তিনি মানুষের স্বকৃত কর্মানুসারে তাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্দিষ্ট করে থাকেন। আবার প্রশ্ন করা যেতে পারে—মানুষের কর্ম যদি তার পূর্বকৃত কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে তার স্বাধীনতা কোথায়? এখানে ভুললে চলবে না যে, কর্মের ফল দুটি—একটি মুখ্য, আর একটি গৌণ। মুখ্য হচ্ছে—কর্মফল, আর গৌণ হচ্ছে সংস্কার। কর্মফল কর্মান্তে সুখ-দুঃখাকারে প্রকাশিত হয়। একে কেউ রোধ করতে পারে না। সংস্কার আমাদের চিত্তে পূর্বকৃত কর্মের পুনরাবৃত্তির বাসনা জাগ্রত করে। আমরা ইচ্ছা করলে এই বাসনা রোধ করতে পারি। সুতরাং কর্মের সংস্কার ব্যাপারে আমাদের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সুখ-দুঃখাকারে প্রকাশিত কর্মফলে আমাদের কোন হাত নেই। আবার এ কর্মফল আমাদেরই কৃতকর্মের ফল। সুতরাং এর ওপর প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষভাবে আমাদের একেবারেই হাত নেই—একথাও কিন্তু বলা চলে না।

জীবের যা কিছু করার স্বাধীনতা থাকতে পারে না।

সসীম মানুষ অসীম অনন্ত পুরুষের মত স্বাধীন—একথা গীতার কোথায়ও নেই। মানুষ যদি সর্বব্যাপারেই ভগবৎনির্দেশনিরপেক্ষ স্বাধীন হয়, তবে ভগবানকে সর্বশক্তিমান বলা যায় না। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক লাইব্‌নিজের মত আমাদের ভগবদ্গীতা এমন অশ্রদ্ধেয় মত পোষণ করেন না। জীব এবং শিব উভয়েই যদি সর্বক্ষম হয়, তবে তাদের পার্থক্য থাকে না। কিন্তু আমরা জানি জীব পার্থিব জীবাবস্থায় শিব নয়, শিব সর্বক্ষম, জীবের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

গীতায় বলা হয়েছে—ভগবান মানুষের হৃদ্দেশে অবস্থিত হয়ে তাকে চালিত করেন। সেইজন্য মানুষের স্বাধীনতা গীতায় খর্ব করা হয়েছে—এমন কথা বলা চলবে না। সংসারবদ্ধ সসীম জীবের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাকতে পারে না। কারণ, তার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা শোভনতা ও শালীনতার সীমার দ্বারা নির্দিষ্ট। যে স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ নয়, সে স্বাধীনতা ভয়ঙ্কর। বর্তমান সভ্যজগতে বিনাসর্তে স্বাধীনতা (Unconditional Freedom) বলতে কিছু নেই।

পৌরবিজ্ঞানের মূল নীতি—"নিয়ম-শৃঙ্খলা স্বাধীনতার সর্তস্বরূপ" (Law is the Condition of Liberty)। শাসন আছে বলেই স্বাধীনতা আছে। শাসনশূন্য স্বাধীনতা অর্থহীন প্রলাপমাত্র। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় রাষ্ট্র আইন করে স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে। এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতাই বর্তমান সভ্যজগতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শ। নৈতিক স্বাধীনতার বেলাতেই বা এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা আদর্শ হবে না কেন? রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার নিয়ন্তা রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফলেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সুন্দর ও শোভন হয়। নৈতিক স্বাধীনতার নিয়ন্তা মানুষের হৃদ্দেশস্থিত হৃষীকেশ। অন্তর্যামী অন্তর-পুরুষের নির্দেশেই নৈতিক স্বাধীনতা হয় সার্থক এবং পূর্ণ। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নির্ভুল এবং পক্ষপাতহীন হওয়া অসম্ভব না হলেও অস্বাভাবিক। দোষত্রুটিলেশশূন্য বিধাতার নির্দেশ নির্দোষ এবং পক্ষপাতহীন হওয়াই একমাত্র সম্ভব এবং স্বাভাবিক। সুতরাং আমাদের নৈতিক স্বাধীনতা অন্তর-পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ এবং সার্থক।

সার্থক স্বাধীনতা বলতে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা বোঝায় এবং মানুষের তা আছে।

ভগবদ্গীতায় ঈশ্বরের নির্দেশে পরিচালিত হওয়াকেই আখ্যা দেওয়া হয়েছে স্বাধীনতা। এ ঈশ্বর স্বর্গরাজ্যবাসী আমাদের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ভয়ঙ্কর ঈশ্বর নন। তিনি আমাদের অন্তরস্থিত প্রেমময় অন্তরপুরুষ। বাংলার অশিক্ষিত সাধক বাউলেরা এরই নাম দিয়েছেন—'মনের মানুষ'। তিনি জীবের ভিতরে শিব, নরের ভিতরে নারায়ণ এবং নারীর অন্তরে নারীশ্বরস্বরূপ। জীব স্বরূপতঃ শিবস্বভাব। ভোগ্যবস্তুর বন্ধনে বদ্ধ শিবই জীব। জীব যখন শিবের নির্দেশে চলে—তখন সে মুক্ত; যখন সে তার শিবসত্তা বিস্মৃত হয়ে ভোগাসক্ত হয়—তখন সে বদ্ধ। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কাণ্ট যখন যুক্তির নির্দেশে চালিত হওয়াকেই মুক্তি বলছেন—তখন যে তিনি ভিন্ন ভাষায় ভগবদ্গীতার আদর্শই ঘোষণা করছেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। ভগবদ্গীতা যাকে বলেছেন হৃদ্দেশস্থিত হৃষীকেশ, কাণ্ট তাকে বলেছেন—"যুক্তি", বাউলেরা বলছেন "মনের মানুষ", মহাত্মা গান্ধী বলছেন—"শুভবুদ্ধি" আর স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—"মানুষের দেবত্ব" (Divinity in man)। যে যে-ভাবেই বলুন না কেন—বক্তব্য তাঁদের এক, পার্থক্য শুধু কথায়। মানুষ যখন তার মনের মানুষটিকে জানে—নিজেকে তাঁর জন্য বিলিয়ে দেয়—তখন সে মুক্ত। সেখানে অন্ধকার নেই, দুঃখ নেই, বিচ্ছেদ নেই—কেবলই স্বাধীনতা, কেবলই শান্তি, কেবলই আলো।

ঈশ্বরের নির্দেশে পরিচালিত হওয়াই যথার্থ স্বাধীনতা। ঈশ্বর আমাদের বাইরের কেউ নন, তিনি আমাদের হৃদ্দেশস্থিত হৃষীকেশ।

ভারতীয় দর্শনে কর্ম, আত্মা, পুরুষার্থ এবং মোক্ষ

১। **কর্ম:** ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ একটি বিশিষ্ট মতবাদ এবং ভারতীয়দের জীবনে এই মতবাদের প্রভাব অপরিসীম। কর্মবাদের নিহিতার্থ 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। কৃতকর্মের ফল নষ্ট (কৃতপ্রণাশ) হয়না, আবার অকৃত কর্মের ফললাভও (অকৃতাভ্যুপগম) হয় না। কর্মবাদে কার্যকারণনীতি মানুষের কর্মের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। কার্যকারণনীতি অনুসারে কোন কার্যই কারণ ছাড়া হয় না। আবার একই কারণ থেকে একই কার্য হয়। কর্মবাদ অনুসারে জীবনের সুখ-দুঃখ কর্মেরই ফল। কর্ম কারণ, সুখ-দুঃখ তার কার্য। সুকর্মের ফল সুখ, আর দুষ্কর্মের ফল দুঃখ। এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। অর্থাৎ সুকর্ম থেকে দুঃখ এবং দুষ্কর্ম থেকে সুখ কখনই হতে পারে না।

তবে এই জীবনের সুখ এবং দুঃখ যে এই জীবনেরই সুকর্ম এবং দুষ্কর্মের ফল এমন কথা বলা যায় না। সীমিত জীবনে সব কর্মফল পাওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য ভারতীয় দার্শনিকেরা জন্মান্তর মানেন। পূর্ব জন্মে কৃত কর্মের ফল এই জন্মে লাভ করা যেতে পারে, আবার এই জন্মে কৃত কর্মের ফল পরজন্মে লাভ করা সম্ভব। তবে এমন কখনই হবে না যে, কোন কাজ করা হয়েছে, অথচ তার ফল পাওয়া যায়নি। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে কান্ট আত্মার অমরতা (immorality of soul) নৈতিক চেতনায় অবশ্যস্বীকার্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, নৈতিক আদর্শ একজীবনে রূপায়ণ সম্ভব নয়, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা সাপেক্ষ। সুতরাং নৈতিক আদর্শের বাস্তবতার জন্য জন্মান্তর মানা আবশ্যক। ভারতীয় দার্শনিকেরা বলেন, কর্মবাদের তাৎপর্য রক্ষার জন্য জন্মান্তর অবশ্যস্বীকার্য।

এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পরে,—প্রত্যেক কর্মই যদি পূর্ব কৃতকর্মের ফল হয়, তবে প্রথম কর্ম কবে আরম্ভ হল এবং তা কি পূর্ব কর্মজন্য নয়? এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় দার্শনিকেরা বলেন, কর্ম অনাদি। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মই পূর্ব কর্মজন্য এবং এই প্রক্রিয়া অনাদি। কর্ম অনাদি বলে প্রথম কর্মের প্রশ্ন উঠতে পারে না।

কর্মবাদ প্রত্যেক কর্মের ফল সুনিশ্চিত, এই মত প্রকাশ করে বলে একে একটি নৈতিক মতবাদ বলা যেতে পারে। এই মত অনুসারে সুকর্মের ফলে পুণ্য ও সুখ এবং দুষ্কর্মের ফলে পাপ ও দুঃখ। কর্মবাদের মধ্যে প্রথম যে বিশ্বাস নিহিত তা এই যে, পুণ্য পুরস্কৃত হবেই এবং পাপও অতিরস্কৃত থেকে যেতে পারে না। এই পৃথিবী একটি নৈতিক নিয়ম (moral order) মেনে চলে, এই বিশ্বাসও কর্মবাদের মধ্যে নিহিত। সেইজন্যই বলা হয় যে, কর্মবাদ শুধু ব্যক্তিমানুষের জীবন ও ভাগ্যই নিয়ন্ত্রিত করেনা, জড় জগতের শৃঙ্খলা এবং বিন্যাসও বিধান করে। অর্থাৎ জগতের প্রতিটি বস্তু কর্মের নিয়ম মানতে বাধ্য। 'ধর্মের জয় এবং অধর্মের ক্ষয়'—এই নীতিই বিশ্ব-সংসার নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুবিন্যাস এমনভাবেই হয়েছে যাতে কর্মের নিয়ম অব্যাহত ও অমোঘ থাকতে পারে।

আমেরিকার দার্শনিক উইলিয়াম জেমসের মতে 'অধ্যাত্মবাদ বলতে এক শাশ্বত নৈতিক নিয়মের স্বীকৃতি ও আশা পোষণ বোঝায়' (Spiritualism means the affirmation of an eternal moral order and letting loose of hope) ।[১] এই অর্থে অধ্যাত্মবাদ গ্রহণ করলে ভারতীয় কর্মবাদ অধ্যাত্মবাদ প্রকাশ করে, একথা বলতে হয়।

এক অমোঘ নৈতিক নিয়মে বিশ্বাস চার্বাক ভিন্ন সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকদের মজ্জাগত। তবে তাঁরা সকলেই নৈতিক নিয়মটিকে একই নামে অভিহিত করেন না। ঋগ্‌বেদের ঋষিরা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, মানবলোক, নক্ষত্রলোক, দেবলোক সর্বত্র ধর্ম ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী একটি অমোঘ নিয়মের কল্পনা করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন ঋত[২] অর্থাৎ সত্য। সত্য অনিবার্য ও অলঙ্ঘনীয়। ঋতও তা-ই। ঋত শুধু প্রকাশ্য আচরণেরই নিয়ামক নয়, অপ্রকাশ্যে ও কায়মনোবাক্যে যে আচরণ করা যায় তারও নিয়ামক। এই ঋতকে ফাঁকি দেবার কোন উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে বেদের যম ও যমীর আখ্যান' স্মরণীয়। যম ও যমী ভাই-বোন। তারা গোপনে ব্যভিচার করে ভেবেছিল এই পাপকর্মের সাক্ষী না থাকায় শাস্তি হবে না। কিন্তু ঋতের শাসন এড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। শাস্তি তাদের ঠিকই হয়েছিল।

পরবর্তীকালে এই অমোঘ নিয়মের ধারণাই পূর্ব মীমাংসা দর্শনে 'অপূর্ব' আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল। 'অপূর্বই' বর্তমানে অনুষ্ঠিত কোন যজ্ঞের প্রত্যাশিত ফল ভবিষ্যতে লাভ করা নিশ্চিত করে তোলে। বক্তব্য বুঝিয়ে বলা দরকার। শাস্ত্রে আছে—'অগ্নিহোত্রং যুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ (স্বর্গকামী ব্যক্তি অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করবে)। মনে করুন, আজ একজন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করলেন। এই যজ্ঞের প্রত্যাশিত ফল স্বর্গলাভ ত আজই হবে না। সেজন্য মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল—অতীতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফল যে ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা কোথায় ? পূর্বমীমাংসা দার্শনিকেরা এই নিশ্চয়তা নির্দেশের জন্যই 'অপূর্ব' স্বীকার করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলেই সেই যজ্ঞ-জন্য 'অপূর্ব' সৃষ্ট হয় এবং এই 'অপূর্ব'ই পরে প্রত্যাশিত ফল নিশ্চিতভাবে প্রদান করে। অপূর্ব অব্যর্থ ও অনিবার্য।

ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকেরা 'অদৃষ্ট' নামে যা স্বীকার করেন তা এই নিয়মেরই একটি বিশেষ প্রকাশ। যে কোন কাজ করলেই তার একটা প্রভাব অদৃশ্যাকারে বর্তমান থাকে। এরই নাম অদৃষ্ট (ন দৃষ্ট)। এই প্রভাব পরবর্তীকালে কৃতকর্মের ফল প্রদান করে। এর ব্যতিক্রম নেই।

চার্বাক ভিন্ন সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকই কর্মবাদ স্বীকার করেন। এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, কর্মফলের বাসনা ত্যাগ করে যদি কোন কাজ করা যায়, তবে সেই কর্ম এই নীতির আওতায় পড়ে না। শুষ্ক বীজ থেকে অঙ্কুর জন্মেনা, তেমনি নিষ্কাম কর্মজন্য ফলভোগ নেই। ফলভোগ শুধু সকাম কর্মেরই।

১। Wiliam James, Pragmatism ১০৬—১০৭ পৃষ্ঠা।

২। ঋগ্‌বেদ—১।১।৮, ১।২৩।৫, ১।২৪।৯, ১।১২৩।১৩

ব্যক্তি জীবনের সার্থকতা, ব্যর্থতা এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিচিত্র রকমের বিভিন্নতা আমরা কর্মবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি। একই পরিবারে একই রকম সুযোগ-সুবিধায় মানুষ দু-জন ব্যক্তি জীবনে সাফল্য ও সম্ভোগের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এমন অভিজ্ঞতা আমাদের হামেশাই হয়। পিতামাতার একজন সন্তান কৃতী, প্রতিষ্ঠিত ও সম্পন্ন, অন্যজন সবদিক থেকেই একেবারে ব্যর্থ, এরকমও ত প্রায়ই দেখা যায়। সমাজে কেহ ধনী, কেহ নির্ধন; কেহ পণ্ডিত, কেহ অপণ্ডিত; কেহ প্রতিষ্ঠিত কেহ অপ্রতিষ্ঠিত। এত সব বিভিন্নতার কারণ কি? এইজন্ম বা পূর্বজন্মকৃত কর্মফলেই এই পার্থক্য। এইজন্মে বা পূর্বজন্মে যে কাজই আমরা করে থাকি না কেন সেজন্য ফলভোগ আমাদের করতেই হবে। কখনও কখনও এমনও দেখা যায় যে, এই জন্মে খারাপ কাজ করেও একজন লোক সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করে, অথচ ধার্মিক নানাভাবে নিগৃহীত হয়। আমাদের মনে তখন কর্মবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় জাগে। আসলে এই ব্যাপার কর্মবাদ অপ্রমাণ না করে প্রমাণই করে থাকে। অধার্মিক যখন সুখে থাকে তখন বুঝতে হবে পূর্বজন্মের সুকর্মের ফল এখন সে ভোগ করছে, সমস্ত সুকর্মের ফলভোগ যখন তার শেষ হবে তখন এই জন্মের দুষ্কর্মের ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। ধার্মিকের লাঞ্ছনা তার পূর্বজন্মকৃত দুষ্কর্মের ফল। এই জন্মের ধর্ম-কর্মের ফল পূর্বজন্মকৃত কর্মফল ভোগের শেষ না হলে মিলবে না।

'কর্ম' বলতে নিয়ম এবং কর্মফলের সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত রাখে কর্মজাত এমন প্রভাব বা শক্তি দুইই বোঝায়। 'কর্ম' শব্দটিকে দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করে এর নানারকম শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। একটি নীতি অনুসারে কর্মকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়—অনারব্ধ এবং আরব্ধ বা প্রারব্ধ। অনারব্ধ কর্ম বলতে যে কর্ম এখনও তার ফল দিতে আরম্ভ করেনি তাকেই বোঝায়, আর আরব্ধ বা প্রারব্ধ কর্ম তা-ই যা ইতোমধ্যে ফল দিতে শুরু করেছে। অনারব্ধ কর্ম আবার দ্বিবিধ—প্রাক্তন বা সঞ্চিত এবং ক্রিয়মাণ বা সঞ্চীয়মান কর্ম এ জন্মেই কৃত ও সঞ্চিত।[১]

ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে কর্মের নিয়ম ঈশ্বর-নির্ভর ও নিয়ন্ত্রিত। ঈশ্বর কর্মের নিয়ম বা অদৃষ্ট অনুসরণেই জগৎ সৃষ্টি করেন। অদৃষ্ট জড় ও অচেতন। ফলে, চেতন কোন কিছুর নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন অদৃষ্টের পক্ষে যার যা প্রাপ্য তা দেওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্যই ঈশ্বর অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করে কর্মানুসারে জীবের সুখ-দুঃখ বিধান করেন। কিন্তু সাংখ্য, মীমাংসা, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শনে কর্মের নিয়ম সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করা হয়। এঁদের মতে কর্মের নিয়ম ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন নয়, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। এই সমস্ত দর্শনে জগতের উৎপত্তি ও বিন্যাস ঈশ্বর স্বীকার না করেই ব্যাখ্যা করা হয়।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নিষ্কাম কর্ম শুধু ফলভোগ শূন্যই নয়, কর্ম মুক্তিরও নিদান। সকাম কর্ম মানুষকে বাঁধে, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম মানুষকে কর্ম থেকে মুক্তি দেয়। কামনা-বাসনা-জাত সঞ্চিত কর্ম নিষ্কাম কর্মে বিনষ্ট হয়। মুক্ত পুরুষ

১। প্রকরণ পঞ্চিকা (চৌখাম্বা সং) ১৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মানুষের নানাবিধ মঙ্গল কর্মে ব্যাপৃত থাকতে পারেন, কিন্তু সেই কর্ম তাঁকে কখনই বদ্ধ করেনা। মুক্ত পুরুষের এই অবস্থাকে জীবন্মুক্তি বলে।

প্রখ্যাত দিনেমার দার্শনিক হফ্‌ডিং ধর্ম বলতে 'মূল্য সংরক্ষণে বিশ্বাস'[১] বুঝেছেন। কর্মবাদ মূল্য সংরক্ষণে বিশ্বাসই প্রকাশ করে। যার যার কর্মের মূল্য তার তার জন্যই সংরক্ষিত থাকে, এই ত কর্মবাদের বক্তব্য। এই কর্মবাদ বা মূল্যসংরক্ষণে বিশ্বাসই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ভিত্তি। এই বিশ্বাসের জন্যই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ধর্ম নামে পরিচিত। এমনিতে বৌদ্ধ ও জৈন প্রস্থানে ঈশ্বর স্বীকার করা হয়নি। সাধারণতঃ নিরীশ্বর ধর্ম হয় না বলেই লোকের বিশ্বাস।

অনেকে অভিযোগ এনেছেন, কর্মবাদ একান্তভাবেই মানুষকে দৈব-নির্ভর করে তোলে এবং তার স্বাধীন কর্মোদ্যোগ বা পুরুষকার নষ্ট করে দেয়। সেইজন্যই না-কি ভারতীয়েরা এমন কর্মবিমুখ অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠেছে। আমাদের ধারণা, অভিযোগ অজ্ঞতাপ্রসূত। আমাদের অদৃষ্ট ত আমাদেরই কর্ম-সৃষ্ট। আমরা ভাল কাজ করলে আমাদের অদৃষ্ট ভাল হবে, আর আমরা যদি কুকর্মে রত হই তবে আমাদের অদৃষ্ট মন্দ হবে। আমরাই আমাদের অদৃষ্ট বা ভাগ্য স্রষ্টা। সুতরাং অদৃষ্টবাদী হলেই লোকে কর্মবিমুখ হবে কেন? বরং অদৃষ্টবাদী শুভকর্মের শুভফল অবশ্যম্ভাবী জেনে নানাবিধ কল্যাণ কর্মে অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে আত্মনিয়োগ করবে। দৈব পূর্বজন্মকৃত কর্ম সঞ্জাত। নতুন এবং বিপরীত অভ্যাসের দ্বারা যেমন প্রাক্তন অভ্যাস পরিবর্তন করা যায়, তেমনই এই জীবনের শুভকর্মের দ্বারা দৈব অতিক্রম করা যায়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। মহাভারতের শান্তি পর্বে ভীষ্মদেব বলেছেন, 'পৌরুষম্ হি পরমং মন্যে, দৈবম্ নিশ্চিত্য মুহ্যতে' (আমি পৌরুষকেই সর্বোপরি বলে মনে করি, দৈব-বিশ্বাস মানুষকে মূঢ় করে)। ভগবদ্গীতা (১৮।১৪) কর্মে সাফল্যের জন্য দৈব ও পুরুষকার উভয়ই প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন। এই বাণীর ওপর নির্ভর করে অনেক ভারতীয় দার্শনিক বলেছেন, দৈব বা অদৃষ্ট কর্মফলের একটি কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। দৈব এবং পুরুষকার দুই মিলে কর্মফলের পর্যাপ্ত কারণ। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে (১।৩৪৯—৫১) এই মত একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, রথ যেমন এক চাকায় চলতে পারেনা, তেমনি দৈব পুরুষকারের সাহায্য ভিন্ন সফল হয় না।

অনেকে বলেন, কর্মবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করে। আমার সব কর্মই যদি পূর্বকর্ম নির্দিষ্ট হয়, তবে কর্ম করার ব্যাপারে আমার কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে না। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, স্বাধীনতা বলতে উচ্ছৃঙ্খলতা বোঝায় না। নীতিশাস্ত্রে স্বাধীনতা (moral freedoom) বলতে সাধারণতঃ আত্মনিয়ন্ত্রণ (self determination) বোঝায়। কর্মবাদ এই আত্মনিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে। আমি যদি আমার কর্মের দ্বারাই

১। 'The belief in the conservation of values'—Hoffding: The philosophy of Religion.

নিয়ন্ত্রিত হই, তবে আমিই ত আমার নিয়ন্ত্রক। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত। কাজেই কর্মবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতা অস্বীকার করে, একথা সমর্থনযোগ্য নয়।[১]

২। **আত্মা ঃ** ভারতীয় দার্শনিকেরা সকলেই আত্মা মানেন। তবে আত্মা বলতে কি বোঝায়, এই বিষয়ে সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক একমত নন। চার্বাকেরা চৈতন্যবিশিষ্ট দেহকেই আত্মা বলেছেন, জৈনেরা এই মত খণ্ডন করে আত্মাকে চেতন দ্রব্য বলে উল্লেখ করেছেন এবং আত্মাকে বলেছেন দেহপরিমাণ। বৌদ্ধেরা কোন স্থায়ী আত্মা মানেন না বটে, তবে তাঁরা পঞ্চস্কন্ধের সমাহাররূপ আত্মায় বিশ্বাসী। নৈয়ায়িকেরা চার্বাক, বৌদ্ধ প্রভৃতির মত খণ্ডন করে চৈতন্য গুণের আধার দ্রব্যকে আত্মা বলেছেন। তাঁদের মতে চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ। মীমাংসকেরা একটু রদবদল করে আত্মা সম্বন্ধে মুখ্যতঃ ন্যায় মতই গ্রহণ করেছেন। সাংখ্য দর্শনে চৈতন্য আত্মার গুণ নয়, স্বরূপ এবং আত্মার বহুত্ব স্বীকৃত। অদ্বৈতবেদান্তে চৈতন্যকে আত্মার স্বরূপ বলা হলেও আত্মার বহুত্ব স্বীকৃত নয়। বিশিষ্ট্যাদ্বৈত বেদান্তে চৈতন্য আত্মার নিত্য গুণ বলে স্বীকৃত। তবে এই মতে চৈতন্য আত্মার স্বরূপ নয়।

উপনিষদে চরম সত্তাকে কখনও আত্মা (ঐতরেয় ১।১, বৃহদারণ্যক ১।৪।১), কখনও ব্রহ্মণ (মুণ্ডক ২।১।১১, ছান্দোগ্য ৩।১৪।১) আবার কখনও শুধু সৎ (ছান্দোগ্য ৬।২।১) বলে অভিহিত করা হয়েছে। উপনিষদে আত্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞানকে পরাবিদ্যা বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলা হয়েছে। 'আত্মানং বিদ্ধি' (আত্মাকে জান), ঔপনিষদিক ঋষিদের সুস্পষ্ট নির্দেশ। আত্মাকে জানলেই সবকিছু জানা হবে, বলেছেন উপনিষদের ঋষি।[২] আত্মার পাঁচটি কোষ বা আবরণের কথা বলা হয়েছে—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এবং আনন্দময়। প্রথমতঃ আত্মাকে অন্নময় বা দেহের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে হয়। তারপর একটু চিন্তা করলে এই মত পরিত্যাগ করে বলতে হয়—প্রাণই আত্মা। আরও চিন্তার পর মনকেই আত্মা বলে মনে হয়। আরও চিন্তাশীল লোক বিজ্ঞানকে আত্মা বলেন। সবচেয়ে তীক্ষ্ণধী ও দূরদর্শী লোকেরা আত্মাকে আনন্দ বলে জানেন। উপনিষদের ঋষি বলেছেন, আত্মাকে আনন্দ বলে জানলে আর কোন ভয়ই থাকে না (আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন)। তিক্ষ্ণধী ভিন্ন কেউই বিভিন্ন আবরণে আবৃত আত্মার প্রকৃত পরিচয় জানেনা।[৩]

১। এই প্রসঙ্গে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁর Hindu view of life গ্রন্থে ৭৫ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন তা স্মরণীয়। তিনি বলেন, 'Man is not a mere mechanism of instincts. The sprirt in him can triumph over the automatic forces that try to enslave him. The Bhagavadgita asks us to raise the self by the self. We can use the material with which we are endowed to promote our ideals. The cards in the game of life are given to us. We do not select them. They are traced to our past karma, but we can call as we please, lead what suit we will and as we play, we gain or loose. And this is freedom."

২। বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬

৩। কঠ ৩।১২

আত্মার আনন্দের জন্যই আত্মার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুই আনন্দময়। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ী দেবীকে এই উপদেশ দিয়েছেন।[১] তিনি বলেন, 'আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি'। জীবন যে এত প্রিয় তারও কারণ এই আত্মার আনন্দ। আত্মায় আনন্দ আছে বলেই এ জগতে কেউ স্বেচ্ছায় মরতে চায় না।[২] আত্মোপলব্ধিই আনন্দোপলব্ধি। আমরা বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হই বলেই আনন্দ পাই না। মৃগ যেমন তার নিজেরই নাভিদেশে গন্ধের উৎস না জেনে বনে বনে গন্ধের উৎস খুঁজে ক্লান্ত হয়, আমরাও তেমনি আত্মার আনন্দ ফেলে সুখের নেশায় বিষয়ের পেছনে ছুটি। ফল—দুঃখ ও বন্ধন। বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে আত্মস্থ হতে পারলেই মুক্তির আনন্দ মিলবে।[৩]

(ক) চার্বাক মত ঃ চার্বাক মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা, চেতন দেহাতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই। দেহ পঙ্গু হলেই ত লোকে বলে, 'আমি পঙ্গু', দেহ রুগ্ন হলে বলে, 'আমি রুগ্ন।' এসব লোকব্যবহার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, 'দেহ' আর 'আমি' অভিন্ন। তার মানে দেহ ও আত্মা একই জিনিস। মানবদেহ চতুর্ভূতের সৃষ্টি। চৈতন্য মানবদেহেরই একটি গুণ। চতুর্ভূতের বিশেষ সমবায়ে যখন মানবদেহের উৎপত্তি হয় তখনই এই গুণেরও আবির্ভাব হয়। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই গুণ বিনষ্ট হয় এবং দেহ চতুর্ভূতে লীন হয়। মৃত্যুই জীবনের শেষ। আত্মার অমরতা বলে কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই যে, ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন উপাখ্যানে দেহকেই আত্মা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে উপনিষদে যাকে আত্মার অন্নময় কোষ বলা হয়েছে, চার্বাক মতে তাই আত্মা।

(খ) জৈন মত ঃ জৈনরা চেতন দেহ ও আত্মা অভিন্ন, এই চার্বাক মত খণ্ডন করেছেন। জৈন দার্শনিক গুণরত্নের খণ্ডনই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আমরা এখানে তাঁর মুখ্যযুক্তিগুলো উল্লেখ করছি।

যখন আমরা গোলাপ দেখি, তখন আসলে গোলাপী রঙই দেখি। গোলাপী রঙ দেখেই বলি গোলাপ দেখছি। অর্থাৎ গুণ প্রত্যক্ষ করলেই দ্রব্য-প্রত্যক্ষও হয়। আমরা সুখ, দুঃখ প্রভৃতি দেহভিন্ন আত্মার ধর্ম অনুভব করে বলি দেহভিন্ন আত্মা আছে। সুতরাং দেহভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষগ্রাহ্য।

দেহভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব অনুমানলভ্যও বটে। গাড়ির মত দেহ ইচ্ছা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। সুতরাং গাড়ির চালকের মত দেহেরও নিয়ন্তা আছে। আত্মাই এই নিয়ন্তা। চালক যেমন গাড়ি নয়, দেহও তেমনি আত্মা নয়। আবার বলা যায় যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলো যন্ত্রের মত। এদের পরিচালক যন্ত্রী চাই। আত্মাই এই যন্ত্রী। দেহ ত বিভিন্ন অণুর সৃষ্টি। অচেতন অণুদের একত্র করে কে? আত্মা। এরকম নানাভাবেই অনুমান করে দেহভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়।

১। বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬
২। তৈত্তিরীয় ২।৭
৩। কঠ ৬।১৪

চার্বাকেরা 'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ' প্রভৃতি যে সমস্ত বচনের ওপর নির্ভর করে চেতন দেহকেই আত্মা বলেছেন, সে সমস্ত বচন আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে চলবে না, এদের লক্ষ্যার্থ বা ব্যাঙ্গার্থই গ্রহণ করতে হবে। চেতন দেহ সম্বন্ধে অত্যন্ত আকৃষ্ট বলেই আত্মা কখনও কখনও চেতন দেহের সঙ্গে অভিন্নতার কথা ভাবে। যদি দেহ-ভিন্ন আত্মা বলে কিছু না থাকতো, তবে 'এই দেহে আত্মা নেই' এমন নঞর্থক বচন সম্পূর্ণ নিরর্থক হতো।

এই সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে জৈনেরা আত্মা দেহভিন্ন, এইমত প্রচার করেন। জৈনেরা 'আত্মা' শব্দটি ব্যবহার না করে 'জীব' শব্দটি গ্রহণ করেন। জৈন দর্শনের জীব অন্যান্য দর্শনের আত্মার সমার্থক। জৈনেরা চেতন দ্রব্যকেই জীব বলেন। চৈতন্য জীবের নিত্য ধর্ম। অবশ্য বিভিন্ন জীবে চৈতন্যের মাত্রাভেদ লক্ষণীয়। চৈতন্যের মাত্রাভেদ অনুসারে জীবনের ক্রমবিন্যাস সম্ভব। এই ক্রমবিন্যাসে যাঁরা সমস্ত কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সর্বজ্ঞ হয়েছেন, সেই মুক্ত জীবেরাই শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী এবং সর্বনিম্নে থাকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ বা উদ্ভিদ-দেহাশ্রয়ী জীব। কর্মের প্রতিবন্ধকতার জন্য এই সমস্ত নিম্নশ্রেণীর জীবদের চৈতন্য আচ্ছন্ন থাকে। অবশ্য এদের মধ্যে স্পর্শ-চৈতন্য বর্তমান। সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বনিকৃষ্ট জীবদের মাঝামাঝি দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয় এবং পঞ্চেন্দ্রিয় জীবের অস্তিত্ব, লক্ষণীয়। কৃমি, পিপীলিকা, ভ্রমর, মনুষ্য যথাক্রমে এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর জীব।

জৈন মতে জীব জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। জীব নিত্য, অপরিণামী। কিন্তু পর্যায় বা অবস্থার দিক থেকে এর পরিবর্তনও হয়। জীব স্বপ্রকাশ। প্রদীপ যেমন অন্যান্য বস্তুকে প্রকাশ করার সময় নিজেকেও প্রকাশ করে, জীবও তেমনি যেমন অন্যকে প্রকাশিত করে তেমনি নিজেকেও প্রকাশিত করে।

জৈনেরা বলেন, প্রাক্তন কর্মজনিত বাসনার জন্য জীব পরপর বিভিন্ন দেহ ধারণ করে। প্রদীপের মত জীব যে দেহ আশ্রয় করে সে দেহের সমস্ত অংশই আলোকিত বা সচেতন করে তোলে। যদিও জীবের কোন রূপ বা মূর্তি নেই, তবু প্রদীপের মত জীব যখন যে দেহ ধারণ করে তখন তার রূপ বা মূর্তি গ্রহণ করে। অর্থাৎ, জীব দেহানুপাতী।

শঙ্করাচার্য শারীরক ভাষ্যে জীব সম্বন্ধে জৈনমত তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। 'এবঞ্চাত্মাহকার্ৎস্ন্যম্', 'নচপর্য্যায়াদপ্যবিরোধোবিকারাদিভ্যঃ' এবং 'অন্ত্যাবস্থিতেশ্চো-ভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ' এই তিনটি সূত্রের ভাষ্যে জৈনমত খণ্ডিত হয়েছে।

(গ) **বৌদ্ধ মত**: সাধারণতঃ আমরা মনে করি, আমাদের বিভিন্ন সময়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতা একই অপরিবর্তিত সত্তায় বর্তমান। এই সত্তাকে সাধারণতঃ আত্মা নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, দৈহিক শত পরিবর্তনের মধ্যেও এই আত্মা অপরিবর্তিত থাকে, জন্মের পূর্বে এবং মৃত্যুর পরেও এর স্থিতি এবং দেহ থেকে দেহান্তরে এর গতি। বুদ্ধদেব তাঁর প্রতীত্য সমুৎপাদ এবং অনিত্যবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এরকম আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, সবই ত সর্তাধীন এবং অনিত্য, সুতরাং অপরিবর্তিত আত্মা বলে কিছু থাকতে পারে না।

তবে লোকেরা যাকে আত্মা বলেন তা আসলে কি? বুদ্ধদেব বলেন, আত্মা কায়, মনস বা চিত্ত এবং বিজ্ঞানের সংঘাত বা সমাহার। কখনও কখনও আত্মাকে নাম-রূপের সংঘাত বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে রূপ, দেহ বা কায়ের বা কায়ার সমার্থক এবং নাম মানসিক উপাদানের দ্যোতক। আরও গভীরতর বিশ্লেষণের ফলে জানা গেছে যে, আত্মা পঞ্চস্কন্ধ বা উপাদানের সংঘাত বা সমাহার। (১) রূপ (দেহ), (২) বেদনা (সুখ-দুঃখ প্রভৃতির অনুভূতি), (৩) সংজ্ঞা (প্রত্যক্ষ), (৪) সংস্কার এবং (৫) বিজ্ঞান (চৈতন্য)—এই পঞ্চস্কন্ধ। এদের মধ্যে একমাত্র রূপই বাহ্যিক, বাদবাকী আর সবই মানসিক। সুতরাং বোঝা গেল যে, বুদ্ধদেবের মতে আত্মা 'দেহ মন'-এর সংঘাত। বুদ্ধদেবের এই মতবাদের নামই নৈরাত্ম্যবাদ। একে নৈরাত্ম্যবাদ বলার কারণ এই যে, সাধারণ অর্থে গৃহীত আত্মা (অর্থাৎ আত্মা একটি অপরিবর্তিত সত্তা) এই মতবাদে অস্বীকৃত হয়েছে। নঞর্থকভাবে এই মতবাদ নৈরাত্ম্যবাদ হলেও সদর্থকভাবে একে সংঘাতবাদ বা সমাহারবাদ বলা যেতে পারে। কারণ, এই মতবাদে কেবলমাত্র সাধারণ অর্থে গৃহীত আত্মা অস্বীকৃতই হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে আত্মা যে পঞ্চস্কন্ধের সংঘাত বা সমাহার তাও স্বীকৃত হয়েছে। আত্মা সম্বন্ধে অনেকাংশে সদৃশ মতবাদ পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ডেভিড হিউম প্রচার করেছেন।

বৌদ্ধেরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী। একটি দীপশিখা থেকে যেমন অন্য আর একটি দীপশিখা প্রজ্বলিত করা সম্ভব, তার থেকে অন্য একটি, আবার তার থেকে অন্য আর একটি এবং এমনি করে যেমন একই দীপশিখা দীর্ঘস্থায়ী না হলেও শিখা-ধারা নিরবচ্ছিন্ন হতে পারে, তেমনই বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করেন যে, একই জীবন দীর্ঘস্থায়ী না হলেও জীবন-ধারা অবিচ্ছিন্ন হতে পারে। অর্থাৎ, এই জীবন থেকে পরজীবন সৃষ্টি হতে পারে, তার থেকে পরজীবন, তার থেকে পরজীবন এবং এমনি করে আত্মার অনিত্যতা সত্ত্বেও জীবন-ধারার অবিচ্ছিন্নতা বেশ বোঝা যায়। জীবন-ধারার অবিচ্ছিন্নতাই জন্মান্তরের কারণ। সুতরাং বৌদ্ধেরা বলে, আত্মা অনিত্য হলেও জন্মান্তর সম্ভব।

সাধারণতঃ আত্মা বলতে যে স্থায়ী সত্তা বোঝায় বৌদ্ধেরা তা স্বীকার করেন না বলে আত্মা সম্বন্ধে বৌদ্ধ মতকে নৈরাত্ম্যবাদ বলা হয়।

(ঘ) **ন্যায়মত ঃ** নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা একটি দ্রব্য বিশেষ। চৈতন্য তার একটি আগন্তুক গুণ। আত্মা যখন দেহের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয় যখন বিষয় সংশ্লিষ্ট হয় তখনই চৈতন্যগুণ আত্মায় আবির্ভূত হয়ে থাকে। আত্মা যখন দেহমুক্ত হয় তখন তাতে চৈতন্যগুণ থাকে না। বিভিন্ন দেহের বিভিন্ন আত্মা, কারণ এদের অভিজ্ঞতা এক নয়, বরং ভিন্ন। আত্মা নিত্য ও অমর। আত্মা দেশ-কালের দ্বারা সীমিত নয়। সুতরাং তাকে বিভু বলা যেতে পারে।[১]

আত্মা ও দেহ অভিন্ন হতেই পারে না। আত্মা চেতন, দেহ অচেতন। চেতন ও অচেতন কি কখনও এক হতে পারে? বাহ্যেন্দ্রিয় স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তা প্রভৃতির

১। ন্যায়ভাষ্য ১।১।১০, পদার্থধর্ম সংগ্রহ ৩০ পৃষ্ঠার পাদটীকা, তর্কভাষা ১৮-১৯ পৃষ্ঠা।

কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না। সুতরাং বাহ্যেন্দ্রিয় আত্মা নয়। অন্তরিন্দ্রিয় বা মনও আত্মা হতে পারে না। ন্যায়বৈশেষিক মতে মন অণু পরিমাণ, সুতরাং প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। তা হলে সুখ, দুঃখ, প্রভৃতি তথাকথিত মানসিক অবস্থাও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হবে না। কিন্তু সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা ত আমাদের হামেশাই হয়। বৌদ্ধদের মত আত্মাকে জ্ঞানপ্রবাহ মনে করলে স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞার কোন ব্যাখ্যা মেলে না। অপরিবর্তিত আত্মা বলে যদি কিছু না থাকে, তা হলে পূর্বপ্রত্যক্ষীকৃত বস্তুর স্মরণ হবে কি করে? অথবা পূর্বে যে জিনিস জেনেছি তা আবার দেখলে তাকে পূর্বজ্ঞাত বলে (প্রত্যভিজ্ঞা) চিনবো কি করে? সুতরাং আত্মা সম্বন্ধে বৌদ্ধমত গ্রাহ্য নয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন, অদ্বৈতবেদান্তীদের অবিষয় ও অবিষয়ী চৈতন্যস্বরূপ আত্মাও অবোধ্য ব্যাপার। কোন বিষয়ী এবং বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে চৈতন্য কি করে থাকতে পারে, তা বোঝা যায় না। চৈতন্য সব সময়েই কোন না কোন জ্ঞাতার (বিষয়ীর) কোন না কোন বিষয় সম্বন্ধে চৈতন্য। অধিষ্ঠান বা আধার ছাড়া চৈতন্য থাকতে পারে না। সেইজন্যই নৈয়ায়িকেরা আত্মা বলতে চৈতন্যগুণবিশিষ্ট একটি দ্রব্য বোঝেন। আত্মা জ্ঞাতা, অহংবোধের আশ্রয় এবং ভোক্তা।[১]

এখানে প্রশ্ন উঠবে—দেহ, মন ও বাহ্যেন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন জীবাত্মার অস্তিত্ব আমরা জানি কি করে? কোন কোন প্রাচীন নৈয়ায়িক বলেন,[২] প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে আত্মার জ্ঞান হয় না। এঁদের মতে আত্মার অস্তিত্ব হয় শাস্ত্র প্রমাণ থেকে নয়ত রাগ, দ্বেষ, সুখ-দুঃখের অনুভূতি বা জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুমান করে জানা যায়। নব্যনৈয়ায়িকেরা বলেন মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যেই আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়। অবশ্য কেউ যদি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে বা এই বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে তবে প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা যে ভাবে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করে প্রমাণ করেছেন সেইরূপই করতে হবে।

(ঙ) **মীমাংসা মত:** আত্মা সম্বন্ধে মীমাংসকেরা মুখ্যতঃ ন্যায়মতই গ্রহণ করেছেন। নৈয়ায়িকদের মতই মীমাংসকেরা বলেন, আত্মা নিত্য এবং অসীম দ্রব্য বিশেষ। যে দেহে আত্মা অবস্থান করে তা মিথ্যা বা মায়া নয়, সত্য। চৈতন্য আত্মার স্বরূপ নয়, আগন্তুক গুণ। বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হলেই আত্মায় চৈতন্যগুণের আবির্ভাব হয়, নইলে আত্মায় চৈতন্য থাকে না। সুষুপ্তি এবং মুক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হয়না বলে আত্মা চৈতন্যহীন। যত ব্যক্তি তত আত্মা। ভাট্ট মীমাংসকেরা সুষুপ্তিকালে আত্মায় চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু চৈতন্যশক্তি বা জ্ঞানশক্তি বা জ্ঞানের সম্ভাবনার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকেরা সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মায় জ্ঞানের সম্ভাবনাও স্বীকার করেন না। সুষুপ্তিতে আত্মায় আনন্দ থাকে এ অদ্বৈত মত ভাট্টেরা মানেন না।

ভাট্টমতে আত্মা কর্তা ও ভোক্তা। এ বিষয়ে ন্যায়মতের সঙ্গে ভাট্টমতের কোন তফাৎ নেই। নৈয়ায়িকেরা আত্মার পরিবর্তন (স্পন্দ) বা আকার পরিবর্তন (পরিণাম)

১। ভাষা পরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলী ৪৮-৫০ পৃঃ।

২। ন্যায়ভাষ্য ১।১।৯-১০

কিছুই স্বীকার করেন না। কিন্তু ভাট্ট মীমাংসকেরা আত্মার স্পন্দ স্বীকার না করলেও পরিণাম স্বীকার করেন।[১]

আত্মা কি করে জানা যায়, এ বিষয়ে প্রভাকর ও ভাট্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ আছে। ভাট্ট সম্প্রদায় মতে যখনই কোন বিষয় জ্ঞাত হয়, তখনই জ্ঞাতা আত্মাকে জানা যায় না, তবে পরে জানা যায়। যখনই আমরা আত্মা সম্বন্ধে চিন্তা করি, তখনই অহং প্রত্যয়ের বিষয় হিসেবে আত্মা জ্ঞাত হয়। ভাট্টমতে আত্মা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুইই এক সঙ্গে হতে পারে। কিন্তু প্রাভাকার সম্প্রদায় এইমত স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, একই খাদ্য যেমন পাচক এবং পাচ্য হতে পারে না, তেমনই আত্মা একই সঙ্গে জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। তবে আমরা যখন কোন বিষয় জানি তখন বিষয়, বিষয়ের জ্ঞান এবং বিষয়ের জ্ঞাতা আত্মা একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। আমি যখন ঘট জানি, তখন এই জ্ঞানের কর্তা হিসেবে আমার আত্মা প্রকাশিত, প্রত্যেক জ্ঞানেই আত্মা যদি প্রকাশিত না হত, তবে আমার জ্ঞান এবং অন্যের জ্ঞানের পার্থক্য করা যেত না।

(চ) **সাংখ্য মত ঃ** সাংখ্য মতে আত্মাকে পুরুষ বলা হয়। আত্মা বা পুরুষ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি থেকে স্বতন্ত্র। আত্মা জ্ঞাতা, জ্ঞানের বিষয় নয়। আত্মা চৈতন্য স্বরূপ। চৈতন্য আত্মার অপরিহার্য বা আগন্তুক কোন গুণ নয়, চৈতন্যই আত্মা বা চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। অদ্বৈতবেদান্তীরা আত্মাকে চিদানন্দ স্বরূপ বলেছেন। সাংখ্য কর্তারা বলেন, চৈতন্য এবং আনন্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন, এরা কখনই একই আত্মায় এক সঙ্গে থাকতে পারে না। আত্মা চিদ্‌স্বরূপ জ্ঞাতা, কিন্তু আনন্দস্বরূপ নয়। জ্ঞানের বিষয় অনিত্য। কিন্তু আত্মা নিত্য। আত্মা কর্তা নয়। আত্মা অজ, নিত্য, রাগ-বিরাগহীন এবং বিষয় লালসা মুক্ত। পরিবর্তন, কর্তৃত্ব, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সমস্তই দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের। আমরা অজ্ঞানজন্য আত্মাকে দেহ, মন বা ইন্দ্রিয় বলে ভুল করি এবং একে পরিবর্তনশীল, কর্তা এবং সুখ-দুঃখের অধীন বলে মনে করি।

পরিবর্তন, কর্তৃত্ব, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির উর্ধ্বস্থিত পুরুষের অস্তিত্ব সাংখ্যকারেরা অনুমান করে প্রমাণ করেন ; অনুমানটি নিম্নরূপ—[৩]

সঙ্ঘাত-পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥

(১) এই জগতে ঘট, পট প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু অনেক বস্তুর সঙ্ঘাত বা সম্মিলনে সৃষ্টি হয়, সেগুলো নিজেদের বা পরস্পরের কোন প্রয়োজন সাধন করে না। এগুলো কোন চেতন ভোক্তা পুরুষের ভোগ্য বিষয়রূপে ব্যবহৃত হয়। এই চেতন ভোক্তাই পুরুষ বা আত্মা। সুতরাং বলা যায় যে, সঙ্ঘাত বস্তুর অস্তিত্ব থেকে পুরুষের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় (২) সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ। এদের বিপরীত ধর্মী কেউ

১। শবর ভাষ্য ৭০৭ পৃঃ।
২। প্রকরণ পঞ্চিকা ১৪৮ পৃঃ।
৩। সাংখ্যকারিকা ১৭।

আছেন, একথা মানতে হয়। নইলে এদের অর্থ থাকে না। এই বিপরীত ধর্মীই পুরুষ বা আত্মা। (৩) কোন চেতন অধিষ্ঠাতা ব্যতীত জড়বর্গ চালিত হতে পারে না। এই চেতন অধিষ্ঠাতাই পুরুষ। (৪) ভোক্তা ব্যতীত ভোগ্য বস্তুর সমাবেশ হয় না। এই দুনিয়ার ভোগ্যবস্তুর ভোক্তাই পুরুষ। (৫) জীব সংসারে ত্রিগুণের বন্ধন হতে মোক্ষলাভের চেষ্টা করে। যিনি ত্রিগুণের দ্বারা বদ্ধ মনে করে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেন, তিনিই পুরুষ বা আত্মা।

সাংখ্য মতে পুরুষ এক নয়, বহু। পুরুষ-বহুত্বের প্রমাণ নিম্নরূপ—[১]

জন্মমরণকরণাণাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষ বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য বিপর্য্যয়াচ্চৈব॥

সব জীবের এক সঙ্গে জন্ম, মৃত্যু বা ইন্দ্রিয়বৈকল্য দেখা যায় না। সকলের একসঙ্গে ধর্মাদিতে প্রবৃত্তি হয় না। আরও দেখা যায় কেহ বা সত্ত্বপ্রধান, কেহ বা রজঃ প্রধান, কেহ বা তমোপ্রধান। সুতরাং পুরুষের বহুত্ব প্রমাণিত হয়।

(ছ) **বেদান্তমত ঃ** অদ্বৈতবেদান্ত মতে আত্মা জ্ঞাতা, ভোক্তা বা কর্তা নয়। আত্মা চৈতন্য ও আনন্দ স্বরূপ। আত্মাই একমাত্র সৎ। সাংখ্যকারেরা যে আত্মার বহুত্ব স্বীকার করেছেন, তা অযৌক্তিক। জন্ম, মৃত্যু বা ইন্দ্রিয়বৈকল্য আত্মার হয় না, দেহের হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ আত্মার গুণ নয়, দেহের গুণ। আত্মা কর্তা নয় বলে তার প্রবৃত্তির প্রশ্ন ওঠেনা। সুতরাং সাংখ্যকর্তারা যে সমস্ত যুক্তি দিয়ে আত্মার বহুত্ব প্রমাণ করেছেন, তাতে আত্মার বহুত্ব প্রমাণিত হয় না। অদ্বৈতমতে আত্মা এক। আত্মা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। অজ্ঞানজন্য জীব এই স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং অনাত্মা দেহের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে। ফলে, দেহের জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক সবই নিজের বা আত্মার বলে মনে হয়। এরই নাম বন্ধন। আত্মাই ব্রহ্ম। জীব মুক্ত হলে তার ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করে। উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' বাক্যে 'তৎ' (ব্রহ্ম) এবং 'ত্বম্' (জীবাত্মা)-এর স্বরূপগত অভেদ প্রকাশিত হয়। ব্রহ্ম ও জীবাত্মা উভয়ই চৈতন্য-স্বভাব বলে অভিন্ন।

রামানুজ আত্মা সম্বন্ধে এই অদ্বৈত মত গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন, জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন শুধু চৈতন্য বলে কিছু থাকতে পারে না। চৈতন্য সব সময়ই কোন না কোন লোকের কোন না কোন বিষয়ে চৈতন্য। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ নয়। চৈতন্য আত্মার নিত্য গুণ, সর্বাবস্থাতেই আত্মার চৈতন্যগুণ থাকে। রামানুজ এই প্রসঙ্গে বলেন, চৈতন্য আত্মার কোন আগন্তুক গুণ নয়। নৈয়ায়িকেরা আত্মার চৈতন্য-গুণ আত্মার সঙ্গে দেহের সংযোগের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন। রামানুজ এই মত মানেন না। তাঁর মতে চৈতন্য ধর্মভূত জ্ঞান। সুষুপ্তিতে এমন কি মুক্ত অবস্থাতেও আত্মা 'অহম্' রূপে প্রতিভাত হয়। রামানুজের মতে আত্মা এবং অহম্ সমার্থক (স্বরূপেন এব অহমর্থঃ আত্মা, মুক্তৌ অপি অহমর্থঃ প্রকাশতে)।

১। সাংখ্যকারিকা ১৮

রামানুজ-মতে—আত্মা নিত্য এবং ব্রহ্মের চিদংশ। উপনিষদ-কথিত আত্মার সর্বব্যাপিতা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে চলবে না। আত্মা সর্বব্যাপী বলতে আত্মা এমনই সূক্ষ্ম যে, ইহা যে কোন অচেতন পদার্থে প্রবেশক্ষম, বুঝতে হবে[১]। রামানুজের মতে আত্মা অনুপরিমাণ।

রামানুজ বলেন, উপনিষদে পরমাত্মা ও জীবাত্মার যে অভেদের কথা বলা হয়েছে, তা একান্ত অভেদ নয়, বিশিষ্ট অভেদ। সসীম জীবাত্মা কি অসীম পরমাত্মার সঙ্গে একান্ত অভিন্ন হতে পারে ? জীবাত্মা পরমাত্মা বা ব্রহ্মের চিদংশ। অংশ ও অংশী কখনই এক হতে পারে না। তবে অংশের যেমন অংশী থেকে, গুণের যেমন দ্রব্য থেকে, দেহের যেমন আত্মা থেকে অপৃথকসিদ্ধি সম্ভব নয়, তেমনি জীবাত্মার পরমাত্মা বা ব্রহ্ম থেকে অপৃথকসিদ্ধি অসম্ভব। রামানুজ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সম্বন্ধকে অপৃথকসিদ্ধি নামে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও বলেন, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিসের অভেদের কথা বলার কোন অর্থ হয় না; আবার দুটি সম্পূর্ণ অভিন্ন জিনিসের অভেদের কথা বলারও কোন প্রয়োজন হয় না। একই জিনিসের দুটি ভিন্ন রূপের অভেদের কথাই সঙ্গত ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই সেই দেবদত্ত—এই বাক্যে একই দেবদত্তের বিভিন্ন সময়ের আবির্ভাব যে একই ব্যক্তির আবির্ভাব, একথাই বোঝান হয়েছে। উপনিষদের বাক্য 'তত্ত্বমসি' (সেই ব্রহ্মই তুমি) এই ভাবেই বুঝতে হবে। তৎ বলতে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, বিশ্বের স্রষ্টা ব্রহ্ম এবং ত্বম্ বলতে অচিৎবিশিষ্ট জীব-শরীরক ব্রহ্ম বোঝায়। সুতরাং তৎ ও ত্বম্-এর অভেদ আসলে কতকগুলো গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম এবং অন্য কতকগুলো গুণ বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অভেদ। অর্থাৎ, বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট একই দ্রব্যের অভেদ বা বিশিষ্ট ঐক্য বোঝায়। রামানুজ-দর্শন এই জন্যই বিশিষ্টাদ্বৈত বা বিশিষ্টের অদ্বৈত বা অভেদ নামে পরিচিত।[২]

ভারতীয় দর্শনে আত্মা সম্বন্ধে যে সমস্ত বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আমরা তা আলোচনা করলাম। এই প্রসঙ্গে চার্বাক মত দেহই আত্মা, জৈন মত আত্মা দেহ পরিমাণ, বৌদ্ধমত আত্মা পঞ্চস্কন্ধের সমাহার এবং সাংখ্য মতে আত্মার বহুত্ব যথাস্থানে খণ্ডিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—আত্মার সঙ্গে চৈতন্যের সম্বন্ধ কি ? ন্যায় এবং মীমাংসা মতে চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ, জৈন এবং রামানুজ মতে চৈতন্য আত্মার নিত্য গুণ, কিন্তু সাংখ্য ও অদ্বৈতমতে চৈতন্য আত্মার কোন গুণ নয়, চৈতন্যই আত্মা। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয়, চৈতন্য আত্মার আগন্তুক বা নিত্য কোন গুণই হতে পারেনা, চৈতন্যই আত্মা, এই মতই যুক্তিগ্রাহ্য। চৈতন্য যদি আত্মার আগন্তুক বা নিত্য কোন গুণ হয়, তবে চৈতন্য ও আত্মার মধ্যে একটি সমন্ধের কথা চিন্তা করতে হয়। সম্বন্ধের জন্য আবার একটি সম্বন্ধ এবং তার জন্য আবার একটি সম্বন্ধ স্বীকার করারও আবশ্যক হয় এবং এইভাবে অনবস্থা দোষ দেখা দেয়। অবশ্য চৈতন্য ও

১। শ্রীভাষ্য ১।১।১
২। শ্রীভাষ্য ১।১।১

আত্মার সম্বন্ধ স্বরূপ সম্বন্ধ বললে এই দোষ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু তা হলে চৈতন্যকে আত্মার স্বরূপ বলতে হয়, আত্মার গুণ বলা যায় না অর্থাৎ অদ্বৈত মতই প্রতিষ্ঠিত হয়। সাংখ্যকর্তারা আত্মাকে চৈতন্য স্বরূপ বলেও আত্মার বহুত্ব স্বীকার করেছেন। আমরা তাঁদের যুক্তি আলোচনা করে পূর্বেই খণ্ডন করেছি। সুতরাং আত্মা এক এই অদ্বৈত মতও প্রতিষ্ঠিত হল। এখন প্রশ্ন হবে—চৈতন্য ত সব সময়েই কোন না কোন জ্ঞাতার কোন না কোন বিষয় সম্বন্ধে চৈতন্য। অদ্বৈতবাদীরা জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়-বিমুক্ত যে চৈতন্যের কথা বলেছেন তার আভাষ কি কখন পাওয়া যায়? এই প্রসঙ্গে অদ্বৈত-বক্তব্য এই যে, সুষুপ্তিকালে আমরা এইরকম চৈতন্যের আভাষ পাই এবং সাধক তুরীয় অভিজ্ঞতায় এই চৈতন্যের পরিপূর্ণ উপলব্ধিলাভ করেন। সুষুপ্তিকালে কোন সাধারণ বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, অথচ চৈতন্য থাকে। চৈতন্য যে থাকে তার প্রমাণ সুষুপ্তি থেকে উত্থিত ব্যক্তি 'আমি খুব অনন্দে ঘুমিয়েছি, কিছুই টের পাইনি' এইরূপ যে উক্তি করে তার থেকেই বোঝা যায়। সুষুপ্তিকালে চৈতন্য না থাকলে একথা বলা যেত না। সুষুপ্তিকালে অনুভূত আনন্দ বিষয়জন্য হতে পারে না, কারণ সেখানে সাধারণ কোন বিষয়ই থাকে না। এই আনন্দ ও চৈতন্য একই। অদ্বৈতবাদীরা আরও বলেন, চৈতন্যই একমাত্র সৎ। কারণ, আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় চৈতন্য-ভিন্ন আর সব কিছুই বাধিত। যা বাধিত হয় তা সত্য নয়। যা অবাধিত তা ই সৎ বা সত্য। চৈতন্যই একমাত্র অবাধিত বলে চৈতন্যই একমাত্র সৎ। সুতরাং ওপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, আত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

৩। **পুরুষার্থ:** ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে পুরুষার্থের ধারণা একটি বিশিষ্টস্থান অধিকার করে আছে। ভারতীয় সমস্ত বিদ্যাই পুরুষার্থের ধারণার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। আমরা এখানে পুরুষার্থ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবো।

'পুরুষার্থ' শব্দটি 'পুরুষের অন্বিষ্ট বা কাম্য' এই অর্থ প্রকাশ করে। পুরুষ যা সচেতনভাবে অন্বেষণ করে বা কামনা করে তারই নাম পুরুষার্থ। মানুষ সচেতনভাবে তার আদর্শ স্থির করতে পারে এবং আদর্শ রূপায়ণের জন্য সাধনা করতে পারে। এই জন্যই 'পুরুষার্থ' শব্দটিতে 'পুরুষ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'অর্থ' শব্দটির দ্বারা এমন আদর্শ বোঝান হয়েছে যা বর্তমানে বাস্তব নয় বটে, কিন্তু অনুসরণ করার যোগ্য বা বাস্তবে রূপায়ণের উপযুক্ত। 'অর্থ' কথাটি অনুসরণের সঙ্গে যুক্ত বলে এখানে পুরুষের পক্ষে সচেতন সাধনার ইঙ্গিত বর্তমান। পুরুষার্থকে সাধ্য বলা হয়। সাধনা করে যা লভ্য তাই সাধ্য। পুরুষার্থ পুরুষের সাধনলভ্য। যা সাধন লভ্য তা মূল্যবান। এইজন্য পুরুষার্থকে মূল্যবান বলা হয়। মূল্য দ্বিবিধ—গৌণ এবং মুখ্য। ধন আনন্দদায়ক বস্তু ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মূল্যবান। ধনের নিজস্ব কোন মূল্য নেই। ধনের মূল্য গৌণ মূল্য। কিন্তু যে আনন্দ দেয় তার মূল্য গৌণ নয়, মুখ্য। কারণ, আনন্দ আনন্দ বলেই আমাদের কাছে মূল্যবান। সুতরাং আমরা 'পুরুষার্থ'

কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, যে উদ্দেশ্য বা আদর্শ মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ মূল্যবান মনে করে আমরা সচেতনভাবে অনুসরণ করি এবং সিদ্ধ করতে চেষ্টা করি তা-ই পুরুষার্থ।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পুরুষার্থ সাধ্য, কিন্তু এখনও সিদ্ধ নয়। এমন কথা অনেক ভারতীয় দার্শনিকই বলেন। কিন্তু আবার এমন অনেক দার্শনকই আছেন যাঁরা বলেন বস্তুতঃ সিদ্ধ জিনিসও ব্যক্তিবিশেষের কাছে সাধ্য হতে পারে। যেমন, কোন গচ্ছিত ধন মাটির নিচে যদি থাকে তবে মাটির আবরণ উন্মোচন করলেই তা পাওয়া যায়। এইক্ষেত্রে গচ্ছিত ধন বস্তুতঃই পূর্ব থেকে ছিল বলে তা সিদ্ধ। তবে ব্যক্তিবিশেষের কাছে তা মাটির আবরণের জন্য লভ্য ছিল না। যখন মাটির আবরণরূপ প্রতিবন্ধক অপসৃত হল তখন গচ্ছিত ধন লাভ হল। সুতরাং এই দিক থেকে বস্তুতঃ সিদ্ধ গচ্ছিত ধন ব্যক্তিবিশেষের কাছে সাধ্যই ত বটে। সুতরাং সিদ্ধ বস্তুও সাধ্য হতে পারে। এখানে কর্মের দ্বারা সিদ্ধ বস্তু সাধ্য হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারাও সিদ্ধ বস্তু সাধ্য হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি গামছা কাঁধে রেখে সমস্ত বাড়ি গামছা খুঁজে বেড়ায় এবং কেউ যদি তাকে পরে বলে বা নিজেই হঠাৎ উপলব্ধি করে যে গামছা ত কাঁধেই আছে, তবে সিদ্ধ গামছাই তার কাছে সাধ্য বলে মনে হয়। এখানে কর্মের দ্বারা সিদ্ধ বস্তু সাধ্য হয়নি, সাধ্য হয়েছে জ্ঞানের দ্বারা। তা যা-ই হোক না কেন, এখানেও সিদ্ধ বস্তুই সাধ্য হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, অসিদ্ধ বস্তুই শুধু সাধ্য নয়, সিদ্ধ বস্তুও সাধ্য হতে পারে এবং এই দুই প্রকার সাধ্য বস্তুই পুরুষার্থ।

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে চারিটি পুরুষার্থ স্বীকৃত। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ। ভারতীয়দের মতে অর্থ ও কাম উভয়ই পুরুষার্থ যেমন ধর্ম ও মোক্ষ পুরুষার্থ। তবে অর্থ ও কাম ধর্মের জন্যই পুরুষার্থ এবং এই অর্থে অর্থ ও কাম গৌণ পুরুষার্থ এবং ধর্ম মুখ্য পুরুষার্থ। কোন কোন ভারতীয় দার্শনিক (প্রাচীন মীমাংসা) এই ত্রিবর্গ স্বীকার করেন এবং মোক্ষ বলে কোন পুরুষার্থ মানেন না। তবে অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকই মোক্ষ মানেন এবং মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ বলে বলে গ্রহণ করেন। কারও কারও কাছে ধর্মই মুখ্য বা পরম পুরুষার্থ এবং অর্থ ও কাম গৌণ পুরুষার্থ। কিন্তু অধিকাংশের কাছেই ধর্মও গৌণ পুরুষার্থ, মোক্ষই মুখ্য পুরুষার্থ।

'ধর্ম' শব্দটি ভারতীয় চিন্তায় খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। আমরা ইংরেজীতে যাকে 'religion' বলি তা 'ধর্ম' শব্দের সমার্থক নয়। যা ধারণ করে তা-ই ধর্ম। ধর্ম যখন পুরুষার্থ তখন তা পুরুষ বা মানুষকে ধারণ করে। অর্থাৎ, যার জন্য মানুষ মানুষ তা-ই ধর্ম। অনেকে বলেন, ধর্ম শব্দের অর্থ নীতি (Ethics) এবং তা নিয়ম (Law) ও বোঝায়। ঋগ্‌বেদে 'ঋত'-কে ধর্ম বলা হয়েছে। 'ঋত' অমোঘ নৈতিক নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারে যেমন ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তেমনি আবার বহির্বিশ্বও নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের মনে হয়, যা ধারণ করে, নীতি, নিয়ম প্রভৃতি

যে সমস্ত অর্থ 'ধর্ম' শব্দের করা হয় তা পরস্পর অসংযুক্ত নয়, বরং ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমাদের মনে হয়, মানুষকে যা ধারণ করে তা ত আসলে নীতি। কারণ, নীতিই ত মানুষের মনুষ্যত্বের নিয়ামক। নীতির জন্যই ত মানুষ পশু নয়। আবার নীতি ত নিয়মের মধ্যেই প্রকাশিত। সুতরাং ধর্ম বলতে যদি নীতির নিয়ম বোঝান হয়, তবে বোধহয় অসঙ্গত কিছু বলা হয় না। এই অর্থে ধর্মাচরণ বলতে নীতির নিয়ম মানা বোঝাবে। কারও কারও মতে এই নিয়ম বেদনির্দিষ্ট। বেদে যা কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট তা-ই ধর্ম। আবার কেউ কেউ বলেন, বেদে যা কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট তা ত ধর্ম বটেই, তবে ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজকেরা যাকে ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন তাও ধর্ম। যেমন, আমরা গার্হস্থ্য ধর্মের কথা বলি। প্রতিটি গৃহস্থকেই প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হয়। যথা, দেবযজ্ঞ—দেবতার উপাসনা ও ভজনা, বেদনির্দিষ্ট যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, পিতৃযজ্ঞ—পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ, ঋষিযজ্ঞ—বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থপাঠ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ—মানুষ ও মনুষ্যেতর জীবের সেবা, দান, হাসপাতাল, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা। এই সবই ধর্ম। এই ধর্মাচরণের জন্য অর্থ প্রয়োজন। সুতরাং অর্থও পুরুষার্থ তবে তা ধর্মের জন্য বলে গৌণ পুরুষার্থ। অর্থোপার্জন আমাদের দেশে নিন্দনীয় নয়। তবে অর্থ ধর্মোপায়ে বা নৈতিক পথে অর্জিত হতে হবে এবং তা ধর্মের জন্যই ব্যয় করতে হবে। অন্যায় পথে অর্থোপার্জন এবং অন্যায় কর্মে অর্থব্যয়, দুইই আমাদের দেশে নিন্দনীয়। ধর্মাচারণের জন্য কামেরও আবশ্যকতা আছে। কারণ, জীব না থাকলে ধর্মাচরণ করবে কে? আর জীবসৃষ্টির জন্য কামের প্রয়োজন সুস্পষ্ট। তবে কামের জন্য কামাচরণ আমাদের দেশে নিন্দনীয়। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' বলে আমাদের যে শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে তার নিহিতার্থ, পুত্রোৎপাদনের জন্যই স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ, অন্যথা অবৈধ, এমন করলে কি অসঙ্গত হবে? আমাদের দেশে স্ত্রীকে ভোগ সামগ্রী বলে মনে করা হয় না। স্ত্রী সহধর্মিণী। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী ধর্মাচরণে সহায়তা করবেন, এটাই অভিপ্রেত। সংসার করাও আমাদের দেশে ধর্মাচরণ নামে খ্যাত। 'সংসারধর্ম' কথাটি ত বহু প্রচলিত।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অর্থ ও কাম আমাদের দেশে পুরুষার্থ বলে স্বীকৃত বটে, কিন্তু অর্থোপার্জন এবং কামাচরণ উভয়ই ধর্মাচরণের জন্যই পুরুষার্থ এমন কথাও সুস্পষ্টভাবে আমাদের দেশে বলা হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, অর্থ ও কাম গৌণ পুরুষার্থ এবং ধর্মই মুখ্য পুরুষার্থ। আমাদের দেশে ধর্ম বলতে সমগ্র জীবন বোঝায়। জীবন-চর্যাই ধর্ম-চর্যা। ধর্মই জীবনের মুখ্য জিনিস। তবে জীবনধর্মের জন্যই অর্থ ও কাম প্রয়োজন বলে তারাও পুরুষার্থ।

অর্থ ও কামের সঙ্গে তুলনায় ধর্ম মুখ্য পুরুষার্থ হলেও আমাদের দেশে সাধারণতঃ ধর্মই পরম পুরুষার্থ, এমন কথা স্বীকৃত নয়। চার্বাকেরা অর্থ ও কামকেই পরম পুরুষার্থ বলেছেন। প্রাচীন মীমাংসকদের মতে ধর্মই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু অন্য সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকদের মতে মোক্ষই পরম পুরুষার্থ এবং এই দিক থেকে ধর্ম মোক্ষের

জন্যই প্রয়োজনীয় বলে পুরুষার্থ। এই দৃষ্টিতে মোক্ষই মুখ্য পুরুষার্থ, ধর্ম মোক্ষের তুলনায় গৌণ পুরুষার্থ। ভগবদ্গীতায় সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ হয়ে যিনি সর্বকর্মফল পরিত্যাগ করে ধর্মাচরণ করেন, তিনি শান্তি বা মোক্ষ লাভ করেন।[১] আরও বলা হয়েছে যে, যাঁরা কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম বা ধর্মাচরণ করেন, তাঁরা আত্মশুদ্ধি লাভ করে মোক্ষলাভের উপযুক্ত হন।[২]

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, চার্বাক এবং প্রাচীন মীমাংসক ভিন্ন সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকেরাই বলেন, মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। মোক্ষলাভই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে মোক্ষাভিলাষীর জীবন ধর্মভিত্তিক হবে এবং ধর্মের জন্য অর্থ এবং কামেরও প্রয়োজন আছে। ভারতীয় জীবনবোধ অধ্যাত্মবোধমূলক। আমাদের ঐহিক জীবন অধ্যাত্ম জীবনের সোপান বলে ভারতবর্ষে গৃহীত হয়েছে। অধ্যাত্ম জীবনকে বাদ দিয়ে যে ঐহিক জীবন তা আমাদের দেশে নিন্দনীয়।

সাধারণ মানুষের জন্য ভারতবর্ষে এইভাবেই পুরুষার্থের বিধান দেওয়া হয়েছে। তবে কেউ কেউ রুচি ও প্রবণতা অনুসারে সংসারে বিবিক্ত হতে পারেন। তাঁদের আমাদের দেশে সন্ন্যাসী বলা হয়। সন্ন্যাসীদের জন্য একমাত্র মোক্ষই পুরুষার্থ। তাঁদের অর্থ, কাম, ও ধর্মের প্রয়োজন নেই। তবে সকলের জন্য এই বিধান নয়।

যাঁরা মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলেন তাঁরা সকলেই মোক্ষ বলতে সর্ববিধ দুঃখনাশ বোঝেন। তবে বৈদান্তিক ও জৈন দার্শনিকেরা মুক্ত অবস্থাকে আনন্দ ও পরিপূর্ণতার অবস্থা বলেও উল্লেখ করেছেন। সকল দার্শনিকের মতেই তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হলে মুক্তি হয়। এই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কারও কারও মতে কর্ম ও ভক্তিরও প্রয়োজন। আবার কেউ কেউ শুদ্ধ জ্ঞানেই মুক্তি হয়, এমন কথাও বলেছেন। অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, মুক্ত অবস্থা নিত্য সিদ্ধ অবস্থা; কারণ, আত্ম নিত্য মুক্ত। তবে নিত্য সিদ্ধ হলেও আমাদের অজ্ঞানের জন্য আমরা তা উপলব্ধি করি না। আত্মজ্ঞান হলে অজ্ঞান থাকে না, তখন নিত্য মুক্ত আত্মা স্বরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই মতে মোক্ষলাভ সিদ্ধ বস্তুরই সাধন। তবে অন্যান্য অনেক দার্শনিকের মতে মোক্ষ অবস্থা একটি নতুন অবস্থা। বৌদ্ধ, জৈন, অদ্বৈতবেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে জীবন্মুক্তি বা জীবিত অবস্থায় মুক্তিও সম্ভব বলে মনে করা হয়, তবে ন্যায়-বৈশেষিক, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি দর্শনে একমাত্র বিদেহ মুক্তি বা মৃত্যুর পর মুক্তি স্বীকৃত। জীবন্মুক্ত অবস্থায় জীব জনকল্যাণ-

---

১। যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।—ভগবদ্গীতা, পঞ্চম অধ্যায়, ১২নং শ্লোক।

২। যোগিনঃ কর্মকুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।—ভগবদ্গীতা, পঞ্চম অধ্যায়, ১১নং শ্লোক।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ ভারতীয় চিন্তায় পুরুষার্থ প্রসঙ্গে 'The Hindu view of life' গ্রন্থে বলেছেন—'Moksa is spiritual realisation. The Hindu Dharma says, Man does not live by bread alone, nor by his work, capital, ambition or power or relations to external nature. He lives or must live by his life of spirit. Moksa is self-emancipation, the fulfilment of the spirit in us in the heart of the eternal. This is what gives ultimate satisfaction, and all other activities are directed to the realisation of this end. (The Hindu view of life) ৮১ পৃষ্ঠা।

কর্মে নিযুক্ত থাকেন। নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের জন্য তাঁর পুনরায় বন্ধনের সম্ভাবনা থাকে না। আচার্য শঙ্কর, বুদ্ধদেব প্রভৃতিকে জীবন্মুক্ত পুরুষের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায়। বৌদ্ধধর্মের প্লাবন থেকে সনাতন ধর্মের রক্ষা এবং বিভিন্ন মঠ-প্রতিষ্ঠা আচার্য শঙ্করের স্মরণীয় কীর্তি। করুণাঘন বুদ্ধদেব কাতর প্রাণীর ত্রাণের পথ-নির্দেশের জন্যই বুদ্ধত্ব লাভের পরও জীবন ধারণ করেছিলেন। এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতীয় চিন্তায় পরম পুরুষার্থ শুধু একটি সুন্দর আদর্শ মাত্র নয়, তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব এবং কারও কারও মতে এই জীবনেও তা করা যায়। সাংখ্য দার্শনিকেরা বলেন, এই বিশ্বপ্রকৃতি পুরুষের কৈবল্য বা মুক্তির শুধু সহায়ক নয়, এই বিশ্বপ্রকৃতির অবস্থান পুরুষের কৈবল্য বা মুক্তির জন্যই (পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য। পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তংকৃতঃ সর্গঃ—সাংখ্যকারিকা ২১)।

মোক্ষ ঃ আমরা এইমাত্র বলেছি যে, অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকের মতে মোক্ষই পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষলাভই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য। অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিক দর্শনালোচনা করার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেছেন, মোক্ষলাভের জন্যই দর্শনচর্চা। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতীয় জীবন ও মননের ক্ষেত্রে মোক্ষের স্থান অদ্বিতীয়।

মোক্ষ হলে আর জন্ম হয় না এবং জন্মজনিত সমস্ত দুঃখের নাশ হয়, এই বিষয়ে মোক্ষবাদীরা একমত। জৈন এবং বৈদান্তিক দার্শনিকেরা মোক্ষ অবস্থাকে আনন্দ ও পরিপূর্ণতার অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন বৌদ্ধাচার্যের মতেও নির্বাণ অনন্ত আনন্দের অবস্থা। আচার্য নাগসেন গ্রীকরাজ মিলিন্দকে নির্বাণের প্রকৃতি বোঝাবার জন্য বলেছেন, 'নির্বাণ সাগরের মত গভীর, পর্বত শৃঙ্গের মত উচ্চ, মধুর মত মিষ্ট···।[১] তবে এই মত অধিকাংশ বৌদ্ধাচার্য সমর্থিত নয়। তাঁদের মতে নির্বাণ পুনর্জন্মরোধ এবং দুঃখনাশ বোঝায়।

তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান থেকে মুক্তি হয়। এই জ্ঞানের জন্য চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা যোগাভ্যাস প্রয়োজন। আত্মসংযম অভ্যাস করলে তবে তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকার অর্জন করা যায়। কোন কোন দার্শনিকের মতে তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের জন্য ঈশ্বরের কৃপা আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিতে তাঁর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলে তবে তাঁর কৃপা হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে তবেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ সম্ভব। আবার কেউ কেউ বলেন, বিষয়বৈরাগ্য লাভের পর শুদ্ধজ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি লভ্য। সাধারণভাবে বলা যায় যে, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগ মোক্ষলাভের উপায়। তবে এই সমস্ত উপায়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মানুষ রুচি ও প্রবণতা অনুসারে যে কোন পথ অবলম্বন করেই মুক্তি লাভ করতে পারে এবং বস্তুতঃ বিভিন্ন সাধক বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে সিদ্ধি লাভও করেছেন। আমরা এই প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

---

১ মিলিন্দ পঞ্হ দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধ, সাংখ্য, অদ্বৈতবেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে জীবন্মুক্তি বা জীবিত অবস্থায় মুক্তিলাভ সম্ভব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বুদ্ধদেব, আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি মোক্ষলাভের পর পরার্থে বা লোকহিতের জন্য জীবন ধারণ করেছিলেন। তবে ন্যায়-বৈশেষিক, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি দর্শনে জীবন্মুক্তি স্বীকৃত নয়। তাঁদের মতে মুক্তি বলতেই বিদেহ মুক্তি বা মৃত্যুর পর মুক্তি বোঝায়।

(বিভিন্ন দর্শনে মোক্ষ-সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা বিভিন্ন দর্শন-সম্প্রদায়ের বিস্তৃত আলোচনায় দ্রষ্টব্য।)

পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষলাভের বিভিন্ন উপায়—
জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি

পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষ লাভের জন্য ভারতীয় দর্শনে মুখ্যতঃ তিনটি উপায়ের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি, এই তিনটি উপায়। এদের যোগও বলা হয়। ফলে, আমরা ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান-যোগ, কর্ম-যোগ এবং ভক্তি-যোগ—এই তিনটি যোগের কথা পাই। এদের ছাড়া আর একটি যোগের কথাও ভারতীয়েরা বলেন। তার নাম রাজযোগ। রাজযোগ অনুসারে যোগ সাধনায় মুক্তি লাভ হয়। এই মতে যোগসাধনা মুক্তিলাভের উপায়। আমরা এখানে মোক্ষলাভের তিনটি পথ—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি নিয়েই শুধু আলোচনা করব।

আমরা জগতে রুচি এবং প্রকৃতি অনুসারে মানুষের মধ্যে ভেদ লক্ষ্য করি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই চিন্তা, অনুভূতি এবং সঙ্কল্প কমবেশী দেখতে পাওয়া যায়। তবে কারও মধ্যে চিন্তার প্রাধান্য, কারও মধ্যে অনুভূতির প্রাধান্য, আবার কারও মধ্যে সঙ্কল্পের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যাদের মধ্যে চিন্তার প্রাধান্য, তাদের প্রকৃতি মননশীল, জ্ঞানে তাদের রুচি। যাদের মধ্যে অনুভূতির প্রাধান্য, তাদের প্রকৃতি আবেগ প্রবণ এবং রুচি প্রেম ও ভক্তিতে। আর যারা সঙ্কল্পপ্রধান তারা কর্মীপ্রকৃতির লোক এবং তাদের রুচি কর্মে।

মানুষের রুচি ও প্রকৃতিভেদে যেমন তাদের পার্থক্য থাকে তেমনি তাদের রুচি ও প্রকৃতিভেদ অনুযায়ী অধিকারভেদ হয়। মননশীল ও জ্ঞানে রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকার জ্ঞানে। সে জ্ঞানের পথে আনন্দ পায় এবং এই পথেই সহজে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। আবেগপ্রবণ ব্যক্তিরা তাদের রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী ভক্তিপথের অধিকারী। এই পথেই তারা সহজে চলতে পারে। আর যারা কর্মী-লোক, তাদের অধিকার কর্মে। কর্মপথই তাদের মুক্তির পথ।

ভারতীয় সাধনায় মানুষের রুচি ও প্রকৃতিভেদে জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তিপথ অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মানুষ স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে অগ্রসর হলে সহজে সিদ্ধিলাভ করে। সেজন্যই ভারতীয় সাধকেরা মোক্ষলাভের জন্য স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে মানুষকে জ্ঞান, কর্ম বা ভক্তিপথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। সমস্ত নদীই যেমন সমুদ্রে পৌঁছায়, তেমনি সমস্ত সাধনপথই সাধককে সিদ্ধির সিংহদ্বারে

পৌঁছে দেয়। ভগবদ্‌গীতায় সুস্পষ্টভাবেই জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির অবিরোধ প্রদর্শিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ যোগৈরপি গম্যতে। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি (৫।৫)। জ্ঞানিগণ যে স্থান প্রাপ্ত হন, কর্মযোগীরাও সেই স্থানই লাভ করেন। যিনি জ্ঞান ও কর্মকে অভিন্ন বলে দর্শন করেন, তিনি সম্যগ্‌দর্শী। আবার শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ। সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান (১২।১১)। আর যদি এও না পার তবে সংযতচিত্ত হয়ে আমার ভক্তিযোগ আশ্রয়পূর্বক সকল কর্মের ফল ত্যাগ কর। তাতেও মুক্তিলাভ হবে। অর্থাৎ তিনি বলতে চান এই যে, জ্ঞানে ও কর্মে যেমন মোক্ষ লাভ হবে, ভক্তিতেও তেমনি হবে।

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির অবিরোধ প্রদর্শনের জন্য গীতায় আরও বলা হয়েছে যে, নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করলে আত্মশুদ্ধি হয় এবং আত্মশুদ্ধি হলেই শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন। সুতরাং জ্ঞানলাভ করতে হলে শ্রদ্ধাবান ও ভক্তিমান হতে হবে, আবার নিষ্কাম কর্ম করে আত্মশুদ্ধ না হলেও জ্ঞান হবে না। সুতরাং জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই, বরং এদের অবিরোধই লক্ষণীয়।[১]

জৈন দর্শনে সম্যক দর্শন (সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা), সম্যক জ্ঞান (জীব এবং অজীব সম্বন্ধে সংশয়, ভ্রম ও অনিশ্চয়তা মুক্তজ্ঞান) এবং সম্যক চারিত্র (যা কিছু কল্যাণকর তা করা এবং যা কিছু ক্ষতিকর তা না করা) মোক্ষলাভের পথ বলে স্বীকৃত। 'তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র'-এর সর্বপ্রথম সূত্রে উমাস্বামী বলেছেন—'সম্যগ্‌দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ'। সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক চারিত্র জৈনদর্শনে ত্রিরত্ন নামে খ্যাত। মুক্তি এই ত্রিরত্নের যুগ্মফল। আমরা সম্যক দর্শন বলতে ভক্তি, সম্যক জ্ঞান বলতে জ্ঞান এবং সম্যক চারিত্র বলতে কর্ম বুঝতে পারি। সুতরাং জৈনমতে মোক্ষ, ভক্তি বা জ্ঞান বা কর্মপথে লভ্য নয়, বরং জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমুচ্চয় লভ্য।

বৌদ্ধদর্শনে নির্বাণলাভের উপায়রূপে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলা হয়েছে। অষ্টাঙ্গিক মার্গের তাৎপর্য যদি ভাল করে বোঝা যায়, তবে স্বীকার করতেই হবে যে, এই আটটি নীতির নিহিতার্থ প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি। 'চত্বারি আর্য্য সত্যানি' সম্বন্ধে সমস্ত রকমের সন্দেহমুক্ত নিষ্কম্প জ্ঞানের নাম প্রজ্ঞা। সম্যগসঙ্কল্প, সম্যগবাক্‌, সম্যক কর্মান্ত, সম্যগআজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতিলাভই সত্যিকারের শীল-অর্জন, 'চত্বারি আর্য্য সত্যানি'তে তদ্‌গত-চিত্ত ধ্যানই সমাধি। এই আলোচনায় প্রজ্ঞা ও সমাধিকে জ্ঞান এবং শীলকে কর্ম বলে মনে করা যায়। সুতরাং বৌদ্ধমতে নির্বাণের জন্য জ্ঞান ও কর্ম

১। গীতার চতুর্থ অধ্যায়স্থিত ৩৯ নং শ্লোক 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামী 'সুবোধিনী' টীকায় বলেছেন—'শ্রদ্ধাদি সম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক কর্মযোগ এব শুদ্ধ্যার্থমনুষ্ঠেয়ঃ। জ্ঞানলাভান্তরন্তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কর্তব্যমিত্যাহ জ্ঞানং লব্ধা তু অচিরেণ পরাং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি'। অর্থাৎ শ্রদ্ধাদি সম্পত্তি দ্বারা জ্ঞানলাভের পূর্বে আত্মশুদ্ধির জন্য কর্মযোগই অনুষ্ঠেয়। জ্ঞানলাভের পর কর্মযোগের কোন আবশ্যকতা নেই, সেইজন্যই গীতা বলেছেন সাধক জ্ঞানলাভ করে অচিরে পরাশান্তি বা মোক্ষলাভ করেন।

আবশ্যক ; কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে আদি বৌদ্ধধর্ম নীরব। তবে পরবর্তীকালে মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা বুদ্ধ-ভক্তি নির্বাণ লাভের উপায়ের অঙ্গীভূত করেছিলেন।

ন্যায়দর্শনে মুক্তিলাভের জন্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। আত্মা এবং অন্যান্য প্রমেয় সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। মুমুক্ষুব্যক্তিকে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য সর্বপ্রথম শাস্ত্রের নির্দেশ শ্রবণ করতে হয়। তারপর মনন করে শাস্ত্রের নির্দেশের যৌক্তিকতা নির্ণয় করা দরকার এবং সর্বশেষে কোন সাধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মায় নিবিষ্টচিত্ত হওয়া বা আত্মার নিদিধ্যাসন করা আবশ্যক। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মুমুক্ষুকে যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভে সাহায্য করে। নিদিধ্যাসন করতে করতে সাধক আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন। এই দর্শনে মুক্তি লাভের জন্য তত্ত্বজ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে তত্ত্বজ্ঞান যোগাভ্যাস ভিন্ন লভ্য নয়, তাও বলা হয়েছে।

সাংখ্যযোগদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতি যে ভিন্ন, এই জ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান কৈবল্য লাভের উপায় বলে স্বীকৃত। সাংখ্যকারিকায় পুরুষ ও প্রকৃতি যে ভিন্ন, এই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন বা ধ্যানের কথা বলা হয়েছে।[১] যোগদর্শনে সমাধিলাভের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। যোগসাধনায় বৈরাগ্য বা বিবেকজ্ঞান লাভ হলেই মুক্তি হয়।

প্রাচীন মীমাংসা দর্শনে মোক্ষের কথা নেই। সেখানে ধর্মই পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকৃত। কিন্তু পরবর্তীকালের মীমাংসাদর্শনে মোক্ষের কথা পাওয়া যায়।[২] এই দর্শনে জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই মুক্তির জন্য আবশ্যক বলে এই মতবাদকে জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়বাদ বলা হয়। এই মতানুসারে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করলে, প্রতিসিদ্ধ কর্ম না করলে এবং আত্মার প্রকৃতি যথার্থভাবে উপলব্ধি করলে মোক্ষ হয়। এখানে কর্ম বলতে মুখ্যতঃ বৈদিক কর্ম বোঝায়।

বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতমতে কর্ম মোক্ষের সাধন নয়। কর্ম পুরুষ-প্রযত্নের অধীন, কিন্তু মোক্ষ নিত্য সিদ্ধ বস্তু। কর্মের ফল অভ্যুদয় এবং তা অনিত্য। কিন্তু মোক্ষ নিত্য। সুতরাং কর্মজন্য মোক্ষ হতে পারে না। 'তত্ত্বমসি' বাক্যজন্য নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ আত্মার আবরক অজ্ঞান দূর করে এবং ফলে আত্মা আবরণমুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।

'তত্ত্বমসি' বাক্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে গিয়ে শ্রবণ করতে হয়। পরে এই ব্যাপারে অসম্ভাবনা দূর করার জন্য এবং সম্ভাবনা নিশ্চয়ের জন্য মনন করা আবশ্যক। সর্বশেষে এই তত্ত্বে গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়ে ধ্যানমগ্ন হলে বা এই তত্ত্বের নিদিধ্যাসন করতে থাকলে 'সোঽহম্' এই অপরোক্ষানুভূতি লাভ করা যায়। এরই নাম মুক্তি।

অদ্বৈত মতে কর্ম যেমন মুক্তির সাধন বলে স্বীকৃত নয়, তেমনি ভক্তিও মুক্তির সাধন নয়। ভক্তি ভগবান ও ভক্তের মধ্যে ভেদজ্ঞানের ভিত্তিতে সম্ভব। অদ্বৈত মতে সমস্ত প্রকার ভেদ মিথ্যা ; একমাত্র অদ্বৈত আত্মতত্ত্বই সত্য। সুতরাং ভক্তি

১। সাংখ্যকারিকা—৬৪

২। প্রকরণ পঞ্চিকা, শাস্ত্র দীপিকা, মানমেয়োদয় প্রভৃতি মীমাংসা গ্রন্থে মোক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

ভেদরূপ মিথ্যাজ্ঞানভিত্তিক বলে তা সত্যজ্ঞান লাভ বা মোক্ষের উপায় হতে পারে না। অদ্বৈতমতে শুদ্ধজ্ঞানই বন্ধন-মুক্তির কারণ।

রামানুজ অদ্বৈতমত গ্রহণ করেন না। তাঁর মতে মুক্তি কর্ম এবং জ্ঞানের ফল। জ্ঞান বলতে তিনি ধ্যান, উপাসনা বা ভক্তি বোঝেন।[১] বর্ণাশ্রম অনুসারে বেদ বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে যে সমস্ত যাগ-যজ্ঞ কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন তা উদ্‌যাপন করাই রামানুজের মতে কর্ম। সমস্ত ফলবাসনা পরিত্যাগ করে এই সমস্ত কর্ম করাই প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। নিষ্কামভাবে কর্তব্য করলে জ্ঞানলাভের পথে অন্তরায় অতীত কর্মের সঞ্চিত ফল নষ্ট হয়। যথাযথভাবে যাগযজ্ঞ উদ্‌যাপনের জন্য মীমাংসাদর্শন আলোচনা করা দরকার। সেইজন্য রামানুজ মীমাংসা-দর্শন-পাঠ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পক্ষে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছেন। মীমাংসা দর্শন পাঠ করে যাগযজ্ঞ করার পর এরা যে মুক্তি দিতে পারে না, এ বোধ জাগ্রত হয়। তখন মুমুক্ষু বেদান্ত পাঠ করেন এবং জানতে পারেন যে, তাঁর আত্মা ঈশ্বরের অংশমাত্র। তিনি আরও বোঝেন, শুধু বেদান্ত-পাঠ থেকে মুক্তি হয় না, ঈশ্বরের কৃপা হলেই মুক্তি হয়। ঈশ্বরের নিত্যধ্যান এবং উপাসনা করলে ঈশ্বর জীবের প্রতি তুষ্ট হয়ে তাঁকে সম্যগ্‌জ্ঞান প্রদান করেন। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন, ঈশ্বর তাঁকে কৃপা করে দুঃখবন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। রামানুজ-দর্শনে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকে আর্ত-প্রপত্তি বলে। রামানুজ ভাগবত এবং অন্যান্য ঈশ্বরবাদী বেদান্তীদের মত মুখ্যতঃ ভক্তিবাদী।

আমরা মোক্ষলাভের তিনটি পথ—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি স্বীকারের যুক্তি, এদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং দর্শনে এদের স্থান নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির প্রকৃতি আলোচনা করে এই অধ্যায়ের উপসংহার করবো।

জ্ঞান : ভারতীয় সাধনায় আত্মশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। আত্মশুদ্ধি না হলে আত্মজ্ঞান হয় না। মলিন আরসিতে যেমন প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয় না, তেমনি মলিন চিত্তে আত্মার সুস্পষ্ট জ্ঞান সম্ভব নয়। সমস্ত ফলবাসনা পরিত্যাগ করে কর্তব্যবোধে কর্ম করলে বা সমদমাদি-সাধন-সম্পদের অধিকারী হলে, অর্থাৎ, যথার্থতঃ বৈরাগ্যের উদয় হলে আত্মশুদ্ধি হয়। শুদ্ধাত্মা ব্যক্তিই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন। বৈরাগ্য এবং জ্ঞান আধ্যাত্মিক উর্ধ্বগতির সহায়ক দুটি পক্ষ বলে স্বীকৃত।

আচার্য শঙ্কর নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক (কোন্‌টা নিত্য আর কোন্‌টা অনিত্য তার বোধ), ইহা মুত্রার্থফলভোগবিরাগ (এই জগৎ ও পরজগতের সর্বকর্মফল ত্যাগ), সমদমাদি-সাধন-সম্পদ (ইন্দ্রিয় সংযম এবং সন্তোষ প্রভৃতি সদগুণের অধিকার লাভ) এবং সর্বশেষে মুমুক্ষুত্ব (মুক্তির জন্য ঐকান্তিকতা) আত্যন্তিক জ্ঞানের জন্য অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা এই সাধন চতুষ্টয়কে বৈরাগ্যের অঙ্গীভূত করতে পারি। যাঁর নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক জন্মেছে, যিনি সর্বকর্মফল পরিত্যাগ করেছেন, যিনি ইন্দ্রিয় সংযত করে সন্তোষ প্রভৃতি গুণ অর্জন করেছেন এবং যিনি

১। "অতো...ধ্যানোপাসনাদি বাচ্যম্ জ্ঞানম্", "উপাসনা পর্যায়ত্বা ভক্তিশব্দস্য"—শ্রীভাষ্য-১।১।১

মুক্তিলাভের জন্য ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করেছেন, তিনি যে সংসার বিরাগী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, শঙ্করের মতে বৈরাগ্যলাভের পরই আত্যন্তিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব, এ মত শুধু শঙ্করের মত নয়, সমস্ত জ্ঞানবাদীরাই এই মত পোষণ করেন।

জ্ঞান বলতে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এবং সর্বশেষে তত্ত্বসাক্ষাৎকার বোঝায়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমতঃ তত্ত্বের প্রকৃতি শাস্ত্র বা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে জানতে হবে (শ্রবণ), তারপর এই শ্রুত বিষয়ে অসম্ভাবনা পরিহার এবং সম্ভাবনা নিশ্চয়ের জন্য মনন করতে হবে, তারপর তত্ত্ব সম্বন্ধে ধ্যান বা নিদিধ্যাসন করতে হবে। নিরন্তর ধ্যানের ফলে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হবে এবং তাতেই মুক্তি। ভারতীয় দর্শনে যে জ্ঞানকে মুক্তির সাধন বলা হয় তা পরোক্ষ জ্ঞান নয়, অপরোক্ষ জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ হলে সাধক আত্মস্থ হন। এই অবস্থায় নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত আত্মা স্বরূপে প্রকাশিত হয়।

অনেকের মতে এই অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য ঈশ্বরানুগ্রহ আবশ্যক। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন—"তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" (১০।১০)। আমি আমাতে সততযুক্ত প্রীতিপূর্বক আমার ভজনাকারী ব্যক্তিদের এমন বুদ্ধি দান করি যার দ্বারা তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হন। মুক্তিলাভের বুদ্ধি ঈশ্বর তাঁর প্রতি অনুরক্ত ভক্তদেরই দান করে থাকেন। অদ্বৈতবাদী শ্রীহর্ষ বলেছেন, 'ঈশ্বরানুগ্রহাৎ এষা পুংষাম অদ্বৈতবাসনা" ঈশ্বরানুগ্রহেই পুরুষের অদ্বৈত বাসনা জন্মে।

গীতায় আরও বলা হয়েছে যে, শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্, তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ (৪।৩৯)। সংযতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন। শুধু সংযতেন্দ্রিয় হলে চলবে না, শাস্ত্র বাক্যে শ্রদ্ধাশীলও হতে হবে। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির জ্ঞানলাভ হয় না। জৈনেরাও একথা স্বীকার করেন। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

শঙ্করাচার্য যে জ্ঞানের কথা বলেছেন তাতে কর্ম বা ভক্তির স্থান নেই। আমরা এ বিষয় পূর্বেই আলোচনা করেছি। জ্ঞানের পথ দুর্গম পথ। 'নেতি', 'নেতি' বিচারের পথে অগ্রসর হয়ে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মাকে একমাত্র সত্য বলে জানা যায়। এই দৃষ্টিতে জগৎ ও ঈশ্বর মিথ্যা। সাধারণ লোক এই পথে অগ্রসর হতে পারে না। জ্ঞানবাদী শঙ্কর বিচারের পথে অগ্রসর হয়ে সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে চিন্তার এমন একটা উন্নত ভূমিতে উপস্থিত হন যেখানে সাধারণ মানুষ শিরঘূর্ণন অনুভব করে।

কর্ম ঃ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে কর্মযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। কর্মযোগে মুক্তি হয়। অনেকে গীতার অনেক পূর্বে ঈশোপনিষদে কর্মযোগের উৎস খুঁজে পান। ঈশোপনিষদে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েও কর্মফল বাসনা থেকে নিবৃত্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। তবে গীতায় আত্মশুদ্ধি এবং আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে। গীতার দৃষ্টিতে কর্মকে গ্রহণ করলে এর সঙ্গে জ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা কর্মযোগ প্রসঙ্গে করা হয়েছে।

কর্ম বলতে সাধারণতঃ 'যা করা হয়' বা 'কার্য' বোঝায়। এই অর্থেও গীতার কোন কোন শ্লোকে কর্ম শব্দের ব্যবহার আছে।[১] মীমাংসা দর্শনে 'কর্ম' বলতে বেদবিহিত কর্ম বা যাগযজ্ঞ বোঝায়। মীমাংসকেরা যখন 'জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়'-কে মোক্ষের সাধন বলেন তখন তাঁরা কর্ম বলতে এই অর্থই বোঝেন। গীতায় এই অর্থে 'কর্ম' শব্দের ব্যবহার নেই, এমন কথা বলা যায় না।[২] তবে এই অর্থে 'কর্ম' শব্দের ব্যবহার গীতায় বহু প্রচলিত ব্যবহার নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্য বা যা বর্ণ-ধর্ম নামে পরিচিত তা-ই 'কর্ম' শব্দের মুখ্য অর্থ। তবে গীতায় উপাসনা, প্রার্থনাদি ও 'কর্ম' শব্দের দ্বারা বোঝান হয়েছে।[৩] 'কর্ম' শব্দের এতসব অর্থ থাকলেও গীতায় কর্ম বলতে মুখ্যতঃ 'বর্ণধর্ম' বা বিভিন্ন বর্ণের কর্তব্যকর্ম বোঝায়। কর্মযোগ বলতে বিভিন্ন বর্ণের ধর্মে বা কর্তব্যে নিষ্ঠা বোঝায়।

কর্মযোগে কর্মের জন্যই কর্ম করার নির্দেশ রয়েছে। গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে —'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'*, কর্মেই তোমার অধিকার আছে, কর্মফলে কোন অধিকার নাই। কর্মযোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে[৪]—'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে', বুদ্ধি-যোগস্থ হয়ে কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করে, কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব নিয়ে কর্ম কর। কর্মের সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান বা সমত্বই কর্মযোগ। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামী বলেছেন—'যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা, তত্রস্থিতঃ কর্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু, তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্য-সিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবম্ভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে সদ্ভিশ্চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ।' বঙ্গানুবাদে বলা যায় যে, যোগ পরমেশ্বরৈকপরতা (পরমেশ্বরের ঐকান্তিক আরাধনা), তাতে অবস্থিত কর্মসকল কর। কিরূপে? না, সঙ্গ—কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগপূর্বক অর্থাৎ কেবল পরমেশ্বরের আশ্রয়যুক্ত হয়ে কর্ম কর। কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব হয়ে কেবল ঈশ্বরার্পণ করেই কর্ম কর, যেহেতু এইরূপ সমত্বকেই সাধুগণ যোগ বলেন, কারণ এর দ্বারাই চিত্ত সমাধান হয়।

ওপরের আলোচনা স্থির মস্তিষ্কে অনুসরণ করলে বোঝা যায় যে, কর্মযোগের নিহিতার্থ (১) কর্মফলের বাসনা বর্জন (২) আমিই কর্মকর্তা—এই কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ এবং (৩) সর্বকর্ম ঈশ্বরের কর্ম মনে করে সর্বকর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ।

গীতা বলেছেন 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম-বিভাগশঃ',[৫] গুণ ও কর্মানুসারে ভগবান চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণ। এদের প্রত্যেকের স্বভাবে একটি গুণের প্রাধান্য এবং এই গুণের প্রাধান্য অনুসারেই এদের প্রত্যেকের

১। গীতা ৩।৫, ৫।৮-৯
২। গীতা ৩।১৪-১৫, ১৮।৩
৩। গীতা ১২।১০
* গীতা ২।৪৭
৪। গীতা ২।৪৮
৫। গীতা ৪।১৩

কর্মনির্দিষ্ট। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণ প্রধান, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য রজঃপ্রধান এবং শূদ্র তমপ্রধান। শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, আত্মতত্ত্বানুভব এবং পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, কার্যকুশলতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দানে মুক্তহস্ততা ও ঈশ্বরভাব ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম। কৃষিকার্য, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম এবং উচ্চতর বর্ণের পরিচর্যা করা শূদ্রের কর্তব্য।[১] গীতায় প্রত্যেক বর্ণের স্বভাবনির্দিষ্ট কর্মকে স্বধর্ম বলা হয়েছে এবং স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়ঃ এবং পরধর্ম ভয়াবহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দোষযুক্ত স্বধর্ম সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এমন কথাও বলা হয়েছে।[২] গীতা আরও বলেছেন যে, নিজ নিজ অধিকারবিহিত কর্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করেন।[৩]

এত আলোচনার পর আমরা বলতে পারি যে, কর্মফলের বাসনা এবং কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে এবং সর্বকর্ম ঈশ্বরের কর্ম মনে করে সর্বকর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের স্বভাবধর্ম বা স্বধর্ম নিষ্ঠতাই কর্মযোগ। এই কর্মযোগেই মুক্তি লাভ হয়। মুক্তি বলতে আত্মশুদ্ধিদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ[৪] বা ঈশ্বরে সর্বকর্মফল সমর্পণের দ্বারা ঈশ্বরলাভ[৫] বোঝাতে পারে। যিনি ঈশ্বরের কর্ম-বলে সমস্ত কর্ম করেন এবং সর্বকর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন তিনি ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন —'ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি',[৬] আমার ভক্ত বিনষ্ট হবে না। যিনি আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন, তিনি মুখ্যতঃ জ্ঞানবাদী, আর যিনি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে কর্ম করেন, তিনি ভক্তিবাদী। সুতরাং গীতার কর্মযোগে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে অবিরোধ প্রদর্শিত হয়েছে এবং এদের সমন্বয় স্বীকৃত হয়েছে।

ভারতীয় চিন্তায় প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তি মার্গের যে সমন্বয়ের কথা বলা হয়, তা আমরা গীতার কর্মযোগে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করি। গীতায় কর্মত্যাগ না করে কর্মফল ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কর্মে প্রবৃত্ত থেকেও কর্মফলবাসনা থেকে নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন গীতা। এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংসার করার নামই গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন। কর্তব্যপরায়ণ গৃহীও মোক্ষ লাভ করেন, ভারতবর্ষ একথা বিশ্বাস করে। রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শের কথা বলতে গিয়েই বলেছেন, ভারতবর্ষ আমাদের শিখিয়েছে 'সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে'।

নিষ্কাম কর্ম করা বড় কঠিন কাজ। শ্রীরামকৃষ্ণ সেজন্যই বলেছেন,'নিষ্কাম কর্মকরা বড় কঠিন। মনে করছি—নিষ্কাম কর্ম করছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জানতে দেয় না।'[৭] সুতরাং কর্মযোগ অনুসরণ করে মোক্ষলাভ একেবারেই সহজ কাজ নয়।

১। গীতা ১৮।৪২, ৪৩, ৪৪

২। গীতা ১৮।৪৭

৩। গীতা ১৮।৪৫

৪। গীতা ৫।১১

৫। গীতা ৩।৩০, ৯।২৭

৬। গীতা ৯।৩১

৭। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৮৮৩) পৃঃ ১৩৩

ভক্তি ঃ—অনেকের মতে ভক্তিই মোক্ষলাভের সহজতম উপায়। 'ভক্তি' শব্দের ধাতুগত অর্থ সেবা।[১] ভক্ত বলতে সেবক বোঝায়। 'ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, ভক্তি শব্দের প্রচলিত অর্থ। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের এই ধারণা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। কৌষীতকি উপনিষদে (৩।১) এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬।২৩) এই ধারণা বর্তমান। রামায়ণে (৬।১৮) শ্রীরামচন্দ্র বলেছেন, যে আমার একান্ত শরণাগত, আমি তাকে কখনই পরিত্যাগ করব না। গীতা (দ্বাদশ অধ্যায়) ; ভাগবত এবং বিভিন্ন ঈশ্বরবাদী বেদান্তে এই অর্থে ভক্তির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নিষ্কাম কর্ম করে যেমন আত্মশুদ্ধি এবং আত্মজ্ঞান লাভ হতে পারে তেমনি ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম করেও ঈশ্বরের কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ হতে পারে। সুতরাং কর্ম এবং ভক্তি উভয়ই একই তাৎপর্য প্রকাশ করে। গীতায় (১২।১০) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'অভ্যাসেঽপ্য সমর্থোঽসি মৎকর্মপরমোভব। মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি' ; যদি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও, তবে আমার কর্মপরায়ণ হও, আমার প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্ম করেও সিদ্ধিলাভ করবে।

ভক্তিবাদীরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং মনে করেন যে, এই ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব। এই চেতনা থেকে ঈশ্বরের প্রতি শরণাগতি, শ্রদ্ধা, প্রেম প্রভৃতি ভাবের উদয় হয়। এবং ভক্ত মনে করেন যে, ঈশ্বরই তাকে মুক্ত করবেন। গীতায় (১২।৮) শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন—'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ' ॥—আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর ; এর ফলে এই জীবনের পর যে আমার কাছেই অবস্থান করবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

ভক্তিবাদীরা বলেন, ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে গেলে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। ঈশ্বরকে জানলেই, তাঁর ঐশ্বর্য উপলব্ধি করলেই তাঁর প্রতি আত্যন্তিক নির্ভরতার ভাব আসে। সুতরাং ভক্তিতে জ্ঞানের স্থান আছে। ঈশ্বরকে জানলে আর তাঁর সম্বন্ধে ভয় থাকে না। তাঁর প্রেমময় রূপ ভক্তকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করে। ভক্তের মনে জাগে ভাগবত প্রেম। প্রেমেই ভক্তির সার্থকতা।

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং ভগবৎপ্রেম—ভক্তির দুই দিক।[২] ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারলে তিনিই কৃপা করে তাঁর প্রকৃতি ভক্তকে জানিয়ে দেন। ভগবানের কৃপা না হলে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হতে পারে না, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান না

১। The word *bhakti* comes from a Sanskrit root, meaning 'to serve' or 'to resort to', and signifies, 'service' or 'restoring to another for assistance'—Hiriyanna ; Popular essays in Indian Philosophy ৯৬ পৃঃ।

২। 'Infact, it is these two—self surrender and love of God—taken together, that constitute bhakti in the complete meaning of the term'—Hiriyanna : Popular Essays in Indian Philosophy ৯৮ পৃঃ

হলে ভগবৎপ্রেমও জাগে না। সেজন্যই ভক্তিবাদীরা বলেন, ঈশ্বরের কৃপা না হলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। গীতায় (১০।১০) শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥—আমি আমাতে সতত যুক্ত, প্রীতি পূর্বক আমার ভজনাকারী ব্যক্তিদের এমন বুদ্ধিযোগ দান করি, যাতে তারা আমাকে প্রাপ্ত হন।

শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরাই ভাগবত প্রেমের অধিকারী হতে পারে। মলিন চিত্তে 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম' কখনই জাগতে পারে না। ভক্তিবাদীরা এই প্রেমকে প্রীতি বলে উল্লেখ করেছেন। একে কখনও কখনও অনুরক্তিও[১] বলা হয়। এই ক্ষেত্রে 'অনু' এই উপসর্গ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, 'অনু'র অর্থ পশ্চাৎ, ঈশ্বরে মহত্ব এবং কল্যাণগুণের জ্ঞান হওয়ার পর (অনু)ই ঈশ্বরের প্রতি প্রেম (রক্তি) জন্মে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম জাগ্রত হলেই 'অভয়ম' অজরম্, অমৃতপদম্' মোক্ষ লাভ হয়। যে মোক্ষ অভয় প্রদান করে সে মোক্ষ ঈশ্বর সম্বন্ধে ভয় থেকে কখনই লাভ করা যায় না। ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক প্রেম থেকেই অভয়প্রদ মুক্তি লভ্য। ঈশ্বরের প্রতি এই প্রেমের কথা বেদেও পাওয়া যায়। ভক্তকে বেদে 'দেব-কাম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভক্তিবাদীরা ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ভেদ কল্পনা করেন। তাঁদের মতে—মোক্ষ হলেও ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পূর্ণ অভেদ হয় না। ভক্ত ভগবানের সালোক্য বা সাযুয্য লাভ করেন।

মোক্ষ বলতে যে অজ্ঞান থেকে মুক্তি বোঝায়, তা অহঙ্কার থেকেও মুক্তি। সেজন্য ভক্তিবাদীরা ঈশ্বরের জ্ঞান এবং অহঙ্কার ত্যাগ করে ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এই দুই-কেই মোক্ষ-সাধন ভক্তির অঙ্গীভূত করেছেন।

অনেকে অবশ্য বলেন, আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা নিয়ে ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারলেই ঈশ্বর কৃপা করে ভক্তকে তাঁর জ্ঞান প্রদান করেন এবং তাঁর কৃপাতেই ভক্ত মুক্ত হয়। সুতরাং ভক্তি সাধনায় ভক্তের একমাত্র কৃত্য সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, শরণাগতি বা প্রপত্তি। আর যা কিছু তা ভগবানই তাঁর হয়ে করেন। ভক্তিবাদীদের ধারণা, ভক্তেরা যদি সত্যিই আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হন, তবে ঈশ্বরও অনুরূপভাবে ভক্তের নিকট প্রকাশিত হওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠেন। এই তাঁর লীলা।

এইভাবে শরণাগতিই ভক্তির মূলকথা বলে ব্যাখ্যা করায় অনেকে বলেন, ভক্তিপথই সর্বাপেক্ষা সহজ পথ। কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে কর্ম করা কঠিন। সুতরাং কর্মযোগ সহজসাধ্য নয়। 'নেতি', 'নেতি' বিচারের পথে অগ্রসর হয়ে জ্ঞানযোগ লাভ করাও সকলের সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু ব্যাকুল হয়ে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। শ্রীরামকৃষ্ণ সেইজন্যই বলতেন—সাধারণের জন্য ভক্তিভাবই ভাল।

১। শাণ্ডিল্য সূত্র ১।২

